বঙ্গবন্দী

রাবেয়া মঈন

প্রকাশক
মোঃ মাহফুজুর রহমান মঈন
১২৪/১ পাইকপাড়া, আহমেদনগর, মীরপুর
ঢাকা ১২১০ ।। বাংলাদেশ
দূরালাপনীঃ ৩৮০৫৩৪

প্রাপ্তিস্থান
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
৫সি বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
পৌষ ১৩৯৬ ।। ডিসেম্বর ১৯৮৯

গ্রন্থস্বত্ব
রাবেয়া মঈন

প্রচ্ছদ
রাবেয়া মঈন

মুদ্রণ
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

মূল্য
দুইশত টাকা

BAKKHA BANDANA
RABEYA MOYEEN
Published by Md. Mahfujur Rahman Moyeen
Price : TK 200·00

© RABEYA MOYEEN, 1989

নার্গিসের কাছ থেকে

উৎসর্গ

মতীন প্রিয়তম

ভূমিকা

[এক]

রহস্যমধুরা রমণী পৃথিবীর সকলকালের কবির কাছেই স্বপ্নসহচরী। রমণীর চরিত্র দেবতারাই বোঝেননা, মর্ত্যমানব কি আর বুঝবে—'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'। রমণীর হৃদয়ের অধিকার পেতে হ'লে প্রয়োজন তাই সহস্রবর্ষ সাধনার—'রমণীর মন/সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন।'[১] 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'[২] ব'লে যুগ যুগ ধ'রে কবিকুল সাধনা করেছেন এই তরঙ্গিত কামনার সম্রাজ্ঞীর হৃদয়জয়ের; পার্বতী-শকুন্তলা-রাধা-পদ্মাবতী-হেলেন-দেসদিমোনা-উর্বশী-বনলতা সেন--কত নামে ডেকেছেন তাকে; কত সহস্রপ্রকারে করেছেন তার বন্দনা। বাসনার বিপুল আগ্রহে উদ্বেলিত কবিকুল অপরূপা রমণীকে কিভাবে যে বন্দনা ক'রে থাকেন—একটি বন্দনাংশ উপস্থাপিত করলেই তা কিছুটা ধারণা করা যাবে—

অ-নামিকা

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন সহচরী
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া!
তোমারে বন্দনা করি...
হে আমার মানস-রঙ্গিনী,
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী।
তোমারে বন্দনা করি...

---

১. [বিদায় অভিশাপ] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২. [গীতগোবিন্দম্] জয়দেব

নাম নাহি-জানা ওগো আজো-নাহি-আসা।
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালোবাসা...
গোপন চারিণী মোর, লো চির-প্রেয়সী।[১]
... ...
(নজরুল)

কবিকল্পনায় বন্দিতা তিলোত্তমা এই রমণীর চুলের সিঁথি থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সবই কবির কাছে বিস্ময়কর। বিস্ময়কর তার ললাটের টিপখানি, চোখের চাওয়াখানি—বিস্ময়কর তার হাসিটি, কথাটি, মন্থর চলার ভঙ্গিটি। 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী/মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ/শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং'[২]—এভাবে নারী-শরীরের বর্ণনা করতে করতে কালিদাস অকস্মাৎ মুগ্ধতার আতিশয্যে বলতে থাকেন---স্রষ্টা প্রথম যে যুবতীকে সৃষ্টি করেছেন, এই সেই যুবতী---'যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥'[৩] রমণীরূপের বিরতিহীন আরতি করতে করতে বিমুগ্ধ বিস্মিত রবীন্দ্রনাথও হাল ছেড়ে দিয়ে একসময় বলতে থাকেন—'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।'[৪] কালিন্দীর কূলে ভূতলে বিদ্যুৎ স্থির দাঁড়িয়ে আছে দেখে অবাক কবি চণ্ডীদাস—'থীর বিজুরী বরণ গৌরী পেখলুঁ ঘাটের কূলে';[৫] অবাক কবি জায়সী---বিধাতা এমন নিষ্কলংক চন্দ্র নির্মাণ করেছেন, যাকে দেখে আকাশের কলংকিত চন্দ্র পূর্ণরূপে দেখা দিতে লজ্জা পায়, দেখা দেয় তাই ক্ষীণরূপে দ্বিতীয়ার চাঁদ হ'য়ে 'পুনি ঁউ সসী সো খীন হোই ঘটী॥/পুনি জো উঠা দূইজ হোই নঈ।/ নিহকলংক সসি বিধি নিরমঈ॥'[৬]

বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে মধ্যযুগের কত কবিই যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা 'নখশিখ' রচনা করেছেন---তার আর ইয়ত্তা নেই। বিশ্বের সকল কবিই রমণীরূপের আবেশমুগ্ধ বর্ণনা করেছেন—নারীর প্রত্যেক প্রত্যঙ্গের অভাবিত রূপনির্মাণ করেছেন। Andrew Marvell-এর মতে নারীর নয়ন এবং ললাটের বর্ণনা করতেই কেটে যায় শতবর্ষ—প্রত্যেক স্তনের বর্ণনায় লাগে দু'শো বছর---বাকী

১. [সিন্ধু-হিন্দোল] ২-৩. [মেঘদূতম্] ৪. 'মানসী' [চৈতালি] ৫. [বৈষ্ণব পদাবলী] ৬. [পদ্মাবত]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য তিরিশ হাজার বছর লাগে; প্রত্যেক অঙ্গ-উপাঙ্গের প্রশস্তির জন্য কম ক'রে হ'লেও এক এক যুগ দরকার---একেবারে শেষযুগে গিয়ে তবে দেখা মেলে নারীর হৃদয়ের—

An hundred years should go to praise
Thine Eyes, and on thy Forehead Gaze,
Two hundred to adore each Breast;
But thirty thousand to the rest.
An Age at least to every part,
And the last Age should show your Heart.[১]

নারীর এক এক অঙ্গ উপাঙ্গকে বিশ্বের কবিকুল কতভাবে যে বর্ণনা করেছেন---তা ব'লে শেষ করা যায় না। শুধু মুখমণ্ডলের কথাই ধরা যাক। চর্যারচয়িতা গুণ্ডরীপাদানাম্ যখন বলেন 'জোইনি তঁই বিনু খনহি ন জীবমি।/তো মুহ চুম্বি কমল রস পীবমি॥'[২]—তখন রমণীর মুখ পাপড়ি-খোলা মধুপূর্ণ উচ্ছলিত একটি শতদলের মত উদ্ভাসিত হয় তাঁর নয়নসমক্ষে---পরাগে অধর স্থাপন ক'রে তাই তিনি হবেন লীনপক্ষ্মা ভ্রমর। একান্ত কাছ থেকে দেখতে পাওয়া রমণীর সুগৌর মুখমণ্ডল কৃষ্ণাবগুন্ঠন টেনে দিলেই কালো রঙের পটে শুভ্র দোলনচাঁপার মত, দূরস্থিত ঘননীল শালবনের পটে স্বর্ণালী শর্ষেক্ষেতের মত কেমন হ'য়ে পড়ে সুদূর---রবীন্দ্রনাথ তার বর্ণনা দিচ্ছেন---

আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়
দোলন-চাঁপার মতো চিকনগৌর মুখখানি ঘিরে।
মনে হ'ল, কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে,
নিজের চারদিকে,
যে দূরত্ব শর্ষেক্ষেতের শেষ সীমানায়
শালবনের নীলাঞ্জনে।

কৃষ্ণাবগুণ্ঠন উন্মোচন করামাত্র রমণীর মুখজ্যোতির বিচ্ছুরণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে উজ্জ্বল সূর্যের অকস্মাৎ অধিকারের মত প্রতিভাত হয় কোনো কবির

---

১. 'To His coy Mistress' ২. [চর্যাগীতিকা] সম্পাদনা : সৈয়দ আলী আহসান

চোখে, আর তাই অভিভূত কবির মন্তব্য—এমন স্বর্গীয় লাবণ্য কোনো মরচক্ষু দেখেনি কোনোদিন—

From her faire head her fillet she undight,
And laid her stole aside. Her angels face
As the great eye of heaven shyned bright,
And made a sunshine in the shadie place;
Did never mortall eye behold such heavenly grace.[১]
(Spenser)

কোনো কবি প্রিয়ার মুখমণ্ডলে ফলাবনত হেমন্তের যে শ্রী প্রত্যক্ষ করেন-পূর্ণতা ও নমনীয়তার সেই লাবণ্য কোনো উচ্ছল বসন্তে কিংবা উজ্জ্বল গ্রীষ্মেও তিনি দেখেননি ব'লে ধারণা করেন—

No Spring, nor Summer Beauty hath such grace,
As I have seen in one Autumnall face.[২]
(Donne)

প্রিয়ার মুখ কোনো কবির চোখে সম্ভাবনাময় নতুন-জাগা-চর (কাল সে আসিবে মুখখানি তার নতুন চরের মত[৩]—জসীমউদ্দীন); আবার কোনো কবির চোখে শ্রাবস্তীর কারুময় আড়ম্বর (মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য[৪]—জীবনানন্দ দাশ)। রমণীর বদনবন্দনা বিশ্বের কত কবি যে কতভাবে করেছেন—সে কথা বলতে গেলে ফুরোবে না।

কবিকুল রমণীর মুখমণ্ডলে সৌন্দর্য যেমন দেখেছেন তেমন দেখেছেন শক্তি। হেলেনের মুখমণ্ডলে দীপ্তি শুধু নয় দাহ ছিল, তাই জ্বলে গিয়েছিল ইলিয়ামের উদ্ধত শীর্ষ--was this the face that launch'd a thousand ships,
And burnt the topless towers of Ilium?[৫]
(C. Marlow)

ক্লিয়োপেট্রার মুখশ্রীতে রয়েছে সেই প্রতাপ---যার ভয়ে বয়স সেই মুখে ছাপ ফেলে যেতে সাহসী হচ্ছেনা---

১ 'The Farie Queen' ২. 'The Autumnall' ৩. 'কাল সে আসিবে' [বালুচর]
৪. 'বনলতা সেন' [বনলতা সেন'] ৫. [Dr. Faustus]

এগারো

Age cannot wither her, nor custom stale
Her infinite variety ;[১]

(Shakespeare)

শুধু মুখমণ্ডল কেন---রমণীর প্রত্যেক অঙ্গ উপাঙ্গের প্রতাপ এবং প্রভাব সম্পর্কে কবিকুল স্বীকারোক্তি ক'রে গেছেন। কেউ বলেন, রমণীর চিবুকের একটি তিলের বিনিময়ে বিকিয়ে যায় সমরকন্দ বোখারা—

আগর আঁ তুর্ক-ই-সিরাজী বদস্ত্ আরদ্ দিলে মারা
বখালে হিন্দুয়শ্ বখশম্ সমরকন্দ ও বোখারারা[২]

(হাফিয)

কেউ বলেন রমণীর সরস অধরের লোভে পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ভুলে যায় পুরুষ—ভুলে যায় দোযখের আগুনকে---

অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোযখের নার-ভীতি,[৩]

(নজরুল)

কেউ বলেন রমণী চুল এলায়িত করলে স্বর্গ এবং পাতাল যেন আঁধার হ'য়ে আসে--

বেণী ছোরি ঝার জোঁ বারা।
সরগ পতার হোই আঁধিয়ারা।।[৪] (জায়সী)

কেউ বলেন রমণী যখন কথা বলে-একেশিয়ার ফুল ফোটে, দশটা ঝর্ণা হেসে ওঠে; রমণী যখন হাঁটে---সমস্ত পৃথিবী দোলে—

তুমি যখন কথা বল একেশিয়ার ফুল ফোটে
দশটি ঝর্ণা হাসে
যখন তুমি হাঁট
সমস্ত পৃথিবী দোলে[৫]

(ইভান গল/অনুবাদঃ সৈয়দ আলী আহসান)

রমণীর পদপাতে যখন পৃথিবী দুলতে থাকে, তার কটাক্ষঘাতে যখন সৃষ্টি উল্টে যেতে থাকে (উলটি অড়ার জাহিঁ পল মাহাঁ।।[৬]—জায়সী)---তখন

---

১ [Antony And Cleopatra] ২. [দিওয়ান-ই-হাফিয] ৩. 'সাম্যবাদী' (পাপ) [সর্বহারা] ৪. [পদ্মাবত] ৫. '১৩' প্রেমের কবিতা: ইভান গল [কাব্য-সমগ্র] ৬. [পদ্মাবত্]

তার বক্ষের দোলন কি সর্বনাশা তা সহজেই অনুমেয়। রমণীর বক্ষের দোলন আগ্নেয়গিরির লাভাতপ্ত জ্বালামুখের দোলনের মত (বক্ষে তোমার আশ্রয় পেয়ে যখন সহসা ভূকম্পন[১]--সৈয়দ আলী আহসান); নাগিনীর বিষপূর ফনার দোলনের মত (নটির মুদ্রার মত মন আর স্তন/অশ্লীল আরক্ত বিষ তুলেছে ফনায়[২] – আল মাহমুদ)। নিশ্চিত মরণ জেনেও সম্মোহিত কবিকুল ছোবলের গরলদোলায় রাখেন হাত (কুচ-হেম-ঘট মাঝে/হার ভুজঙ্গ আছে/তথির উপরে দেহি হাত।[৩]--দ্বিজ মাধব), চূড়ার আগুনদোলায় রাখেন ঠোঁট (বক্ষ তব ঢাকিয়া দিনু চুম্বনের ছাপে--/যুগ্ম সেই অগ্নিগিরি স্পর্শ-ভয়ংকর,[৪]---বুদ্ধদেব বসু)। সাপের ফণার এই দোল, আগ্নেয়গিরির চূড়ার এই দোল, কবির ঘোরলাগা চোখে স্বর্গের স্বপ্নদোল হয় (আমার চোখের সামনে স্বর্গের স্বপ্নের মতো দোলে/তোমার দুই বুক;[৫]---বুদ্ধদেব বসু)। ব্যাকুল কবি তাই বিহ্বল ভালোলাগায় লুটিয়ে পড়তে চান প্রিয়ার যুগকুচের ওপর মালা হ'য়ে (মালারি মতন দুলিতাম তবে হৃদয়তলে[৬]-কাপলর/অনুবাদ: সত্যেন দত্ত), শাড়ীর পাড় হ'য়ে (আমি তোমার নীলাম্বরী শাড়ীর দু'পাড়/বক্ষ ঘিরে জড়িয়ে থাকি লুটোই পায়ে[৭]--আল মাহমুদ), কাঁচুলি হ'য়ে (আমি যৌবনভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর।[৮]--নজরুল)।

কবি যখন সচেতন থাকেন, তখন স্তনযুগলের পোড়ানোর ক্ষমতা তিনি বুঝতে পারেন (অগিনি-বাণ দুই জানৌঁ সাধে/জগ বেধঁহিঁ জউঁ হোহিঁ ন বাঁধে।।[৯]---জায়সী)। কিন্তু যখন প্রেমাবেগে কবির হৃদয় বিবশ হ'য়ে পড়ে, তখন ঐ সচেতনতা লোপ পায়--তখন কবি কুচদ্বয়কে দেখেন সুন্দর চেরি-চন্দ্রমল্লিকার মত (ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি/চেরি-ফুল মুরছায়।[১০]—নোগুচি*/অনুবাদ: সত্যেন দত্ত), সুন্দর শ্রীফলের মত (কনক বেল জনি পড়ি গেও হীমা।।[১১]---বিদ্যাপতি), সুন্দর আপেলের মত (Each twin breast is

---

১. 'ত১' [সহসা সচকিত] ২. 'সাহসে আঘাতে স্পর্শে' ৩. [মঙ্গল চণ্ডীর গীত]
৪. 'বিবাহ' [কঙ্কাবতী] ৫. 'এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে' ৬. [কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী] ৭. 'বেহায়া সুর' [আল মাহমুদের কবিতা] ৮. 'বিদ্রোহী'

৯. "মনে হয় এ দুটি যেন অগ্নিবাণ, যদি বক্ষে বাঁধা না থাকত তাহলে জগৎকে বিদ্ধ করত।"—অনবাদ: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। [পদ্মাবতী]

১০. 'বরভিক্ষা' *জাপানী কবি ১১. [বৈষ্ণব পদাবলী]

an apple sweet[১]—Rossetti), সুন্দর চক্রবাকের মত (অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল।[২]—বড়ু চণ্ডীদাস)।

[দুই]

রমণীর অহংকারী তুঙ্গ বক্ষ যেন এক ঐন্দ্রজালিক উপলব্ধির সুনির্মিত সিংহদ্বার। তার সামনে বিশ্বের সকল কবিই সম্মোহিত, অভিভূত, অপলক। রমণীর এই বহুব্যবহৃত বক্ষপ্রসঙ্গ প্রত্যেক কবির কাছেই যেন নতুন আবিষ্কার---নতুন উন্মোচন। নারীর এই আশ্চর্য অঙ্গের জন্য আবেগভরে তাঁরা নির্মাণ করে চলেছেন উপমার পর উপমা। এক একজন কবিই বহু বিচিত্র বর্ণরাগে আঁকতে থাকেন নারীবক্ষের বিচিত্র সব ছবি। বহু প্রাচীনকাল থেকে আজকের কবি পর্যন্ত অবিরত ক'রে চলেছেন ক্লান্তিহীন তৃপ্তিহীন বক্ষবন্দনা।

কবি, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার সকলেই বক্ষবন্দনা করেছেন। আমি শুধু দেখিয়েছি মুগ্ধ কবিকৃত বক্ষবন্দনা। বাঙালী কবিরাই আমার আলোচনার প্রধান লক্ষ্য। বিদেশী কবিদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে স্বাদ-বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য। স্বাদবৈচিত্র্য আনয়নের জন্য বিদেশী কবিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি বটে, কিন্তু আমি মনে করি বক্ষবন্দনা-কালে বিশ্বের কবিকুলের মনোভঙ্গির সাযুজ্য-পার্থক্য বিষয়ে গবেষনার ব্যাপক অবকাশ রয়েছে—এবং এই পবিত্র সাধনার জন্য দরকার বিশ্ব-সাহিত্য সম্বন্ধে বিপুল এবং গভীর প্রজ্ঞার। বিশ্বের সকল কবিই যে একই রকম ভাবনায় কিভাবে সন্দীপিত হ'তে পারেন---নিঃসন্দেহে তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। আলাওলের সঙ্গে কোনোকালেও পরিচয় ছিলোনা কবি ডম্ মোরেসের – কিন্তু রমণীর উরুসন্ধি উভয় কবির চোখেই ফুল; পার্থক্য এই যে আলাওল ওটিকে বলছেন পদ্মফুল (অভেদ আছয়ে সেই কমলের কলি,[৩]) আর ডম্ মোরেস বলছেন হাইবিসকাস ফুল (Show me the hibiscus flower between your thighs[৪])। আলাওলের বাসভূমিতে হাই-

---

১. 'Troy Town' ২. [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন] ৩. [পদ্মাবতী]
৪. [মহুয়ার চিঠি] বুদ্ধদেব গুহ।

বিসকাস ফোটেনা, ফুটলে নিশ্চয়ই তিনি হাইবিসকাসের কথা লিখতেন। তবে পদ্ম কি হাইবিসকাস—সেটি বড় কথা নয়; ত্রিবলীকে যে উভয় কবিই ফুলের মত সুন্দর ও পবিত্র ভাবতে পারলেন সেইটিই বড় কথা—কবিকল্পনার এই হচ্ছে ঐক্য। রবার্ট হেরিক প্রিয়ার স্তনে সুন্দর ষ্ট্রবেরীর লাবণ্য দেখেছেন (A strawberry shows halfdrowned in cream ।[১]), গহীন অরণ্যে প্রেমনিবেদনকালে বাগদত্তাকে একটি সুন্দর ডেগী মুরগীর সঙ্গে, সুন্দর আকৃতির একটি কচি লাউয়ের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন যে গারো লোককবি—তিনি তাঁর প্রেয়সীর স্তনে সুন্দর ডেফলের লাবণ্য দেখেছেন (সুক্‌মে কিমকারোং মিতিং অম্‌সংবা[২])। রবার্ট হেরিকের দেশে ডেফল ফলেনা—ফললে নিশ্চয়ই তিনি ডেফলের কথাই বলতেন; আর মধুপুর টাঙ্গাইলে ষ্ট্রবেরী ফলেনা--ফললে নিশ্চয়ই গারো কবি ষ্ট্রবেরীর কথাই বলতেন। কিন্তু ডেফল কি ষ্ট্রবেরী--সেটি বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে একজন বিদেশী নাগরিক কবির চোখেও প্রিয়ার স্তন সুদৃশ্য ফলের মত —একজন দেশীয় লোককবির চোখেও তাই। বিদ্যাপতির সঙ্গে কোনো-কালেও দেখা হয়নি রসেটির---কিন্তু প্রিয়তমার যুগকুচ উভয় কবির চোখেই দৃষ্টিআকর্ষী সুগঠন তৈজসের মত---

পীন পয়োধর গোরা।
উলটল কনক কটোরা।।[৩] (বিদ্যাপতি)
Lo ık. I bring thee a carven cup. (Rossetti)

নারীরূপ বর্ণনাকালে দেশে দেশে যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকদের চিন্তায় এরকম সাম্য লক্ষ্য করা যায়। আবার অসাম্যও আছে। আলবার্তো মোরা-ভিয়ার একটি গল্পে দেখা যায় নিজের কুচবৃন্তকে পোষা কুকুরছানার ছোট নাসিকার মত স্নেহকামী মনে হওয়ায় নায়িকা বৃন্ত চুম্বনাঙ্কিত করে। ওদেশে কুকুর অতি আদরের জীব, তার নাসাচুম্বনও স্বাভাবিক ব্যাপার। বিদেশী সাহিত্যিক তাই চুচুকচুম্বনকে সারমেয়ের নাসাচুম্বন ভেবে পুলক-শিহরিত হ'তে পারেন, কিন্তু বাঙালী কবিকুলের কাছে এরূপ ভাবনাও

---

১. 'Upon the nipples of julia's breast।' ২ "তোমার বুক ছোট ডেফলের মত সুন্দর"—অনুবাদ: আবদুস সাত্তার [আরণ্য জনপদে] ৩. [বৈষ্ণব পদাবলী]
৪ 'Troy Town'

অসহ। সাহিত্যিককুলের মনোভঙ্গিতে সংস্কৃতি এভাবেই প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে। সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে বক্ষবন্দনা বিষয়ে এরকম কত যে অনির্ণেয় তথ্য লুক্কায়িত আছে---কে জানে।

'বক্ষবন্দনা' গ্রন্থে আমি নিম্নলিখিত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি—প্রাচীন সাহিত্যে কুচপ্রসঙ্গ, প্রজননের অধিশ্বরী রমণীকে সৌন্দর্যময়ীরূপে অবলোকন, স্তনের নানা নামকরণ, কুচদ্বয়ের প্রতি কবিকুলের বিহ্বলতা, বিশেষণ এবং সংখ্যাবাচক শব্দপ্রয়োগ, কবিকর্তৃক যুগকুচকে নানারূপে অবলোকন, বিচিত্র রমণীর কুচদ্বয় অবলোকন, অবলোকনের প্রক্রিয়া, কুচবিষয়ে পুরাতন ও নবীন কবির দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, কবিকর্তৃক বিচিত্র উপমান ব্যবহার ও ব্যবহারের ধরন, ব্যবহৃত উপমানরাজির তালিকা, উপেক্ষিত উপমান-বিষয়ে ক্ষণদৃষ্টির পর্যালোচনা ইত্যাদি।

মধ্যযুগীয় কবিকুলের কাব্যের নাম গ্রন্থপঞ্জীতে আছে, তাই একঘেঁয়েমি রোধকল্পে পাদটীকায় বারংবার ছাপা হয়নি। পাদটীকায় উর্ধ্বকমাবন্দী করা হয়েছে কবিতার শিরোণাম এবং তৃতীয় বন্ধনীতে আবদ্ধ করা হয়েছে গ্রন্থের নাম।

কৌতূহলী পাঠক এই গ্রন্থে ধৃত বিদ্যাপতির পদরাজির গদ্য অনুবাদ-গুলো শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের যৌথ সম্পাদনায় নির্মিত বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রন্থ নূতন সংস্করণে (শ্রীশরৎকুমার মিত্র কর্তৃক ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত) দেখতে পাবেন। আলোচনার সময় উক্ত সংস্করণের পদসংখ্যা অনুযায়ী পদের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।

[তিন]

যে চিত্রগুলো আমি গ্রন্থে সংযোজন করেছি---ভেনাসের,[১] আফ্রোদিতির,[২] মিশরী রানীর[৩] এবং আর গুটিকয় বিদেশিনীর চিত্র ব্যতীত সবক'টিই ভারতীয় ভাস্কর্যের সফল নিদর্শন। গ্রীকরা নারীসৌন্দর্যের যে আদর্শে বিশ্বাসী, ভেনাসের চিত্রটিতে তার প্রতিফলন রয়েছে—মায়াময় মুখশ্রী, পরিমিত স্তন, সুঠাম মসৃণ উরুপ্রদেশ, জঙ্ঘা---সর্বোপরি সৌষম্য বা হার্মনি।

১. চিত্র-৩ ২. চিত্র-৪ ৩. চিত্র-১০

ভেনাসের মুখাবয়বে যে নিখুঁত প্রত্যঙ্গবিন্যাস এবং নারীসুলভ লাবণ্য ও মায়াময়তা রয়েছে—ভারতীয় ভাস্কর্যের একটি রমণীমূর্তির মুখেও সেই মায়াময়তা ও নমনীয়তা নেই। খাজুরাহো, কোনারকের যে রমণী মূর্তি-গুলো এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে—তাদের মুখাবয়ব সুন্দর নয়; মুখের আকৃতি গোলছাঁদের, কোনোটি আবার পুরুষের মত; এমনকি বিবাহকালীন পার্বতীর গ্রীবার ওপরও শিবের মুখ সংস্থাপিত। আসলে ভারতীয় শিল্পের মূল কথা হচ্ছে ভাবনা বা ধ্যান। ভারতীয় ভাস্কর প্রাধান্য দিয়েছেন ভঙ্গিকে—ভঙ্গির মধ্যে তিনি মূর্ত ক'রে তুলেছেন সঙ্গীতকে, নৃত্যের মুদ্রাকে; একটি আবেগকে, একটি তন্ময়তাকে তিনি মৌনমুখর ক'রে রেখেছেন নিশ্চল প্রস্তরে—তাই মুখশ্রী সুন্দর হ'লো কি হ'লোনা তাতে তাঁর কিছু যায় আসেনা। খাজুরাহোর এই যে প্রেমপত্রলিখনরতা রমণী[১]—যেন নিজের রচিত শব্দ-মোহে নিজেই আবেশাচ্ছন্ন; মৃদঙ্গবাদনরতা এই রমণী[২]—যেন বাদ্যের শব্দে নিলীন; তবলায় বোলের সঙ্গে পায়ের কাজ দেখাচ্ছে যে নৃত্যরতা[৩]—তাকে দেখলে কিংবা চুম্বনরতা এই মিথুনমূর্তির[৪] দেহভঙ্গিমায় তৃপ্তির আবেশস্বাক্ষর দেখলে আমাদের মন প্রস্তর অতিক্রম ক'রে কোন্ অসীমে ডানা মেলে দেয়। পীন, বর্তুল ও পরস্পরসংশ্লিষ্ট স্তন, ক্ষীণ কটি, গভীর নাভি, বিশাল উরু ও জঘন—প্রাচীন হিন্দুমানসে রমণীরূপের সর্বসম্মত লক্ষণ হ'লো এই—এবং চয়িত ভারতীয় ভাস্কর্যগুলোতে লক্ষণগুলো দৃশ্যমান। আমরা দেখতে পাচ্ছি নারীর সৌন্দর্যসম্পর্কে গ্রীসীয় এবং ভারতীয় ধারণার পার্থক্য তাঁদের সৃষ্টিকর্মে কিভাবে প্রতিফলিত। গ্রীস ও রোমে ভারতের মতোই দেব দেবী ও দেবযোনীদের বহু মূর্তি রচিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য নিদর্শনসমূহে আমরা দেখতে পাই জৈবতার পরাকাষ্ঠা; আপোলো বা ভেনাস নামেমাত্র দেবতা, আসলে অতি সুদর্শন মানব ও মানবী—আলিঙ্গনযোগ্য, কামোদ্দীপক, কাঙ্খনীয়। কিন্তু ভারতশিল্পে যক্ষী বা অপ্সরা, পার্বতী বা রতি—এদের দেখামাত্র অনুভব করা যায় যে সে অপ্রাকৃত, অলৌকিক, অলভ্য, অলোভনীয়। আদিরসে পরিপ্লুত বনদেবী কিংবা মারকন্যা, সর্বদেহে পূর্ণ যৌবন ও পূর্ণ নারীত্ব নিয়েও স্পষ্টই অমানবিক। একটি পেলব, স্বপ্নিল, তন্দ্রালু আবহ নিজেদের চারিদিকে

---

১. চিত্র—১৪ ২. চিত্র—১৯ ৩. চিত্র—২০ ৪. চিত্র—১৫

ঘনিয়ে তুলে এরা মানুষের আলিঙ্গন-কল্পনাকে অসম্ভব ক'রে রেখেছে। দু'একটি দিক আলোচনা ক'রে আমরা গ্রীক-রোমক ও ভারতীয় মনোধর্মের প্রভেদ কিছুটা বুঝতে পারলাম। গ্রন্থে আরও যত বিদেশিনীর চিত্র যোজিত হয়েছে—সেসবের সঙ্গেও ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে প্রাচ্য এবং পশ্চিমী শিল্প সম্পর্কে নানা নতুন তথ্য উদ্ঘাটন সম্ভবপর।

প্রতিতুলনার কত দিক আছে। একটি দিকের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মুহূর্তেই বলা যেতে পারে। ভারতীয় ভাস্কর্যে আমরা লক্ষ্য করছি স্ত্রীপুরুষ সকলেই অঙ্গে ধারণ ক'রে রেখেছেন মর্যাদাবান অলংকার। ভারতীয় ভাস্কররা নরনারীদেহকে অলংকৃত করতেন তার কারণ দেহবিষয়ে কুন্ঠা নয়, তাঁরা ভেবেছিলেন ভূষনহীন সৌন্দর্য অসম্ভব। কিন্তু নারীশরীরকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ ও নিরাভরণ ক'রে তার মধ্যে নগ্নতার স্বদীপ্ত সৌন্দর্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা দেখেছি ভেনাসে, আফ্রোদিতিতে এবং পাশ্চাত্ত্যের আরও অনেক উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মে। প্রতিতুলনার এই যে দিকটি—এটি কিন্তু খুব বড় একটি দিক। এই দিকটি হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের—যে পরিবর্তনের পথ ধরে শিল্পের জগতে রেনেসাঁ এসেছিল। রেনেসাঁযুগে যখন ভূষণহীন নগ্নতার অমল মহিমা উপলব্ধির চেষ্টা হচ্ছে—সে সময় কেউ কেউ আবার অলংকারে বিভূষিত ক'রে নারীত্বকে অবলোকনের চেষ্টা করছেন—তবে তাঁদের অলংকরণক্রিয়ায় রয়েছে আধুনিক দৃষ্টির পরিচর্য্যা। স্বাতন্ত্র্য অর্জনই হচ্ছে তাঁদের এহেন প্রয়াসের উদ্দেশ্য। ৫ ও ৬ নম্বর চিত্রের এই যে দুই মোহিনী—এই চিত্র দু'টিও রেনেসাঁযুগেরই; কিন্তু রেনেসাঁযুগের অঙ্কন হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখছি নারীদেহকে এখানে অলংকৃত করা হয়েছে। ৫ নম্বর চিত্রটি 'ম্যানারিজমে'র নিদর্শন—যে 'ম্যানারিজম' হচ্ছে রেনেসাঁযুগের একটি বিশেষ উপহার। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্করসৃষ্ট নারীবিগ্রহে যেমন কেশের কুন্তলগুম্ফন এবং অঙ্গের ভূষণসজ্জা—Pollaiuolo-র আঁকা ৬ নম্বর চিত্রেও আমরা দেখছি vespucci--র কন্ঠদেশে নাগিনীজড়িত হারের ভূষণ, শিরোদেশে বেণীবেষ্টিত কুন্তলবন্ধন। (আমরা অবশ্য মনে রেখেছি যে, প্রাচীন ভারতীয় খোঁপা কানড় ছাঁদের এবং তৎকালের অলংকারও প্রথাসিদ্ধ, মর্যাদাবান এবং ওজনদার; আর vespucci-র কুন্তলবিন্যাস পাশ্চাত্ত্যরীতির এবং তার কন্ঠহার স্বল্প ওজনের—আধুনিকতার চিহ্নবাহী।) দা ভিঞ্চি মোনালিসার রূপ দেখলেন তাকে নিরাভরণা

এবং মুক্তকেশা ক'রে আর Pollaiuolo vespucci-র রূপ দেখলেন তাকে আভরণ পরিয়ে—খোঁপায় সুগুম্ফিত বেণী জড়িয়ে দিয়ে। সাপ উর্বরতার বা প্রজননশক্তির প্রতীক হিসেবে ভারতীয় ভাস্করদের কাছে সমাদৃত—নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে সাপকে তাঁরা বারংবার রূপায়িত করেছেন। কত প্রিয় ভঙ্গিমায় সাপ যে রূপায়িত হতে পারে ১১ ও ১২ নম্বর ঐ মিথুনমূর্তি দু'টিই তার প্রমাণ। vespucci-র কণ্ঠহারেও সাপের লীলায়িত ভঙ্গিমা রয়েছে, কিন্তু এই সর্পসংস্থাপনে আধুনিক কোন দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে, সাপকে শিল্পী Pollaiuolo কিসের প্রতীক মনে করছেন, vespucci-র নগ্ন বক্ষকে আরও মহিমামণ্ডিত করার জন্যই সাপকে তিনি ব্যবহার করেছেন কিনা—এসব গভীরভাবে পর্যালোচনারই ব্যাপার। আমাদের অবলোকনকে আরও সূক্ষ্ম প্রসারিত, বিচিত্রস্বাদী, অন্বেষী এবং প্রতিতুলনাপটু ক'রে তোলার জন্যই গ্রন্থে কিছু বিদেশী চিত্র এবং ভাস্কর্যচিত্র যোজিত হয়েছে।

ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রতি অধিকমাত্রায় মমত্বের দৃষ্টিপাত করছি আমরা এই কারণে যে, অসাধারণ সুন্দর এই ভাস্কর্যগুলো ভারতবর্ষের পুরাতন কবিকুলের প্রেরণার উৎস।

১৬ নম্বর চিত্রে চুম্বনোদ্যোগী এই রমণীর কুচযুগলের ওপর ন্যস্ত কন্ঠহার দেখেই যেন পর্বতে বহতা নদীর কল্পনা করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় কবি—

গিএ গজমুতী হার মনি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুই ধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে।।[১]
(বড়ু চণ্ডীদাস)

যেন লজ্জান্বিতা এই রমণীর (২৪ নম্বর চিত্র) কুচদর্শনেই শ্রীফলের উপমা মনে এসেছে কবির—

"স্বর্ণের সুন্দর শ্রীফল কাটিয়া অর্ধেক করিয়া কুচযুগল গঠন করিয়াছ। সুন্দরি! আমার পাণিস্পর্শে রস-অনুভব বাসনায় বাধা দিওনা।"[২]
(বিদ্যাপতি)

১. [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন] ২. ১৩৩

অপরাধী নায়ক, নায়িকার কুচঘটে হাত রেখে ভুজঙ্গদংশন কামনা করছে ("তোমার স্তন সুবর্ণঘট, হার ভূজঙ্গিনী স্বরূপ। আমি উহার উপর হাত রাখিতেছি।"[১])---বিদ্যাপতির এই অপরূপ কল্পনাদৃশ্যের উৎস যেন ২২ নম্বর এই মিথুনচিত্রটি।

গুম্ফিত ভারতীয় ভাস্কর্যচিত্রগুলো আমাদের কল্পনাকে এভাবে নানারূপে উদ্দীপিত হ'তে দেয়।

[চার]

মালঞ্চের যত্নরোপিত. স্নেহস্পর্শকামী তরুটির ফুলবতী হওয়ার জন্য যে পরিবেশ ও পরিচর্য্যার প্রয়োজন হয়---সেই পরিবেশ, পরিচর্য্যা, প্রত্যহের বিমুগ্ধ দর্শন ও আদরস্পর্শ দিয়ে তরুরূপী আমাকে পুষ্পময়ী ক'রে তুলেছেন আমার প্রিয়তম স্বামী মোহম্মদ মাহফুজুর রহমান মঈন। আটটি[২] গুহামূর্তিচিত্র প্রদান ক'রে কবি সৈয়দ আলী আহসান আমার এই রূপসৃষ্টির প্রতি মুগ্ধ সমর্থন জ্ঞাপন করলেন এবং আমার হৃদয়ের একটি কোমল স্থান স্পর্শ করলেন। অপর চিত্রগুলোর সংগ্রহকর্মে সহায়তা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক জনাব আ.ফ. ফজলুল মজিদকে।

যে রূপজগত আমি সৃষ্টি করেছি---সেই রূপজগতকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধির জন্য চিত্রের প্রয়োজন ছিল অত্যাবশ্যক। চিত্রগুলো বারংবার দেখতে দেখতে দৃষ্টিতে একধরনের তন্ময়তা জাগে। নগ্নতার মধ্যে ক্রমশঃ বিকীরিত হয় বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অমল প্রতিভা। আমি চাই 'বক্ষবন্দনা' গ্রন্থ পাঠকালে পাঠকের দৃষ্টিতে ঘোর লাগুক এই নান্দনিক তন্ময়তার---অতুলনীয় প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য কলার প্রয়োজনীয় যোজনা সেই কারণেই।

গ্রন্থের মুদ্রণকর্মে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই বাংলা একাডেমী মুদ্রণালয়ের জনাব আফজল হোসেনকে।

---

১. ৬৪৭

২. চিত্র--১, ২, ১৫, ১৬, ২২, ২৩, ২৪, এবং প্রচ্ছদে অঙ্কিত চিত্রের আলোকচিত্র অর্থাৎ ১৪ নম্বর চিত্র।

[পাঁচ]

'বক্ষবন্দনা' সাহিত্যাঙ্গনে ঝড় তুলবে জানি---যে কোনো মহৎ রচনাতেই ঝড়ের আয়োজন থাকে।

একদিন ভোরবেলা প্রায় খেলাচ্ছলেই আমি এ গোপন রত্নদ্বীপে পা রাখি। সেদিনের সেই সকালে আমার মনে হয়েছিল, প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালী কবিকুল রমণীর বক্ষোদেশের যত উপমা সৃষ্টি করেছেন-- সেগুলো আহরণ করে একটি প্রবন্ধ লিখলে কেমন হয়। একথা ভাবার পর আমি উপমাগুলো সঞ্চয় করতে থাকি—যেটি এখন এই গ্রন্থের শেষার্ধ। উপমার সঞ্চয়ন যত বৃদ্ধি পেতে থাকে---গ্রন্থের প্রথমার্ধের ভাবনাগুলো ততই আমার মাথায় বিদ্যুতের মত খেলতে থাকে। আস্তে আস্তে শূন্যের মধ্যেই গড়ে তুলি এই ব্যাবিলন।

'বক্ষবন্দনা' একটি অনাবিষ্কৃত খনি। এই খনিতে আমি সর্বপ্রথম একাকী নেমেছি---এ আমার অহংকার।

বাংলা বিভাগ রাবেয়া মঈন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্রসূচী

১. পার্বতী : ব্রোঞ্জ, দক্ষিণ ভারত, কোলা, দশম শতক, মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্ট, নিউ ইয়র্ক।

২. তোতার সঙ্গে আলাপরতা যক্ষী : মথুরা, কুষাণ, দ্বিতীয় শতক। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা।

৩. ভেনাসের জন্ম : সান্দ্রো বত্তিচেল্লি, ১৪৪৪-১৫১০

৪. আফ্রোদিতি : মার্বল, ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম।

৫. Diane de poitiers : পোর্ট্রেট, kunstmuseum.

৬. Simonetta vespucci : পোর্ট্রেট, Pollaiuolo, chantilly, France, Muséе Condé.

৭. Reclining nymph from the Neumarkt fountain, G. R. Donner, Vienna, 1737-39, Vienna, Österreichische Galerie.

৮. Saltcellar of Francis I of France, B. Cellini, ca 1540 vienna, kunsthistorisches Museum.

৯. The 'Wife of God,' Amenirdis, from Karnak, ca 700 B. C Alabasterr.

১০. Mycerinus এবং তাঁর রাণী, 18th dynasty, A.D. কায়রো, ইজিপ্সিয়ান মিউজিয়াম।

১১. নাগদম্পতি : গন্ধবন, মধ্যপ্রদেশ, নবম শতক।

১২. নাগদম্পতি : বিহার-বাংলা, নবম শতক।

১৩. যোগিনী : আগ্নেয়শিলা, (দ্রাবিড় শিল্পনিদর্শন), দশম-একাদশ শতক Muséе Guimet, paris, M.G. 18507.

১৪. প্রেমপত্রলিখনরতা : বেলেপাথর, খাজুরাহো, একাদশ শতক, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা।

১৫. মিথুনমূর্তি : খাজুরাহো।

১৬. মিথুনমূর্তি : খাজুরাহো।

১৭. মা ও শিশু : লাল বেলেপাথর, এলিফ্যান্টা মন্দির থেকে, দশম শতক, Muséе Guimet, paris, M.G. 18231.

১৮. মা ও শিশু : কালো আগ্নেয়শিলা, সেনযুগ, উত্তরবঙ্গ, একাদশ শতক।

১৯. মৃদঙ্গবাদনরতা অপ্সরা : বেলেপাথর, উড়িষ্যা, দ্বাদশ শতক।

২০. নৃত্যরতা মদনিকা : পাথর, চেনা কেশব মন্দির, বেলুড়, দ্বাদশ শতক।

২১. রাধাকৃষ্ণ : ব্রোঞ্জ, পুরী, উড়িষ্যা, সপ্তদশ--অষ্টাদশ শতক।

২২. মিথুনমূর্তি : পাথর, কান্দারিয়া মহাদেব মন্দির, খাজুরাহো, মধ্যপ্রদেশ, ভারতবর্ষ, একাদশ শতক।

২৩. মিথুনমূর্তি : বেলেপাথর, সূর্যমন্দির, কোনারক, ১২৪০-১২৮০ খৃঃ।

২৪. মিথুনমূর্তি : কোনারক।

২৫. করতাল বাদনরতা : বেলেপাথর, সূর্যমন্দির, কোনারক, ১২৪০--১২৮০ খৃঃ।

২৬. নর্তকী : মথুরা, কুষাণ, দ্বিতীয় শতক, ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ভারতবর্ষ, নয়াদিল্লী।

২৭. সরস্বতী : কালো আগ্নেয়শিলা, সুন্দরবন, ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ, দশম শতক।

২৮. হংসপৃষ্ঠে রতি : নায়ক, সপ্তদশ শতক, মীনাক্ষী মন্দির, মদুরা।

২৯. তোতাকে আদরকারিণী : শ্বেত বেলেপাথর, রাজমহল, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম খৃঃ, পাটনা মিউজিয়াম বিহার।

৩০. কল্যাণসুন্দর শিব এবং পার্বতী : ব্রোঞ্জ, কোলা একাদশ শতক, আর্ট গ্যালারী, তাঞ্জোর।

৩১. চামরধারিণী : বেলেপাথর, দিদারগঞ্জ, পাটনা মিউজিয়াম, বিহার, তৃতীয় শতক খৃঃ পূঃ ।

৩২. বনদেবী : গিয়ারাসপুর থেকে, গুর্জর-প্রতিহার, নবম শতক, সেণ্ট্রাল আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, গোয়ালিয়র।

১

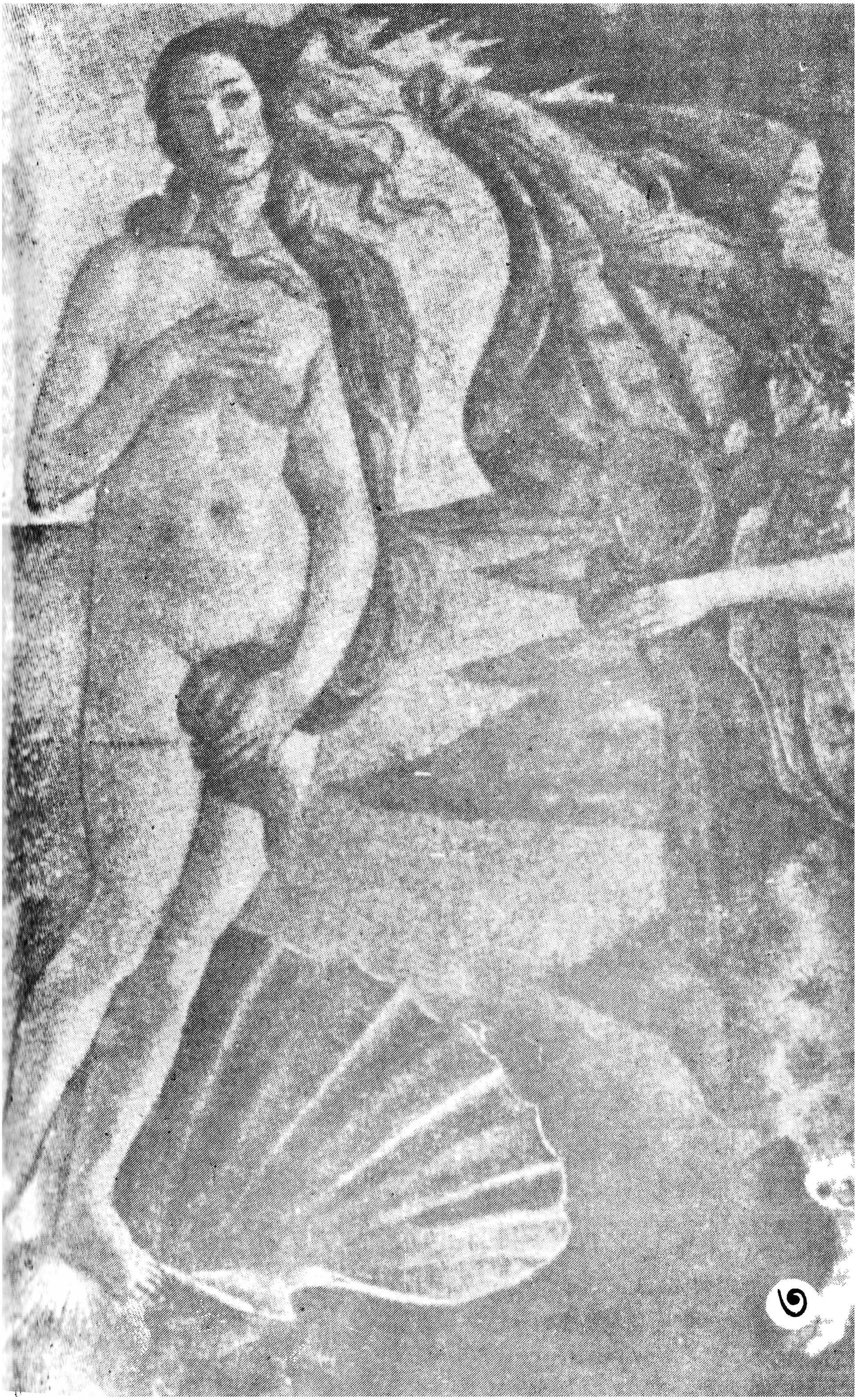

8

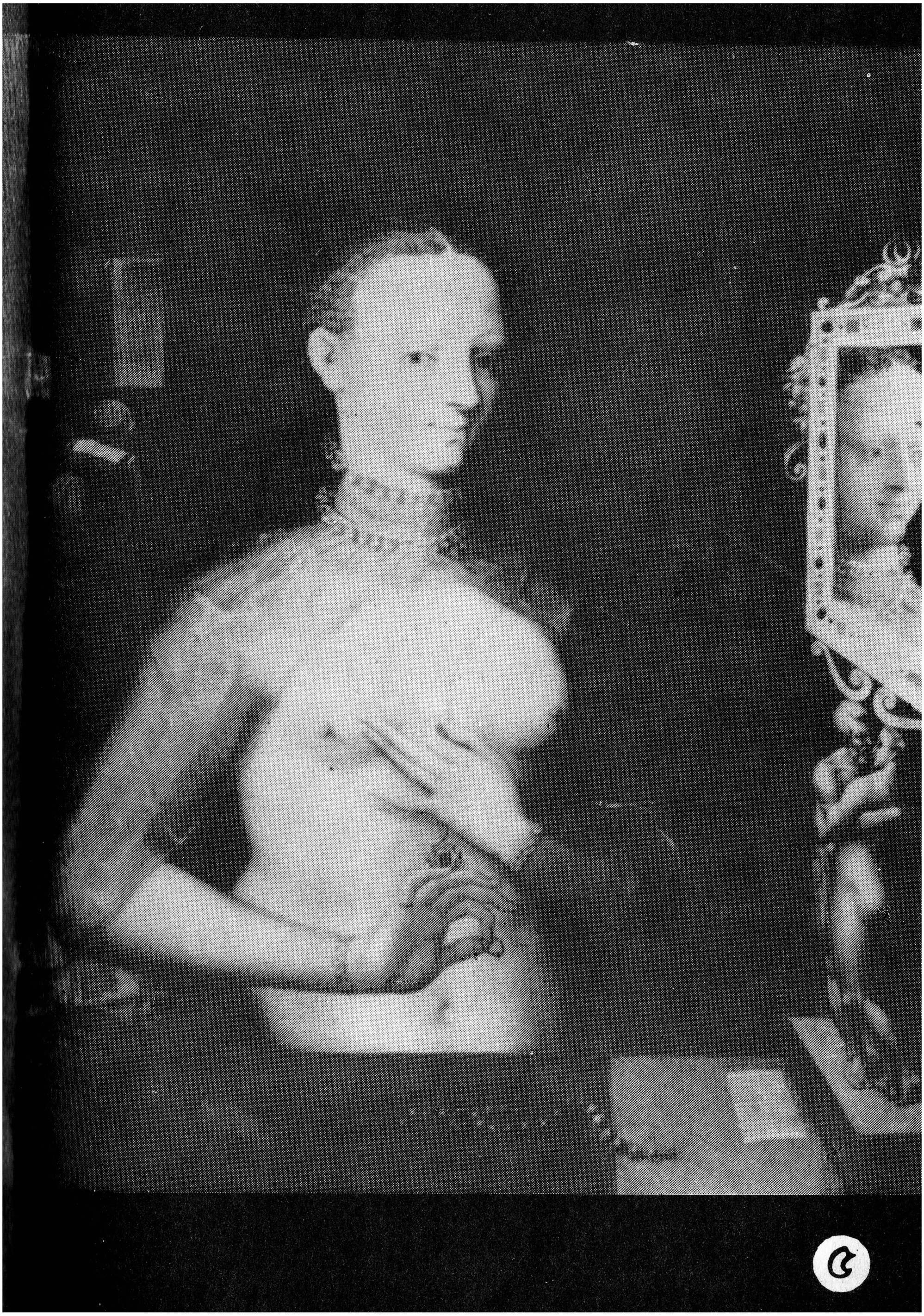

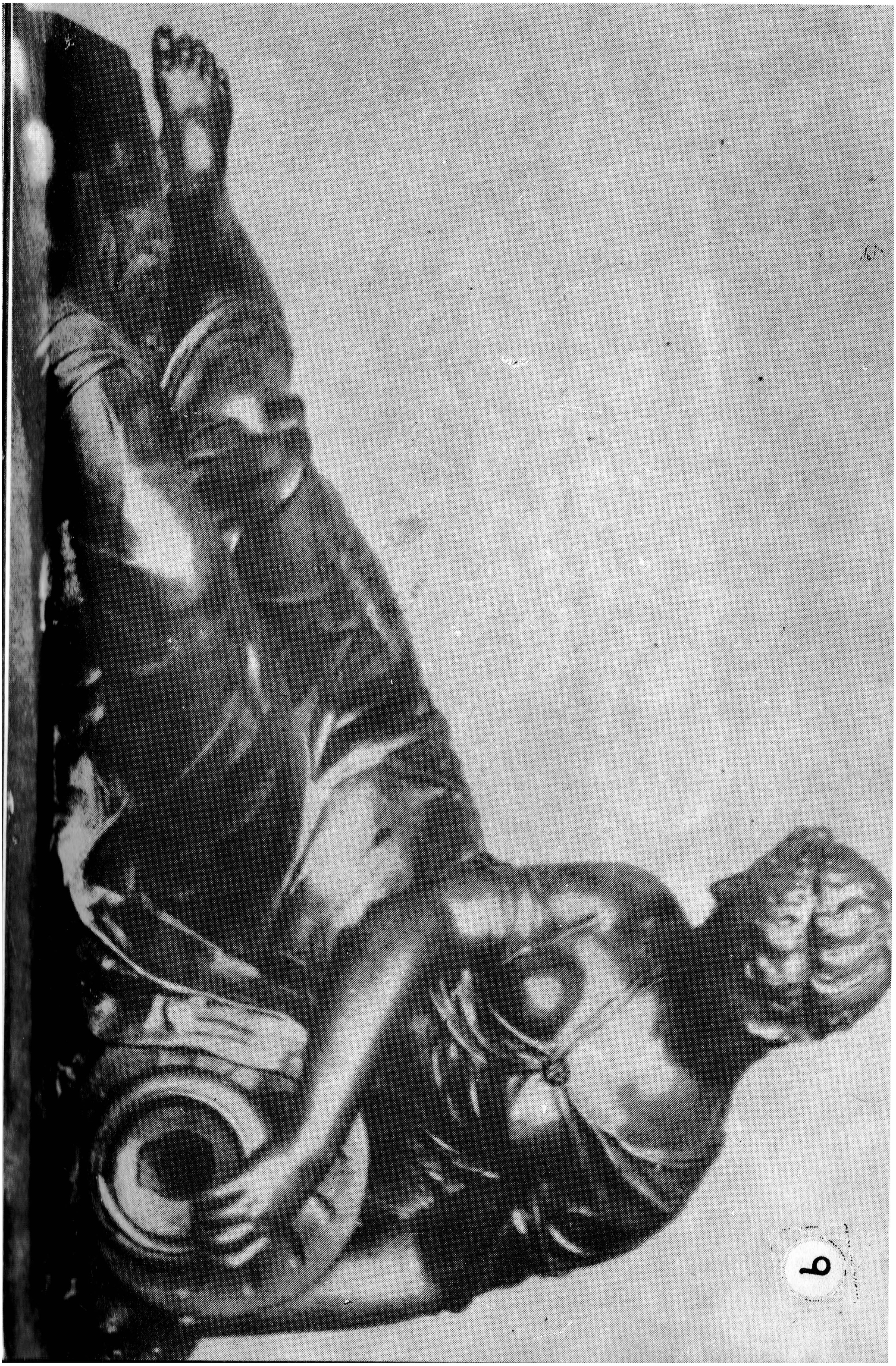

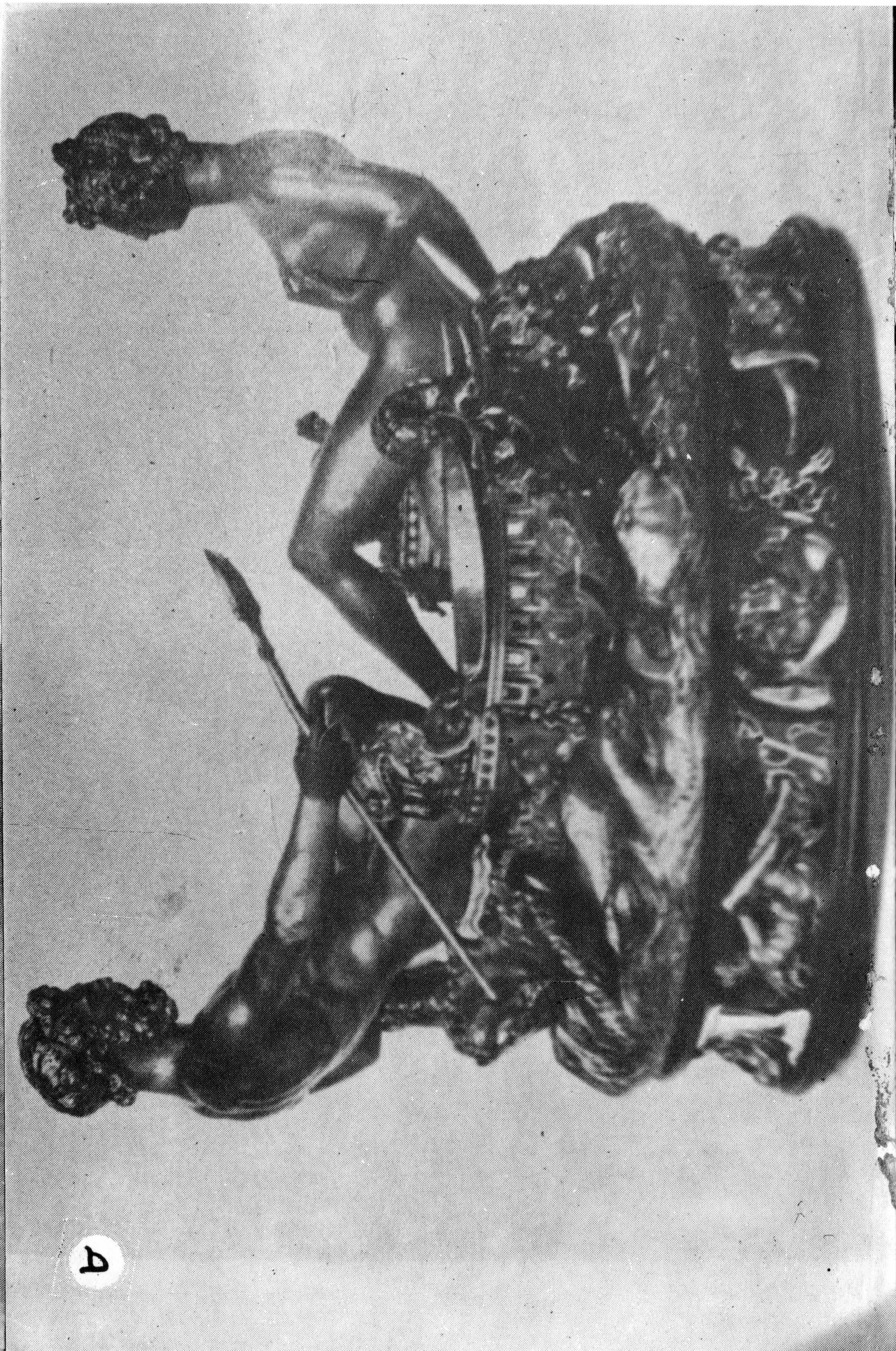

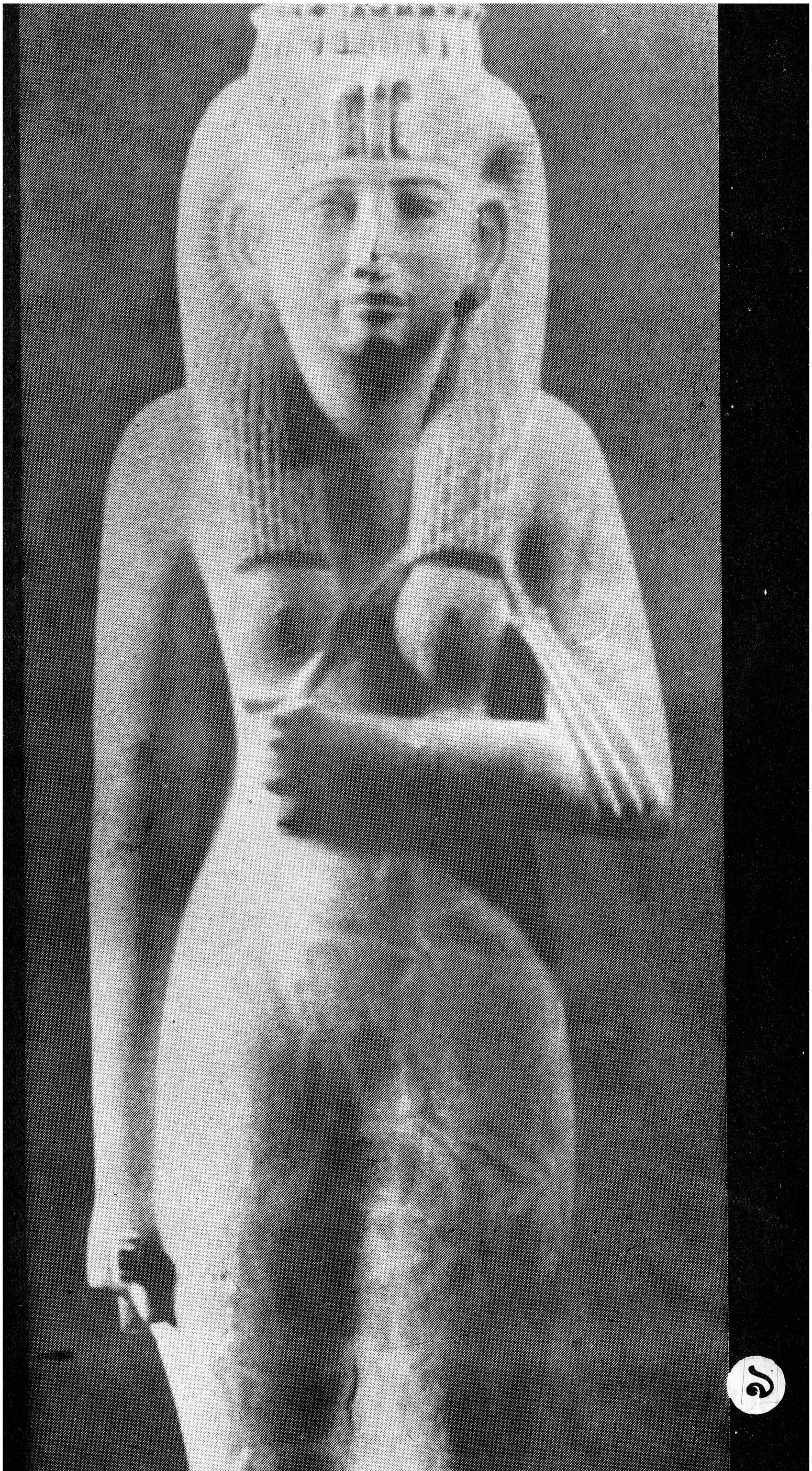

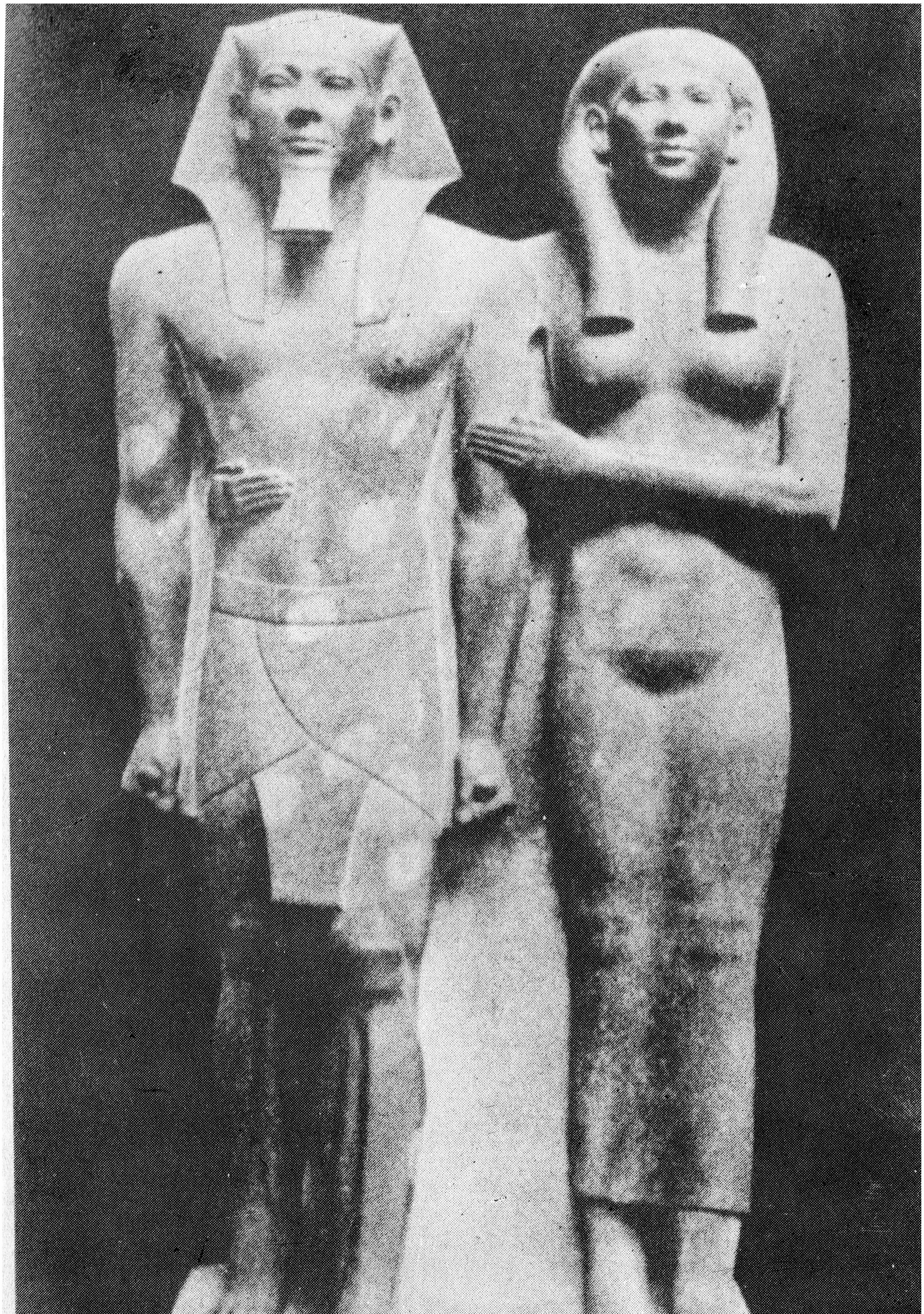

১১

১২

নারীদেহের একজোড়া স্পর্শকাতর আশ্চর্য মাংসখণ্ডের জন্য যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকদের কি উত্তেজনাময় কৌতূহল এবং রসনিবিড় মোহমুগ্ধতা। যৌবনের এই রূপময় মাদক বিকাশ সম্পর্কে রসিক কবি সাহিত্যিকেরা চিরকালই কলকণ্ঠ এবং উপমানির্বাচনে অক্লান্ত। সুপ্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যে এই প্রিয় প্রসঙ্গ এসেছে। এ ব্যাপারে সংস্কৃত কবিরা খুবই পরিশ্রমী ভূমিকা পালন করেছেন। পার্বতীর স্তনবর্ণনায় পঞ্চাশ শ্লোক ব্যয় ক'রেও তাঁরা অতৃপ্ত। কালিদাসের 'সরস্বতীস্তোত্রে' দেবীর অনেক গুণের একটি গুণ হ'চ্ছে তিনি কুচযুগশোভিত। এবং এই কুচশোভিত করার জন্য কালিদাসকে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য চরণ নির্মাণে মনোযোগী হ'তে হয়েছে।

ভবভূতি, কালিদাসের যুগের মালবিকা, চিত্রলেখারা দশহাতি শাড়ী-আবৃত থাকতেন না ব'লে সেকালের কবিদের খুব সুবিধা হ'য়েছিল। শাড়ী তো দূরের কথা, উর্ধ্বাঙ্গে কোন বসনের অত্যাচার তাঁরা সহ্য করতেন না একমাত্র কাঁচুলি ছাড়া। পুলকরোমাঞ্চের সময় সেই কাঁচুলিও অবশ্য চুন্ চুন্ ক'রে ফেটে যেত—

তন-পসেবে পসাহলি ভাসলি
পুলক তৈসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলয়া ভাগু।।[১]

---

১. অমরুশতকের একটি বিখ্যাত শ্লোকের বিদ্যাপতি-কৃত ভাবানুবাদ।

দেবীদের তো এই কাঁচুলির কৃত্রিমতাটুকুও পছন্দ ছিল না। তাঁরা - যাকে বলে একেবারে 'আদিম অকৃত্রিম'—সেই 'অকৃত্রিম' দেহসৌন্দর্যের উত্তুঙ্গ মহিমা নিয়ে আবির্ভূত হ'তেন। কালিদাসের 'মেঘদূতে' বর্ণিত বারবিলাসিনী, কুলভ্রষ্টারা, অলকাপুরীর যক্ষীরা, উজ্জয়িনীর নাগরিকারাও প্রায়ই দেবীদের অনুসরণ করতেন। সমুদ্রস্নানকালে ইংরেজরমণী তবুও বিকিনি, টপলেস-জাতীয় কিছু পোশাক অঙ্গে রাখে, কিন্তু যমুনায় জললীলার সময় গোপবালারা অমন স্বল্পমাপ বসন ও দেহের পক্ষে অনাবশ্যক বিবেচনা করতেন। কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসাদি কবির জন্য এই উন্মুক্ত অবলোকন রূপনির্মাণের বড়ই সহায়ক হয়েছিল। এই নগ্ন রূপদর্শনই জন্ম দিয়েছিল অজন্তা, ইলোরার গুহাগাত্রে খোদিত তুলনাহীন রূপবৈভবের। এই পুরাতন ভাস্কর্যগুলোই প্রমাণ দেয় যে, অতি-প্রাচীন-ভারতবর্ষে ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরণের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। অতএব নগ্ন বক্ষবর্ণনায় কবিদের কোন কুণ্ঠাই ছিল না। পরবর্তীকালে ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরণের পদ্ধতি আসলেও উন্মুক্ত বক্ষের দর্শনস্মৃতিকে ঐতিহ্যপ্রিয় ভারতীয় কবিরা কাব্যে দীর্ঘদিনের জন্য ধ'রে রেখেছিলেন।

অজন্তা, ইলোরা, কোনারক, খাজুরাহোর দেয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ নারী-মূর্তিগুলো নারীরূপ সম্পর্কে তৎকালীন যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত করে, তা হ'ল, অতি-প্রাচীন-ভারতবর্ষে নারীকে দেখা হ'ত উর্বরাশক্তির প্রতীকরূপে। সে কারণেই তার স্তনদ্বয় বিশাল, নিতম্ব স্থূল এবং জঙ্ঘাদ্বয় অতিমাত্রায় মাংসল। ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারা জননশক্তির অধিশ্বরী রমণীকে এভাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিল ব'লে তৎকালীন ভাস্কর্যে ধৃত হ'য়েছে সেই স্মৃতি। ক্ষীণ কটি, পীন তুঙ্গ বিশাল স্তনের অধিকারিণী, ঘন নিতম্বিনীই তাই ভারতীয় পুরাতন কবিদের রচনায় সুন্দরী হিসাবে স্বীকৃত এবং আদৃত। এবং নারীরূপের এই ধারণা "বিপুলং নিতম্বদেশে মধ্যে ক্ষামং সমুন্নতনং কুচয়োঃ"[১]—এটি বাঙালী কবিকূলের কাছে ঐতিহ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। নারীর সৌন্দর্য সম্পর্কে এই যে ধারণা—এটি একান্তই প্রাচীন ভারতবর্ষের—অন্য অনেক দেশের সৌন্দর্যধারণার সঙ্গেই এর মিল হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, গ্রীক সাহিত্যে নারীরূপের ধারণা

১. [মালবিকাগ্নিমিত্রম্] কালিদাস।

আমাদের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গ্রীক কবি, চিত্রকর, ভাস্করেরা নারীর পরিমিত নিতম্ব এবং ক্ষুদ্র স্তনের পূজারী। মেদহীন নিতম্ব, সুঠাম মসৃণ জঙ্ঘা ও ক্ষুদ্র স্তনের অধিকারিণীই তাঁদের চোখে সুন্দরী। নারীদেহে তাঁরা দেখতে চান জ্যামেতিক ছন্দোস্পন্দন। নারীরূপ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা সুস্পষ্ট হয় ভেনাসের ছবি মনে আনলে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীকে দেখা হ'ত উর্বরা-শক্তির প্রতীকরূপে। রমণী যেন ভূমি—পুরুষ যেন কৃষক। বীজবপনই পুরুষের কাজ—কখনো শস্যক্ষেত্রে, কখনো রমণীগর্ভে। অজন্তা, ইলোরা, কোনারক, খাজুরাহোর মিথুনদৃশ্যাবলীতে দেখা যায়, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক যৌনাচরণরত পুরুষদের দৃষ্টি শান্ত, পবিত্র, উত্তেজনাহীন, অপাপবিদ্ধ—যেন ক্ষেত্রকর্ষণের মতই পবিত্র দায়িত্বে তারা রত। তখনকার পুরুষকুল নারীকে দেখেছে শস্যশালী মাঠের মতই—পবিত্র, পূজাযোগ্য, সৃষ্টিস্পন্দিত। তৎকালে যৌনভাবনা ছিল সুস্থ জীবনচেতনার পরিচয়বহ—সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ অবলোকনকে ধারণা করা হত সমাজজীবনের জন্য মঙ্গলময়, কল্যাণকর। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও বাৎস্যায়ন যে কামসূত্র রচনা ক'রেছিলেন—সে শুধু সমাজের হিতার্থে। গুহাগাত্রে কিংবা মন্দিরগাত্রে কামকলার শাস্ত্রসম্মত সকল প্রক্রিয়া চিত্রণের পশ্চাতে শিল্পীর চিত্তে এই কল্যাণবোধ ক্রিয়াশীল ছিল। যৌনচেতনা যে তৎকালীন জীবনে কত সচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, বলিষ্ঠ এবং পবিত্র ছিল—সেই সব সযত্ন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সেকথা সপ্রমাণ করে। কুচের কামনাউদ্রেককারী উত্তেজক সৌন্দর্য সৃষ্টির পাশাপাশি---কুচ যে নব নব প্রাণকে সুধাসিঞ্চনে সঞ্জিবীত রাখে—সেই প্রয়োজনীয় কথাটি প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর নির্মাণ করেন, যখন তিনি নারীকে দেখেন কর্ষিত ক্ষেত্রের মতই উৎপাদকরূপে। ভাস্কর্যের মত প্রাচীন সাহিত্যেও একই দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল ব'লে ধারণা হয়। আমাদের বহু পূর্ববর্তী কবিকুল কুচকে যখন জীবনসঞ্চারী অত্যাবশ্যক সুধাধার ভেবেছেন, তখন সুধাপূর্ণ মঙ্গলকলস, ধারাধারণকারী পর্বতকে উপমান নির্বাচন করেছেন—তাদের আকারবিশালতাকে জানিয়েছেন স্বাগতম। আবার যখন কুচের সৌন্দর্যরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন, তখন আবাহন জানিয়েছেন স্বর্ণশ্রীফলকে, রক্তোৎপলকে। কালিদাস পড়লে

আমরা বুঝতে পারি কুচের কল্যাণরূপ সৃজনের জন্য তিনি বিশাল মোহন পর্বতকে উপমান করেছিলেন---গর্ভিনীর স্তনের উপমান হিসেবে তিনি পর্বতকেই মনোনীত করেন।[১] আবার দেখি বাসনাবিবশ চোখে যখন কালিদাস নারীবক্ষের দিকে দৃক্‌পাত করেন—তখন কুচের কল্যাণরূপের চেয়ে তার সৌন্দর্যরূপই তাঁকে মোহব্যাকুল করে—এবং মোহবিবশ কবি তখন 'পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকে'র[২] সঙ্গে কুচকে উপমিত করেন। তখন বৃহতের দিকে কবির চোখ যায় না--যায় পরিমিতির দিকে। বাসনাসঞ্চালক স্তন কেমন? একটি দুটি ক্ষুদ্র পুষ্পমাত্র নয়, সাজিভরা পুষ্পও নয়—বরং একগুচ্ছ পুষ্প—পরিমিত। তবে নারীদেহকে উর্বরাশক্তির প্রতীকরূপে কবিকুল যে অঙ্কন ক'রে গিয়েছিলেন—সেই 'ইমেজ' পরবর্তীকালে বহুদিন ছিল। মধ্যযুগীয় কবিকুল, দেবীদের মাতৃরূপের আবাহনকালে যখন দেবীর স্তনদ্বয়কে 'সুধার কলস'[৩] কিংবা 'নদীধারী পর্বত'[৪] রূপে কল্পনা করেন এবং কোনো মানবীর দেহে সৃষ্টিউষ্ণ মুহূর্তের* মঙ্গলময়তা সৃজনের উদ্দেশ্যে যখন তাঁর কুচদ্বয়কে 'মঙ্গল কলস'[৫]

---

১. ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ—
স্তয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং।
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥ [মেঘদূতম্]

২. পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ [কুমারসম্ভবম্]

৩. সুধার কলস কুচ [অন্নদামঙ্গল] ভারতচন্দ্র

৪. গজকুম্ভ পয়োধর কিবা হেম গিরিধর [চণ্ডীমঙ্গল] মুকুন্দরাম

৫. পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥ (বিদ্যাপতি)
(এখানে রাধার দেহ-বেদীতে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠানের কথা অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রতপ্ত মুহূর্তের সুখকথা বর্ণিত হয়েছে।)

* মানবীর পয়োধরকে পর্বত কল্পনা সৃষ্টিমুহূর্তে করা যেতে পারে আবার যে কোনো সময় ও করা যেতে পারে। কবিকুল যখনই নারীকে মনে করেন ধরিত্রী— তখনই তাঁদের কল্পনায় কুচ হয় জীবনসঞ্চারী পর্বত।

কিংবা জলোচ্ছল শৃঙ্গ[১] রূপে কল্পনা করেন, তখন এই 'উর্বরাশক্তি ইমেজ'ই পরিস্ফুট করতে চান। আকারে বৃহৎ উপমানগুলো তাঁরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়েই ব্যবহার করেছিলেন—পরবর্তীকালে যেগুলো ঐতিহ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়।

সর্বদেশীয় কবিই নারীদেহের প্রতি অঙ্গের রূপনির্মাণ করেছেন—কিন্তু বক্ষের অতি-প্রাধান্য বোধ হয় বিশেষভাবে ভারতীয়। শৃঙ্গাররস ব্যতীত তৎকালীন ভারতীয় সাহিত্য অকল্পনীয় ছিল ব'লে নারীর গোপন কামকেন্দ্র-গুলো সে যুগের সাহিত্যে অত সমাদৃত হয়েছিল। নারীর কামোদ্দীপক অঙ্গগুলোর মধ্যে বক্ষাঙ্গের অলংকার যে পুরাতন কবিদের রচনায় সংখ্যাগুরু—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আধুনিক কবিরা (আমি বিশেষতঃ রবীন্দ্রযুগের কবিদের কথা বলছি) নারীর এই উত্তেজক কামকেন্দ্রগুলোর নগ্ন রূপোল্লেখে মাধুর্যের অভাব ঘটবে মনে ক'রে, তাকে সযত্নে বসনাবৃত রেখে ইঙ্গিতময় এবং ব্যঞ্জনাগাঢ় ক'রে তুলতে চেয়েছেন। আধুনিক কাব্যসমালোচকেরা অভিযোগ করেন যে, পুরাতন কবিরা হৃদয়ের বহির্দ্বারের রূপৈশ্বর্যে স্তম্ভিত হ'য়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়েছেন—অনেক সময় ভেতরে প্রবেশের প্রয়োজন অনুভব করেননি। অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাহলে 'সই কেবা

১. পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিমহার।
জনি কনকাচল উপর বিমলজল
দুই বহ সুরসরি ধার।। (বিদ্যাপতি)
(এখানে সম্ভোগমুহূর্তের প্রাক্কালে কৃষ্ণের চোখে রাধার রূপ চমকাচ্ছে।)

শুনাইল শ্যাম নাম/কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ'[১]—এর মত এমন আশ্চর্য গভীর পংক্তি সৃষ্ট হ'তনা। 'মরমের' কথা সে যুগের কবিরা বলেছেন—তবে একথা সত্যি যে, 'পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ'[২]—বক্ষের এই আশ্চর্য সম্ভার দেখতে দেখতে তাঁদের অনেক মগ্ন মুহূর্ত ব্যয় হয়েছে। অতি-আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রযুগের সেই বসনাবৃত অঙ্গগুলোকে আবার উদ্‌ঘাটন করেন। হৃদয়তোরণের রূপে বিস্মিত তাঁরাও লুটিয়ে পড়েন তোরণপ্রান্তে—অন্দরে প্রবেশ করেন কেউ কেউ—কিন্তু পুরাতন কবিদের মত হৃদয়তোরণের অমন সুদীর্ঘ এবং সবিস্তার রূপনির্মাণ তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়না।

ভারতবর্ষীয় পুরাতন কবিকুল স্তনপ্রসঙ্গে এতই পুলকিত হ'য়ে উঠতেন যে, একবারমাত্র এ প্রসঙ্গ উত্থাপনে তাঁরা তৃপ্তি পেতেন না। তাই এক একজন কবিই বহুবার বহু বিচিত্র বর্ণরাগে আঁকতে থাকতেন নারীবক্ষের বিচিত্র সব ছবি। 'স্তন' শব্দটির নগ্ন উচ্চারণেও তাঁদের কোন দ্বিধা নেই (স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং[৩]—কালিদাস ; স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম[৪]—জয়দেব ; খাড়া দেখি দুই স্তন[৫]—বিজয়গুপ্ত ; কৃষ্ণের চুম্বকে ধায় স্তনমুখে প্রাণি[৬]—অভিরাম দাস)—তবে 'কুচ' নামের প্রতি মধ্যযুগীয় কবিকূলের বেশী পক্ষপাতিত্ব। মধ্যযুগে 'কুচ' শব্দের পরে বেশী ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে 'পয়োধর'। ব্যবহারবহুলতার দিক থেকে 'পয়োধর' শব্দের পর যথাক্রমে আসে 'তন', 'উর', 'উরজ', 'বুক', 'বক্ষ', 'হৃদয়', 'হিরদয়', 'হিয়া', 'হিয়', 'পয়োভার', 'কুচভার', 'স্তন্য' ইত্যাদি শব্দগুলো। মধ্যযুগে 'স্তন' শব্দটি 'স্তন্য' রূপে ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়েছে। 'স্তন' শব্দের বিবর্তিত রূপ 'তন' শব্দটির সুপ্রচুর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় আদি মধ্যযুগে—বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। 'হিরদয়', 'হিয়', 'হিয়া'—'হৃদয়' শব্দেরই বিবর্তিত রূপ। 'উরস' শব্দের বিবর্তিত রূপ হচ্ছে 'উরজ' 'উর'। 'বুক' শব্দের উৎস হচ্ছে 'বক্ষ' শব্দটি। বড়ু চণ্ডীদাস 'কুচ' শব্দের সঙ্গে এবং 'পয়োধর' শব্দের প্রথমাংশের সঙ্গে 'ভার' শব্দ যোজনা ক'রে 'কুচভার' ও 'পয়োভার' নামক নতুন শব্দ গঠন ক'রে ব্যবহার করেছেন। 'কুচভার' শব্দটি বিদ্যাপতিও ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো কবি 'কুচ' শব্দের সঙ্গে যোজনা

১. চণ্ডীদাস ২. বিদ্যাপতি ৩. [মেঘদূতম্] ৪. [গীতগোবিন্দম্] ৫. [মনসামঙ্গল] ৬. [গোবিন্দ বিজয়]

করেছেন 'মণ্ডল' শব্দটি। 'স্তন', 'কুচ', 'পয়োধর', 'উরস', 'হৃদয়', শব্দগুলো যে সংস্কৃত থেকে বাংলায় আগত, সংস্কৃত থেকে উদ্ধৃতি আহরণ করলে সেকথা প্রমাণিত হবে—

'স্তন'—পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।[১] (বিলহন্)

'কুচ'—ত্বং কুচ-বল্গিত-মৌক্তিক-মালা।[২] (রূপগোস্বামী)

'পয়োধর'—স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুরম্ভোজ-লোচনে ত্বৎ-পয়োধরঃ। (রসমঞ্জরী)

'উরস'—উরসি মুরারেরুপাহিতহারে
 ঘন ইব তরলবলাকে।[৩] (জয়দেব)

'হৃদয়'—সহৃদয়মর্মণি বর্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্॥[৪] (জয়দেব)

এখন উদাহরণের মধ্যে স্তনের নামসূচক উপরোক্ত সকল শব্দের মধ্য-যুগীয় ব্যবহৃত রূপ কিছু কিছু দেখানো যেতে পারে, যেমন—

'স্তন্য'

১. স্তন্যের প্রদিপ দিল ঘৃতে জলে আতি॥ (নারায়ণদেব)

২. তুষ্ট ছিলেম স্তন্য পানে।[৫] (কবিয়াল নকুলেশ্বর)

'স্তন'

১. কদম্বকোরক জিনী খুল্লনার স্তন। (মুকুন্দরাম)

২. স্তন বাহিয়া আখির জল পড়ে ভূমিতলে। (মালাধর বসু)

৩. দুই স্তন হৈল জেন কনক কটোরা॥ (নারায়ণদেব)

৪. কোলে করি যত্নে ধরি দিলুঁ স্তন-পান। (দৌলৎ কাজী)

৫. পান করে তার স্তনের ক্ষীর
 সে দেনা করেছি অন্ত[৬] (কবিয়াল নকুলেশ্বর)

'তন'

১. ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে। (বড়ু চণ্ডীদাস)

২. তনের উপর হারে। (বড়ু চণ্ডীদাস)

১, [চৌর পঞ্চাশৎ, শ্লোক২] ২. জয়দেবের অনুসরণে রচিত অভিসার বিষয়ক পদ
৩. [গীতগোবিন্দ (৫ম সর্গ,)] ৪. [গীতগোবিন্দ (৪র্থ সর্গ)] ৫-৬. [কবিয়াল কবিগান]।

'কুচ'

১. দুই **কুচ** তোর রাধা শম্ভুর আকার। (বড়ু চণ্ডীদাস)
২. **কুচ**যুগ চারু চকেবা। (বিদ্যাপতি)
৩. চন্দনে রঞ্জিত করু **কুচ**কুম্ভ। (জ্ঞানদাস)
৪. হিয়া থার **কুচ** কঞ্চন লারু। (জায়সী)
৫. **কুচ** শ্রীফল, জাঙ্গ কদলী লক্ষণ। (আলাওল)
৬. **কুচ** তোর গিরিবর। (দ্বিজ মাধব)
৭. উচচ **কুচ** সুধার কলস। (ভারতচন্দ্র)

'কুচভার'

১. দেখায়িলেঁ **কুচভার** করায়িলেঁ বিকল। (বড়ু চণ্ডীদাস)
২. মঙ্গল কলস করব **কুচভার**। (বিদ্যাপতি)

'কুচমন্ডল'

১. করে **কুচমন্ডল** রহলিহুঁ গোএ। (বিদ্যাপতি)
২. **কুচযুগল মন্ডলে** চঞ্চল হারজাল। (রঘুনাথ ভাগবতাচার্য)

'পয়োধর'

১. পীন **পয়োধর** গোরা। (বিদ্যাপতি)
২. রাই **পয়োধর** গিয়া কর সাজ। (রায় শেখর)
৩. ডওফল জোড় নয়ান বিভোর আঁখি সে সুন্দর
এহি সে **পয়োধর** রঞ্জিতা। (আলাওল)
৪. পীন **পয়োধর** ভর তনু মন্থর। (কৃষ্ণরাম দাস)
৫. গজকুম্ভ **পয়োধর** কিবা হেম গিরিধর। (মুকুন্দরাম)
৬. কারো কারো কাচলী আব্রতো **পয়োধরে**। (পরশুরাম)

'পয়োভার'

১. তালফল জিনিআঁ তোহ্মার **পয়োভার**। (বড়ু চণ্ডীদাস)
২. কমলকলিকা সম তার **পয়োভারে**। (বড়ু চণ্ডীদাস)
৩. হেমঘট **পয়োভারে**।। (বড়ু চণ্ডীদাস)

'উরজ'

১. নিরজনে **উরজ** হেরই কত বেরি। (বিদ্যাপতি)
২. **উরজ** উদয়-থল লালিম দেল। (বিদ্যাপতি)
৩. আধ **উরজ** হেরি আধ আঁচর ভরি তব ধরি দগধে অনঙ্গ। (বিদ্যাপতি)
৪. বরহি কঠীন অতি **উরজ** অবলা। (আলাওল)
৫. **উরজ** কঠিন হেম কটোর। (আলাওল)

'উর'

১. **উর** কৈ খীনি লঙ্ক কৈ মোটি। (জায়সী)
২. আর ভুজ **উরে** দিয়া মৃদ্ তনু আবরিয়া (আলাওল)
৩. চীর চন্দন হার **উরে** ন দেলা। (বিদ্যাপতি)
৪. **উর**পর বিরাজিত কনক মহেশ। (জ্ঞানদাস)

'বক্ষ'

১. প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় **বক্ষ** আচ্ছাদন। (শ্রীল রায় রামানন্দ)
২. **বক্ষ** জঘন গুরু কটি ভেল খীন। (নয়নানন্দ কবিরাজ)

'বুক'

১. **বুকের** বসন ওড়ে মলয়ের বায়। (মানিকরাম গাঙ্গুলি)
২. **বুকে** বুকে লাগাইয়া কাঞ্চুলি করি দূর। (দোনা গাজী)
৩. শরম ত্যাগিয়া ধরে **বুকে** বুকে কষি। (মালে মুহম্মদ)
৪. **বুকের** কাঁচলি যেন করে ঝিকিমিকি। (ফকির গরীবুল্লাহ্)

'হৃদয়'

১. **হৃদয়ে** নলিনী দল সংনাহা করে।। (বড়ু চণ্ডীদাস)
২. **হৃদয়**ক মৃগমদ গীমক হার। (বিদ্যাপতি)
৩. তইঅও কাম **হৃদয়** অনুপাম। (বিদ্যাপতি)
৪. **হৃদয়জ** মুকুলি হেরি হেরি থোর। (বিদ্যাপতি)

৫. **হৃদয়ে** বিরাজিত মোতিম হার। (গোবিন্দদাস)

৬. পরি নানা আভরণে অবশেষে পড়ে মনে
হৃদয়ে কাঁচুলী আচ্ছাদন। (মুকুন্দরাম)

৭. ষন্ন থাল জিনিয়া **হৃদয়** পরিপাটী। (আলাওল)

'হিরদয়'

১. কুচ গোলা দুই **হিরদয়** লাএ। (জায়সী)

২. **হিরদয়** মুকুল হেরি হেরি থোর। (বিদ্যাপতি)

'হিয়'

১. জারেঁা ওহি হরদি অস **হিয়রা**। (জায়সী)

২. সহি নহিঁ সকহু **হিয়ে** পর হারু। (জায়সী)

৩. কুচ কুমকুমে মাখল **হিয়** তোর। (বিদ্যাপতি)

৪. **হিয়ে** হীর-হার অলস লোল। (জ্ঞানদাস)

'হিয়া'

১. হুলসি **হিয়া** কঞ্চুকি ন সমাঈ। (জায়সী)

২. কেহরি লঙ্ক কুঁভস্থল **হিয়া**। (জায়সী)

৩. **হিয়ায়** হিয়ায় লাগিব লাগিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে।
(জ্ঞানদাস)

৪. লাখ লাখ যুগ হিয়ে **হিয়া** রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল। (বিদ্যাপতি)

আধুনিকযুগে 'কুচ' শব্দটি আর ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হ'তে দেখা যায় না। মধুসূদন শুধু সেই পুরাতন সুবাসকে রক্ষা করেছেন---

১. তাঁর **কুচা**কার ধরে সে ফুল-রতন! (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য)

২. রতির **কুচ**-যুগল গড়িলা বিধাতা; (ঐ)

৩. দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে (ঐ)
কুচ-যুগ।

৪. ধক্‌ধকে রত্নাবলী **কুচ**-যুগমাঝে (মেঘনাদবধ কাব্য)

৫. আচ্ছাদন-ছলে ঢাঁকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, (ঐ)

৬. . . . সে উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গ সম। (ঐ)
৭. নম্র শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ! (বীরাঙ্গনা কাব্য)

'তন', 'কুচভার', 'পয়োভার', 'হিরদয়', 'হিয়', 'হিয়া',—শব্দগুলো মধ্যযুগের গণ্ডী পেরিয়ে আধুনিককালে চলে আসতে পারেনি। এদের মধ্যে 'পয়োভার' শব্দটিকে আধুনিক কবি 'পয়োধরভার'—রূপে ব্যবহার করেছেন—

১. পয়োধর ভার-ভরে
চলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে।[১] (বিহারীলাল)

আধুনিক কবি 'কুচভার' শব্দ ব্যবহার করেননা—তার পরিবর্তে ব্যবহার করেন 'স্তনভার' শব্দটি—

১. স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরনীর বক্ষে ধর চাপি[২] (রবীন্দ্রনাথ)
২. কিংবা কাম দংশনে অর্পন করি উদ্বেল, সচ্ছল,
অপরূপ স্তনভার[৩] (বোদলেয়ার/অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)
৩. স্তনভারে সূর্যগন্ধী ফলের সোনালি[৪] (শামসুর রাহমান)

'স্তন্য', 'স্তন', 'পয়োধর', 'উরস', 'উরজ', 'উর', 'বক্ষ', 'বুক', 'হৃদয়',—এই শব্দগুলো পুরাতন কালের গণ্ডী পেরিয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত আসতে পেরেছে । আধুনিককালের সাহিত্য থেকে গুটিকয়েক উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে—

'স্তন্য', ১. শতলক্ষ আনন্দের স্তন্যরস সুধা[৫] (রবীন্দ্রনাথ)
২. হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।[৬] (নজরুল)
৩. বুভুক্ষিত তপ্ত হিয়ায় স্তন্য তৃষা জাগছে। রে।[৭] (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

---

১. [সঙ্গীতশতক] ২. 'সমুদ্রের প্রতি' [সোনার তরী] ৩. 'পিশাচীর রূপান্তর' [বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা] ৪. 'নিরুদ্দেশ দেওয়াল' ৫. 'বসুন্ধরা' [সোনার তরী] ৬. 'বারাঙ্গনা' ৭. 'রোগশয্যায়' [স্বর্ণ সন্ধ্যা (কুমুদ কাব্য মঞ্জুষা)]

৪. রস-স্তন্যে বৃক্ষ বক্ষ সরসিয়া সুশ্যামল করি[১] (সুফিয়া কামাল)
৫. বুধ এক ব্যাঘ্রঋতু; শিশু স্বপ্নে মিনার্ভার স্তন্য পান করে[২]
(অনন্য রায়)

'স্তন'

১. সে আঁচল ইন্দ্রানীর পীনস্তনোপরি[৩] (মধুসূদন)
২. তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি পড়ে তারা।[৪] (রবীন্দ্রনাথ)
৩. সেই স্তনে হায় কামুড় মারিয়া মৌলবী সে যে ছল[৫] (জসীমউদ্‌দীন)
৪. স্তন খুলে, বাহু মেলে পরিস্রুত লালসায় হাসে;[৬] (বুদ্ধদেব বসু)
৫. বল্কলশাসনমুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয়[৭] (মনীশ ঘটক)
৬. যে নারী জানালার পাশে ছিল, কেঁপে উঠল তার বাম স্তন[৮]
(সমরেন্দ্র দাস)
৭. পেয়ে গেল একদিন নারীর ত্বকে, চিবুকে, স্তনে[৯] (পূর্ণেন্দু পত্রী)
৮. কুমারী নারীর স্তন লোভাতুর শাড়ির আঁচল[১০] (মোহাম্মদ রফিক)

'পয়োধর'

১. ডালিম হরিল তব পয়োধর ভাব।[১১] (ঈশ্বরগুপ্ত)
২. **পয়োধর** পিয়ে সুখে[১২] (বিহারীলাল)

---

১. 'সে কি কভু জানে' [মায়াকাজল]
২. 'সূর্য্যিমামা' [কালের কবিতা]
৩. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (প্রথম সর্গ)]
৪. 'উর্বশী' [চিত্রা]
৫. [সকিনা]
৬. 'বৃদ্ধকবি' [স্বাগত বিদায়: অন্যান্য কবিতা]
৭. 'পরমা' [কালের কবিতা]
৮. 'ওঁ পদ্ম' [কালের কবিতা]
৯. 'শিল্পের কাছে যেতে যেতে' [আমিই কচ আমিই দেবযানী (পূর্ণেন্দু পত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতা)]
১০. 'খ' [কীর্তিনাশা]
১১. 'শীতকালের প্রভাতে'
১২. [সাধের আসন]

৩. চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।[১] (রবীন্দ্রনাথ)

৪. অর্ধনমিত পয়োধরের তামাটে উত্তুংগতায়[২] (হাবীবুর রহমান)

'উরস'

১. উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস আনন্দ-বনে।[৩] (মধুসূদন)

২. উরস্ত্রানাবৃত উচচ **উরস** সুন্দর।[৪] (নবীনচন্দ্র সেন)

৩. **উরসে** পরি যুথীর হার[৫] (রবীন্দ্রনাথ)

৪. উঘারি বুকের বাস পুরায় বিচিত্র আশ
উরস পরশি নিজ হাতে।[৬] (যতীন্দ্রমোহন বাগচী)

৫. তোমার **উরস**স্বর্গে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর ;[৭] (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

৬. **উরসে** খচিত চন্দন-লেখা, চরণে চঞ্চলতা[৮] (আবদুল কাদির)

'উরজ'

১. জ্যোৎস্না তোমার পীড়িত **উরোজে**
বিথারে প্রলেপ সিত মলয়জে ;[৯] (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

২. **উরজ** পুষ্পের মত চুল ছানি দুই হাত দিয়ে ;[১০] (বুদ্ধদেব বসু)

'উর'

১. **উর**হি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর মম বাঁধহ চম্পকমালে[১১] (রবীন্দ্রনাথ)

২. তারি সঞ্চিত আনন্দ ঝলে ঐ **উর**-হার মণিকায়।[১২] (নজরুল)

---

১. 'স্বপ্ন' [কল্পনা]
২. 'যদি দেখা হতো' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]
৩. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (তৃতীয় সর্গ)]
৪. [ত্রয়ীকাব্য (প্রভাস)]
৫. 'অপেক্ষা' [মানসী]
৬. 'যৌবন চাঞ্চল্য' [কাব্য মালঞ্চ]
৭. 'ভবিতব্য' [অর্কেস্ট্রা]
৮. 'যৌবনবতী'
৯. 'অর্কেস্ট্রা' [অর্কেস্ট্রা]
১০. [কঙ্কাবতী]
১১. '৩১' [গীতহিতান (প্রকৃতি)]
১২. 'বধূ বরণ' [সিন্ধু-হিন্দোল]

'বক্ষ'

১. সুভদ্রার **বক্ষ** শান্তি শতদল[১] (নবীনচন্দ্র সেন)

২. **বক্ষ** হ'তে লহ টানি
অঞ্চল তোমার[২] (রবীন্দ্রনাথ)

৩. নিরাবরণ **বক্ষে** তব নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন ঊষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।[৩] (রবীন্দ্রনাথ)

৪. খসিয়া পড়া আঁচলখানি **বক্ষে** তুলি দিল।
আপন পানে নেহারি চেয়ে শরমে শিহরিল।[৪] (রবীন্দ্রনাথ)

৫. হার একছড়া গুরু**বক্ষের** গুমর মাখানো যাতে[৫] (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

৬. তোমার **বক্ষ** উত্থিত হবে আমার দিকে
সময় সমুদ্রের দুই প্রবল তরঙ্গের মতো[৬] . . . (বুদ্ধদেব বসু)

'বক্ষস্থল'

১. পরি **বক্ষস্থলে** হেম-কমলের দাম,[৭] (মধুসূদন)

২. তব অই **বক্ষস্থল** লাবণ্যেতে ঢলঢল[৮] (কায়কোবাদ)

৩. নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।[৯] (রবীন্দ্রনাথ)

'বুক'

১. আধো চাঁদের কনকমালা দোলানু তব **বুকে**।[১০] (রবীন্দ্রনাথ)

২. **বুকে বুকে** সেথা বাঁকা ফুল-ধণু, চোখে চোখে ফুল বাণ।[১১]
(নজরুল)

---

১. [ত্রয়ীকাব্য (প্রভাস)]
২. 'জ্যোৎস্নারাত্রে' [চিত্রা]
৩. 'সাগরিকা' [মহুয়া]
৪. 'নিদ্রিতা' [সোনার তরী]
৫. শেষদান [অজয় (কুমুদ কাব্য মঞ্জুষা)]
৬. 'পদধ্বনি' [নতুন পাতা]
৭. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য]
৮. 'পাষাণময়ী' [অশ্রুমালা]
৯. 'বিজয়িনী' [চিত্রা]
১০. 'সাগরিকা' [মহুয়া]
১১. 'পাপ'।

৩. স্মরণ ক'রে চিবুক তোমার **বুকের** তোমার ঠাম[১] (নজরুল)

৪. আমার চোখে তোমার দুই **বুক**
স্বর্গের স্বপ্নের মতো;[২] (বুদ্ধদেব বসু)

৫. নরম সোনালি দুই **বুক** যেন স্বর্গভূমি[৩] (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

৬. আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখো **বুকের** গঠন[৪] (আল মাহমুদ)

৭. রাঙা ডালিমের মতো **বুকে** তোমার ঢেলে দিয়েছি স্বপ্ন[৫]
(মনীন্দ্র রায়)

৮. বৃথাই বস্ত্রে ঢাকিস **বুকের** ললিত চূড়া[৬] (পবিত্র মুখোপাধ্যায়)

৯. . . . . কানের পাশে গড়াচ্ছে জল।
চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বুকের অন্তরঙ্গতায়।[৭] (দীপক রায়)

'হৃদয়'

১. **হৃদয়ে** তরঙ্গ দুটি।[৮] (নবীনচন্দ্র সেন)

২. মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন **হৃদয়ের** তীরে।[৯] (রবীন্দ্রনাথ)

৩. কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ **হৃদয়**,[১০] (রবীন্দ্রনাথ)

৪. প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে **হৃদয়ের** তালে।[১১] (রবীন্দ্রনাথ)

৫. হেরো নারী **হৃদয়ের** পবিত্র মন্দির।[১২] (রবীন্দ্রনাথ)

---

১. 'চৈতী হাওয়া' [ছায়ানট]
২. 'এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে' [নতুন পাতা]
৩. 'সুন্দরের পাশে' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৪. 'অহোরাত্র' [লোক লোকান্তর]
৫. 'ক্রীতদাস' [কালের কবিতা]
৬. 'কোনো সুন্দরী মহিলাকে' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]
৭. 'স্নাত' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]
৮. [ত্রয়ী কাব্য (রৈবতক)]
৯, — ১২. 'স্তন' [কড়িও কোমল]

৬. **হৃদয়** আকাশে দুইটি নয়ন
তিলকাঞ্জন উজ্জীবন[১] (সৈয়দ আলী আহসান)

৭. একদা **হৃদয়ে** তার দুলতো মাধবীকুঞ্জলতা[২] (শামসুর রাহমান)

'তনু' শব্দটি আদিমধ্যযুগে অর্থসঙ্কোচে স্তন সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। 'যৌবন', 'অঙ্গ'--এই শব্দদ্বয় অর্থসঙ্কোচে স্তন সম্পর্কে মধ্যযুগেও ব্যবহৃত হয়েছিল--এখনও হয়। এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে 'যৌবন' শব্দটিই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইন্দ্রিয়,' 'ত্বক'—এ ধরনের শব্দ সাম্প্রতিককালে অর্থ-সঙ্কোচে স্তন সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত উদাহরণগুলো ধৃত হলো—

'তনু'

১. যৌবন গড়িলে তোর **তনু** হবে লাউ। (বড়ু চণ্ডীদাস)

'যৌবন'

১. নহুলী **যৌবন** কাঁচ শিরিফল। (বড়ু চন্ডীদাস)

২. উন্নত **যৌবন** মোর দিনে দিনে শেষ। (বড়ু চন্ডীদাস)

৩. বিকসিত বনে যেন কুসুম্ব ললিত।
তেন মতে হৃদে তোর **যৌবন** ফুটিত।। (দৌলৎ কাজী)

৪. ঢলি যায় **যৌবন**... (দৌলৎ কাজী)

৫. নবীন **যৌবন** তাহে ভার। (সৈয়দ হামজা)

৬. **যৌবনের** ভারে কন্যা সামনে পড়ে এলি।[৩] (লোক কবি)

৭. নিরখিলা নত করি শির, পরিস্ফুট
দেহতটে **যৌবনের** উন্মুখ বিকাশ।[৪] (রবীন্দ্রনাথ)

---

১. 'যেখানেই তুমি' [সহসা সচকিত]
২. 'একদিন রাস্তায়'
৩. কমলা [মৈমনসিংহ গীতিকা] সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
৪. [চিত্রাঙ্গদা]

৮. ঋষিকন্যাদলে
পেলব **যৌবন** বাঁধি পরুষ বন্ধলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।[১] (রবীন্দ্রনাথ)

৯. **যৌবন** ফুলে ব্রততীর মত ভারনত তনুলতা[২] (আবদুল কাদির)

'অঙ্গ'

১. আগর চন্দন অঙ্গে মাখী। (বড়ু চণ্ডীদাস)

২. চন্দ লেপই অঙ্গে। (গোবিন্দদাস)

৩. হিয়ায় ছিয়ায় লাগিব লাগিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে। (জ্ঞানদাস)

৪. ঈষৎ উন্নত কুচ হেম বিম্ব রঙ্গ।
অঙ্গের লাবণ্য পেখি অতনু অনঙ্গ।। (শা' বারিদখান)

৫. অঙ্গে আঁচল স্থনীল বরণ।[৩] (রবীন্দ্রনাথ)

৬. অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।[৪] (রবীন্দ্রনাথ)

'ইন্দ্রিয়'

১. কোমল **ইন্দ্রিয়** ভেবে দুই ওষ্ঠে ছুঁয়েছি পাথর।[৫] (মহাদেব সাহা)

'ত্বক'

১. মনে পড়ে সে কার ফ্রকের অন্তরালে উন্মীলিত হিরন্ময়
মসৃণ **ত্বকের** অন্তরঙ্গতায় তুমি রেখেছিলে মুখ ;[৬] (শামসুর রাহমান)

২. আর তার রোমহর্ষ **ত্বক**
বাদামি, মসৃণ, স্নিগ্ধ—মনে হয় স্বর্গের সম্ভার।[৭] (বোদলেয়ার/ অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

---

১. 'তপোবন' [চৈতালি]
২. 'যৌবনবতী'
৩. 'অভিসার' [কথা ও কাহিনী]
৪. 'স্বপ্ন' [কল্পনা]
৫. 'ভুল সঙ্গ ভুল সহবাস'
৬. 'যে আমার সহচর' [বিধ্বস্ত নীলিমা]
৭. 'অলংকার' [বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা]

৩. পুঞ্জ পুঞ্জ আঙুরে টসটসে তোমার ত্বক।[১] (পাব্‌লো নেরুদা/ অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

'মাই'-এই নিতান্ত লৌকিক নাম ব্যবহার করেছেন ঈশ্বরগুপ্ত--

১. শিশুটি না প্রথমে জন্মিলে একধার।
মাই খেত কখনো পেতনা সংস্কার।[২]

২. সংস্কারে এক্ষণে খেতেছে তাই মাই।[৩]

শব্দটি এক ঈশ্বরগুপ্ত ছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগে আর কোন কবির হাতে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়নি। ঈশ্বরগুপ্তের পক্ষে এমন শব্দ ব্যবহার খুবই সঙ্গত। তাঁর কবিতায় 'মাগী', 'রাঁড়ী', 'ছোঁড়া, 'ছুঁড়ী',—এ ধরনের লৌকিক শব্দ হরদম ব্যবহৃত হয়েছে--যে শব্দগুলো তাঁর যুগে অশ্লীল ব'লে গণ্য হতো না। সন্ধিযুগের এই কবি কবিয়াল, আখড়াই, হাফ-আখড়াইয়ের দলে যোগ দিয়েছিলেন ব'লে এবং কবিতায় তিনি অনেক প্রাত্যহিক তুচ্ছতা এবং লৌকিকতাকে আবাহন জানিয়েছিলেন বলেই এমন শব্দ ব্যবহার তাঁর পক্ষে সঙ্গত হয়েছে। অতি-আধুনিক কালে 'মাই' শব্দটি আর একজন কবির হাতে ব্যবহৃত হ'তে দেখা গেছে। হিংস্র এবং অনুভূতিপীড়ক দৃশ্যসৃজনের উদ্দেশ্যে শব্দটিকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন---

৩. একজন
লোলচর্ম বৃদ্ধ মারহাবা ব'লে তার নকল সফেদ দাঁতে
কুটিকুটি
কাটছেন কিশোরীর মাই।[৪] (শামসুর রাহমান)

রবীন্দ্রযুগে 'স্তন' শব্দটির সীমিত ব্যবহার হয়েছে-- বেশী ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রতিশব্দ। কিন্তু অতি-আধুনিক কবিরা সরাসরি 'স্তন' শব্দটির ব্যবহার খুব পছন্দ করেন। 'স্তনের' কোন প্রতিশব্দও এঁদের পছন্দ নয়।

'স্তন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করেনা। 'স্তন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে, 'যে শব্দ করে'—("পীন

১. 'গাথা ও বিলাপ' [পাবলো নেরুদার কবিতা]
২-৩. 'পিতা ও পুত্র : তত্ত্বচিন্তা'
৪. 'ভীতিচিহ্নগুলি' [ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা]

শব্দে উচচ আর স্তন শব্দে রব''---নন্দকুমার কবিরত্ন-অনূদিত 'চৌর পঞ্চাশৎ')। অবশ্য এখন শব্দটির অর্থব্যাপকতা হারিয়ে গিয়ে অর্থসঙ্কোচ হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু বলেন---"'স্তন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যে শব্দ করে (অর্থাৎ জানিয়ে দেয় যৌবন আগত), একথা আভিধানিক ছাড়া আর কেউ না জানলে ক্ষতি নেই, একটি নারীঅঙ্গের নাম হিসেবেই তা আমাদের কাছে গ্রাহ্য। (রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী'তে ছাড়া আদি অর্থে এই শব্দের ব্যবহার বাংলায় আমি আর কোথাও পেয়েছি ব'লে মনে পড়ে না।) এবং এই নামের মধ্যে একটা ছবিও বিধৃত হ'য়ে আছে. উচচারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই যা আমাদের মনে ভেসে ওঠে।"[১] সে যাহোক, লক্ষ্য করা গেল, নারীবক্ষকে কবিরা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী একেক নামে অভিহিত করেন। তবে যে নামেই নারীবক্ষকে অভিহিত করা হোক না কেন---নারীর এই বক্ষপ্রসঙ্গ উত্থাপনকালে কবিরা সবাই হয়ে পড়েন রূপবিস্মিত।

নারীর এই উদ্দীপক বক্ষ যেমন বিহ্বল করে চিত্রকর, ভাস্করকে, তেমন কবিকে। এঁরা সকলেই রূপদর্শী। এঁদের প্রকাশমাধ্যমগুলোই শুধু আলাদা। এঁদের মধ্যে কেউ রেখায় রঙে সেই অভাবিত রূপকে দেন অভিব্যক্তি, বাটালি দিয়ে কেটে কুঁদে নিশ্চল মর্মরে কেউ নিয়ে আসেন যৌবন ও জৈবতার স্পন্দমানতা, আর কেউ বা হৃদয় খুঁড়ে অলৌকিক শব্দাবলী এনে তাতে মিশিয়ে দেন ক্ষমতা—বিচিত্র রূপচ্ছবি নির্মাণের। এইসব রূপ-

১. 'ভূমিকা : সংস্কৃত কবিতা ও 'মেঘদূত' [কালিদাসের মেঘদূত] অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

তন্ময় শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কত যে অমিল একজন চিকিৎসক অথবা একজন নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গির! কুচদর্শনকালে চিকিৎসকের যে দৃষ্টি--- তা যেন এক্সরে-দৃষ্টি। কুচের অভ্যন্তরে কত সংখ্যক শিরা উপশিরা ধমনী ক্রিয়াশীল, তাদের কতগুলো বৃন্তমুখে সম্মিলিত, দুগ্ধ-নির্গমণ-উদ্দেশ্যে বৃন্তে কয়টি ছিদ্রপথ বিদ্যমান—একজন চিকিৎসকের ত্বকভেদকারী দৃষ্টি শুধু এসবই লক্ষ্য ক'রে থাকে। একজন চিকিৎসকের কাছে কুচবৃত্তান্ত জানতে চাওয়া হ'লে তিনি উপরোক্ত তথ্যাদির সঙ্গে আরো বলতে পারবেন মাতৃদুগ্ধে 'ল্যাকটোজ' অথবা 'ইমোনোগ্লোবলিনে'র পরিমাণ কতটুকু, শিশুর দুগ্ধ-পান-কালে কোন্ শিরা উত্তেজিত হ'য়ে কিভাবে অবস্থান করে যেজন্য জননী ঋতুবতী হননা অতএব ত্বরান্বিত গর্ভধারণ এবং স্তনে কর্কটরোগ হবার সম্ভাবনা থাকেনা, ইত্যাদি যথেষ্ট অজানা তথ্য কিন্তু তিনি ভুলেও কখনো উচ্চারণ করতে পারবেননা—

তোমার যে স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত-
দেখেছি অস্পষ্টতম আমি শুধু আভাস যাহার,
যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ—উন্মাদ,
জানি, তাহা স্ফীত হবে সদ্যোজাত অধরের শোষণ-তিয়াযে
......সব আমি জানি, তবু তাই ভালোবাসি,
জানি ব'লে আরো বেশী ভালোবাসি।[১]

নবজাতকের অধরের শোষণ-তৃষ্ণা পয়োধরকে স্ফীত করে—এ তথ্য চিকিৎসকই দিয়েছিলেন। তবু কবি যেভাবে বললেন—চিকিৎসক কখনো এভাবে বলতে পারবেননা। কবির সেই অলৌকিক শব্দজাল হৃদয়ের আবেগকে কেমন উছলে তুলেছে! নবজাত অধর স্তনকে স্ফীত ক'রে তুলবে অর্থাৎ কবির একান্ত সম্পদ সদ্যভূমিষ্ঠ একজন অধিকার করবে---একথা জানা সত্ত্বেও ঈর্ষা-মুগ্ধতা-মিশ্রিত কবি-হৃদয় প্রেয়সীর কুচদ্বয়কে আরো ভালোবাসছে—

সব আমি জানি, তবু তাই ভালোবাসি,
জানি, ব'লে আরো বেশি ভালোবাসি।

---

১. 'প্রেমিক' [বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা] বুদ্ধদেব বসু

নৃতাত্ত্বিক কুচের অভ্যন্তরভাগে দৃষ্টিচালনা করেননা—বহির্ভাগের গঠন-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রে কুচের শ্রেণীবিন্যাস ক'রেই তিনি তুষ্ট। দেশীয় লৌকিক্ নৃতত্ত্ব[১] অনুযায়ী গঠন-প্রকৃতি বিচার ক'রে বঙ্গদেশীয় রমণীর কুচকে চারভাগে বিভক্ত করা হ'য়েছে, যথা—

(১) ঝোলা মাই---(কম মেদসম্পন্ন লম্বাটে স্তন—অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিক চওড়া)

(২) থলে মাই---(গোড়ার দিক শিথিল, অগ্রভাগ মেদবহুল, স্থূল। দেখতে থলের মত।)

(৩) চ্যারাকে মাই---(প্রদীপাকৃতি। এরকম স্তনের উপরিভাগ নীচু হ'য়ে এসে মধ্যাংশে প্রদীপের গর্ভ নির্মাণ করে। অগ্রভাগ যেন চুচুকরূপ সলতে ধারণ করতেই অকস্মাৎ উঁচু হ'য়ে ওঠে।)

(৪) খাড়া মাই----(এরকম স্তন দীর্ঘ হয়না, ক্ষুদ্রাকৃতি বা মাঝামাঝি পর্যায়ের হয়। গোড়ার দিক মেদবহুল এবং অগ্রভাগ সরু এই স্তনের মধ্যভাগ (body) থাকেনা বললেই চলে।)

নৃতত্ত্ববিদেরা চুচুক ও তার চারপাশের রঙের প্রকৃতি অনুযায়ীও স্তনের শ্রেণীভেদ করেছেন, যেমন—(১) কালো (২) ছাইয়ে (৩) বাদামি ও (৪) লাল। স্তনবৃন্তের সমতল ও উচচ অবস্থাভেদেও স্তন দু'রকম। কোনো কোনো কুচবৃন্তের বৃত্তাকার অংশটি সমান। কোনোটি আবার উঁচু ঢিবির মত।

কুচের উপরোক্ত বহিরঙ্গ গঠন কবিও লক্ষ্য করেন—কিন্তু নৃতাত্ত্বিকের তুলনায় তাঁর বলার ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। প্রদীপাকৃতি স্তন সম্পর্কে কবি বলেন---ও দুটি প্রদীপই বটে কিন্তু পুরুষ-পতঙ্গকে পুড়িয়ে মারার জন্য ওর চেয়ে সুমোহন প্রদীপ কি আর আছে? কবির সেই অলংকৃত কথাটি

১. দেশীয় লৌকিক নৃতত্ত্বের কথা বলা হ'লো এই কারণে যে, বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্বে রমণীর স্তন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আদৌ কোনো আলোচনা করা হয়নি।

এমন—'দুই দীপ সঙ্গোগ পতঙ্গ নাশিবার' (দোনা গাজী)। 'খাড়া স্তন' সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক-প্রদত্ত ব্যাখ্যা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কবি যখন এই 'খাড়া স্তন'কে 'উচ কুচযুগ কনকগিরি'[১] নাম দেন—তখন সুতীক্ষ্ণ সু-চূড় দু'টি স্বর্ণালী পাহাড় যেন দৃঢ় উন্নত কঠিনতায় মোহন-উজ্জ্বল রূপে পাঠককে মুহূর্তে মোহান্ধ ক'রে তোলে। অন্যত্র আমরা দেখবো 'খাড়া স্তন'কে বসনমুক্ত দেখে কবি কি বলেন—

উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস। (গোপাল দাস)

কবি বিবসন তুঙ্গ কুচদ্বয় দেখেছেন, আর দেখেছেন সেই কুচধারিণীর মৃদু ইঙ্গিতজড়িত হাসি। অমনি তাঁর হৃদয় দুলে উঠেছে। আর সেই দোলটিকে অনুপ্রাসের ঝাঁকুনি মেরে ছন্দের মধ্যে দিয়েছেন দুলিয়ে—

উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস।

চিকিৎসক এবং নৃতাত্ত্বিকের কুচদর্শনের তুলনায় কবির কুচরূপপ্রেক্ষণ কত ভিন্ন।

যে দেশে এবং যে কালেই জন্মান না কেন, একইরকম স্বভাব সব কবিদের। রূপ দেখলেই তাঁরা হ'য়ে পড়েন মোহব্যাকুল এবং তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র বাহু মেলে ধরতে চান সুরঙিন স্বপ্নলোকে উড্ডীন বর্ণাঢ্য অপরূপ

---

১. জ্ঞানদাস

শব্দাবলীকে। রমণীর অহংকারী তুঙ্গ বক্ষ যেন এক ঐন্দ্রজালিক উপলব্ধির সুনির্মিত সিংহদ্বার। তার সামনে সকল কবিই সম্মোহিত, অভিভূত, অপলক। বহু-ব্যবহৃত রমণীর এই বক্ষ-প্রসঙ্গ প্রত্যেক কবির কাছেই যেন নতুন আবিষ্কার---নতুন উন্মোচন।

মুগ্ধ হ'য়ে কেউ একে 'উদার উদারতর' ব'লে অভিহিত করেন---এবং প্রণয়ী না শিশু—কার জন্য যে এই স্তন-বিকাশ ঘটে তা বুঝে উঠতে পারেননা—

উদার উদারতর
রমণীর পয়োধর
না জানি কাহার তরে সময়ে প্রকাশ পায়। (বিহারীলাল)

এ বিষয়ে আলাওল ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন কুচ যুবকের জন্য আনন্দ আর বালকের পক্ষে জীবন---'যুবকুলানন্দ হৃদে বালক জীবন'।[১] কুচ শিশুর জীবনরক্ষাকারী অঙ্গ---একথা জানা সত্ত্বেও কুচের প্রতি কবির মোহন মোহ কিন্তু কিছুই কমেনা—

যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ---উন্মাদ,
জানি, তাহা স্ফীত হবে সদ্যোজাত অধরের শোষণ-তিয়াষে।
···সব আমি জানি, তবু---তাই ভালোবাসি।[২] (বুদ্ধদেব বসু)

কেউ বলেন স্তন কোমল---'টেনে নাও আমায় তুমি ফুটফুট নরম বুকে,'[৩] (বুদ্ধদেব বসু) ; কেউ বলেন কঠোর---'কিছু যে হতে পারে এত দৃঢ়... জানতামনা।[৪] (আব্দুল্লাহ-আল-মুসী)। কেউ বলেন আসলে একই সঙ্গে লোভনীয় কঠোরতা আবার রমণীয় কোমলতা স্তনকে পরিণত করেছে বিস্ময়োদ্রেককারী অঙ্গে---'কমলিনী কুচযুগ কোমল কঠোরে॥' (রায়-শেখর)। কুচদ্বয় কঠিন বটে---কিন্তু লোহালক্কড়ের মত কঠিন নয়। কুচের কঠিনতা এবং কোমলতা---দুটোই এমন ধরনের যে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায়না। তাই কবি কুচবর্ণনাকালে বিস্ময় প্রকাশ হয় এমন শব্দ বেছে নেন---(১)

---

১. [পদ্মাবতী]
২. 'প্রেমিক' [বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা]
৩. 'গান' [একটি কথা]
৪. [শতদেশের কবিতা]

'অভ্ভূত কঠিন স্তন হিয়া শোভে বড়ি।' (বিজয়গুপ্ত) (২) আশ্বাস পাই তার ভয়ংকর কোমল বুকের[১] (বুদ্ধদেব বসু)। কুচরূপ দেখে কবি এতই অভিভূত যে, তিনি নিজে বিস্মিত একথা বলার সাথে সাথে কুচযুগলকেও 'বিস্মিত' ব'লে অভিহিত করেন ...... ওই দুটি

বিস্মিত আপেল কোনো চিত্রশিল্পীকে দিয়ো
অনাবৃত উপহার সে আঁকবে আশ্চর্য তুলিতে
আমি হবো বিমুগ্ধ দর্শক।[২] (কৃষ্ণ ধর)

কুচমুগ্ধ কবি ভুলে যান যে, হরকোপানলে অনঙ্গ অতনু হ'য়েছিল। পুরাণ-বিস্মৃত কবি বলেন কুচের রঙ্গদর্শনেই অনঙ্গ অতনু হয়েছে---

ঈষৎ উন্নত কুচ হেম বিম্ব রঙ্গ
অঙ্গের লাবন্য পেখি অতনু অনঙ্গ ॥ (শা'বারিদ খান)

কোনো কবি নিজেই কাঁচুলি হ'য়ে এই প্রিয় অঙ্গকে জড়িয়ে থাকার বাসনা পোষণ করেন---'আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর[৩] (নজরুল)। আর যিনি হ'তে চান প্রেয়সীর গ্রীবাস্পর্শী মালা---নানান ছলে দুলে দুলে কুচ-চুম্বনের সলোভ বাসনা থাকে তাঁর মনে---

হতাম যদি ও করে অঙ্গুরী, কণ্ঠে মালা,
হৃদয় আলা।
রূপসী বালা।
মালারি মতন দুলিতাম তবে হৃদয়তলে
নানান ছলে,
বেড়িয়া গলে,[৪]
(মিশরীয় কবি/অনুবাদঃ সত্যেন্দ্রদত্ত)

স্তনদর্শনে শুভদিন সূচিত হয়---এমন সংস্কার ও অন্তরে লালন করেন কোনো কোনো কবি---

---

১. 'আশঙ্কা ও আশ্বাস' [নতুন পাতা]
২. 'তোমার বসন্ত' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]
৩. 'বিদ্রোহী' [অগ্নিবীণা]
৪. 'সাধ'

বক্ষ জঘন গুরু কটি ভেল খীন।
নয়নানন্দ দরশ শুভ দিন ।।

(নয়নানন্দ কবিরাজ)

সংস্কৃত কবিদের যেমন ধারণা, প্রিয়ার পদাঘাতেই অশোককুঞ্জ পুষ্পবতী হয়[১], তেমনি আধুনিক কবির ধারণা, নিঃশ্বাসে প্রিয়ার স্তন একবারটি দুলে উঠলেই মাটিতে সহস্র ফুলকলি মুখ তুলে তাকায়---

নিশ্বাসে যদি একবার তার বুকটি দোলে।
কত ফুলকলি অমনি মাটিতে মুখটি তোলে।

(মোহিতলাল মজুমদার)

প্রিয়ার বুকের বর্ত্তুল দু'টি যেন শঙ্কিত সঙ্কেতের মত--এ বিশ্বের যত আশা নিরাশা তাতে যেন লেখা আছে---রূপে যেন বন্দী হ'য়ে আছে অরূপের ভাষা--

আরও এক আছে নারী
বঙ্কিম গ্রীবায় তার--কটিতটে, নগ্ন বাহুমূলে
শঙ্কিত সঙ্কেত সম দুটি তার বুকের বর্ত্তুলে
আঁকা আছে এ বিশ্বের যত আশা যত সে নিরাশা
রূপে লেখা অরূপের ভাষা।

(মোহিতলাল মজুমদার)

রমণীর ঐ যুগ্ম বক্ষ দিতে পারে মিটিয়ে পুরুষের হৃদয়ের শান্তির পিপাসাকে, শাশ্বত আনন্দের ক্ষুধাকে--

তোমার পূর্ণ পবিত্র ঐ উদ্ধত স্তনের অন্তরালে
সত্যি যে যুগ্মবক্ষ—একটি পুরুষের মাথার
ভারবহনে সম্পন্ন সক্ষম,
একটি মানুষের হৃদয়ের শান্তির পিপাসা
যে মিটিয়ে দিতে পারে, দেয় মানুষের
শাশ্বত আনন্দের ক্ষুধাকে[২]

(মারিতানিয়ার কবি---লিওনেল আতুলি/অনুবাদ : নচিকেতা ভরদ্বাজ)

---

১. রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমাদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ।। [মেঘদূতম্] কালিদাস

২. 'ফেরা' [শতদেশের কবিতা]

সকল কালের সকল পুরুষের মনের বাসনাই যেন কুচরূপ ধারণ করে রমণীবক্ষে নীড় বেঁধেছে---

হেলেনের বুকে মনের বাসনা বেঁধেছে বাসা,
মনের বাসনা সকল কালের সব পুরুষের[১]

(বুদ্ধদেব বসু)

এই বাসনা-নীড়কে স্পর্শ ক'রে আশ্চর্যময়ী প্রিয়ার সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে অনুভব করেন কেউ বা—

বাড়িয়ে দু'বাহু বারে বারে তোমার দিকেই যাই
স্বপ্নচালিতের মতো, সম্মুখে দাঁড়াই,
দেখি আশ্চর্যের অক্ষরেই স্মিত লেখা
তোমার শরীর প্রতিবার, যদিও প্রত্যহ এই দেখা।
যেন ঐ হাত, গাল, ঠোঁট, জানু, সুহাস চিবুক,
সুগোল-স্পন্দিত বুক
ছুঁলেই তোমাকে পাবো, তুমি
হৃদয়ের ভূমি
সৌরভে ভরিয়ে দেবে, ফলাবে ফসল থরে থরে।[২]

(শামসুর রাহমান)

কেউবা আবার কুচস্পর্শ করে জুয়ায় বা লটারীতে জেতার আনন্দ অথবা বাণিজ্যে প্রচণ্ডভাবে লাভবান হবার আনন্দ উপভোগ করেন—

হাত দিয়ে খোঁজো তার সমস্ত বিভব
সুন্দরীর মুখ, চুল, জানু, উরু, পেট, তার অসহায় স্তন,
পাগল, মাতাল আর বিজয়ী কামুক তুমি ভাবো, সব এই
. . . . যেন আমি জুয়ায় জিতেছি, লটারীতে
পেয়েছি অনেক টাকা, বাণিজ্যে আমার মতো আর কেউ নেই-
বাণিজ্যে করেছি লাভ, আমি সুখী, শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে

(ওমর আলী)

---

১. 'কবিতা' [কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা]
২. 'স্পর্শ'।

পরশুরাম যখন পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করছিলেন, তখন বক্ষে নকল কুচ ধারণ ক'রেই রক্ষা পেয়েছিলেন রাজা দশরথ---

করিল পরশুরাম নিক্ষেত্রি জগত।
নারীবেশ ধরিয়া বাঁচিল দশরথ।
· · · বসনে করিল কুচ দুটি মনোহর।

(কৃষ্ণরাম দাস)

পরশুরাম গভীর চোখে দেখলে অবশ্য সেই স্তন যে কৃত্রিম তা বুঝতে পারতেন--কেননা রমণীর স্তনে যে মাদকতা থাকে সেই মাদকতা তাতে ছিলনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখি নৃত্যরত নারীবেশী রাজপুত সৈন্যদের কৃত্রিম স্তন পাঠান কেসর খাঁয়ের চোখে নেশা ধরাতে পারছেনা। ওরা যে ছদ্মবেশী, কেসর খাঁ সে সম্পর্কে অনবহিত। তাই তিনি বিস্মিত মনে ভাবছেন—

চোখে কেন লাগছে না কো নেশা,
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ—
বক্ষ কেন উঠছে নাকো দুলি[১],

এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে নারীর স্তনে এমন দারুণ সম্মোহন থাকে, যা পুরুষের চোখে নেশা ঘনিয়ে তোলে। নাচের তালে তালে কুচের মনোহর দোলন সেই নেশাকে আরো ঘনীভূত করে। লক্ষণীয় যে, কুচের মোহন সম্মোহনেব কথা সকল কবিই স্বীকার করেছেন। শুধু ব্যঙ্গপরায়ণ ঈশ্বর-গুপ্ত তাঁর নীতিকথা পর্যায়ের একটি কবিতায় ব্যঙ্গচ্ছলে এমন একটি মন্তব্য করেছেন, যা পড়ে রসিকমাত্রই আঁতকে উঠবেন। তিনি লিখেছেন—

যুবতীর স্তনদ্বয়ে মাংসপিণ্ড সার।
কনক কলস সহ তুলনা তাহার।।[২]

অবশ্য শুধু একবারই তিনি ব্যঙ্গ করেছেন—অন্যত্র আবার প্রশংসামুখর হয়েছেন।

---

১. 'হোরিখেলা' [কথা]
২. 'হিতমালা'।

বিস্ময়-মুগ্ধতার কারণেই কবিকূল কুচপ্রসঙ্গ উত্থাপনকালে প্রায়শঃই 'কুচ', তার প্রতিশব্দ এবং তার উপমানটিকে বিশেষণে ভূষিত ক'রে থাকেন। বিশেষণগুলো নানা রকমের, নানা রঙের, যেমন—পীন, তুঙ্গ, 'উতঁগ', উচ্চ, 'উচ', পীবর, বিকচ, আশ্চর্য, 'অপূরুব', 'ফুটিল', মনোরম, মনোহর, অনুপম, সুন্দর, চারু, নওলী, নব, শোভিত, বিকশিত, উন্মোচিত, উন্নত, সমুন্নত, নির্বিড়োন্নত, নগ্ন, দৃপ্ত, স্ফীত, মুকুলিত, পুষ্পিত, সুগোল, স্পন্দিত, সগর্ব, কঠিন, নরম, সোনালি, শুভ্র, মোহন, মোহিনী, নিটোল, মসৃণ পেলব, পেশল, পূর্ণিত, তেজী, উপচানো, লঘু, গুরু, উন্মুখ, উদ্দাম, উজ্জ্বল, উদ্ধত, 'হুলসই,' 'অনচাখে,' 'সুভর', 'মৈমন্তা' ইত্যাদি। এখন এ সম্পর্কিত উদাহরণগুলো চয়িত হ'তে পারে—

'পীন'—সেবে তোমা সুরবালা **পীন**পয়োধরা
ঘৃতাচী[১] (মধুসূদন)

'তুঙ্গ'—বল্কলশাসনমুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয়-[২] (মনীশ ঘটক)

'উতংগ'—(উত্তুঙ্গ) **উতংগ** জঁভীর হোই রখবারী। (জায়সী)

'উচ্চ'—উরস্ত্রানাবৃত **উচ্চ** উরস সুন্দর।[৩] (নবীনচন্দ্র সেন)

'উচ'—**উচ** কুচ মানয়ে ভার। (বিদ্যাপতি)

'পীবর'---ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর[৪]। (মধুসূদন)

---

১. 'অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' [বীরাঙ্গনা কাব্য]

২. 'পরমা' [কালের কবিতা]

৩. [ত্রয়ীকাব্য (প্রভাস)] ৪. [মেঘনাদবধকাব্য]

'বিকচ'---বিকচ বুকের কমল-কলিতে কামনার সমারোহ।[১]
(আবদুল কাদির)

'আশ্চর্য'—বিম্বাধর, কৃশকটি, করভোরু, প্রশস্ত জঘন,
আশ্চর্য যুগল স্তন,[২] (বুদ্ধদেব বসু)

'অপরূব'—(অপরূপ)--অপরূব কুচ চক্রবাক যুগল (বড়ু চণ্ডীদাস)

'ফুটিল'—(ফুটন্ত)-- ফুটিল কদমফুল ভরে নোয়াইল ডাল (বড়ু চণ্ডীদাস)

'মনোরম'— কুচযুগ মনোরম, নবীন শ্রীফল সম (দৌলত উজীর বাহরাম খান)

'মনোহর'—করিবর কুম্ভ জিনি কুচ মনোহর। (আলাওল)

'অনুপম, সুন্দর'—কনক সম্ভুসম অনুপম সুন্দর দুইপঙ্কজ দশ চন্দা।। (বিদ্যাপতি)

'চারু'—কুচযুগ চারু চকেবা। (বিদ্যাপতি)

'নওলী'—নওলী যৌবন কাঁচ শিরিফল (বড়ু চণ্ডীদাস)

'নব'—নব কুচে নখ দেখি জিউ মোর কাঁপে (বৈষ্ণব কবি)

'শোভিত'—তারপর শোভিত যুগল গিরিবর।। (রামপ্রসাদ সেন)

'বিকশিত'—বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়।[৩] (রবীন্দ্রনাথ)

'উন্মোচিত'—উন্মোচিত স্তনে তুলে কাঁপন, পরিশ্রমে, মদস্রাবে বিলোল-[৪]
(বুদ্ধদেব বসু)

'উন্নত'—সমান উন্নত স্তন তার গতি মন্দ। (রঘুনাথ ভাগবতাচার্য)

'সমুন্নত'— বিপুলং নিতম্বদেশে মধ্যে ক্ষামং সমুন্নতনং কুচয়োঃ।[৫]
(কালিদাস)

'নিবিড়োন্নত'—সংক্ষিপ্ত নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।[৬]
(কালিদাস)

---

১. 'যৌবনবতী'

২. 'কোনো বন্ধুর প্রতি' [বন্দীর বন্দনা]

৩. 'হৃদয়-আসন' [কড়ি ও কোমল]

৪. শঙ্করাচার্যের 'আনন্দলহরী' অবলম্বনে
'স্তোত্র' [বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা]

৫–৬. [মালবিকাগ্নিমিত্রম্]

'নগ্ন, দৃপ্ত'—নগ্ন দৃপ্ত স্তনভারে প্রলোভন সন্ত আন্তনির;[১]
(বোদলেয়ার/অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

'স্ফীত'— স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরনীরে বক্ষে ধর চাপি[২]
(রবীন্দ্রনাথ)

'মুকুলিত'—মুকুলিত থল কমল তনে। (বড়ু চণ্ডীদাস)

'পুষ্পিত'—স্পেনের নিঃশ্বাস হ'য়ে ব'য়ে চলেছে আজো পাহাড়ে,
সমুদ্রতটে, রমনীর পুষ্পিত বুকে,[৩]
(শামসুর রাহমান)

'সুগোল, স্পন্দিত'—সুগোল স্পন্দিত বুক
ছুঁলেই তোমাকে পাবো[৪], (শামসুর রাহমান)

'সগর্ব, কঠিন'—স্বগর্ব্ব, কটীন কুচে মুণ্ডিত কাঞ্চলি। (আলাওল)

'নরম, সোনালি'—নরম সোনালি দুই বুক যেন স্বর্গভূমি[৫]
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

'শুভ্র'—. . . হিমানীর মতো
শুভ্র নগ্ন দুটি স্তন।[৬] (পুশকিন/অনুবাদ: অসিত সরকার)

'মোহন'—ঐ তোর মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটায়[৭] (বোদলেয়ার/
অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

'মোহিনী'—তুঙ্গ তোমার মোহিনী বুকের চূড়া।[৮] (ফজল শাহাবুদ্দীন)

'নিটোল, মসৃণ'— যে স্তন রূপের আকর্ষণ

---

১. 'পাতকিনী' [বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা]
২. 'সমুদ্রের প্রতি' [সোনার তরী]
৩. 'আমার স্বরের ডালে'
৪. 'স্পর্শ'
৫. 'সুন্দরের পাশে' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৬. 'রূপসী মেয়ে তুমি' [পুশকিনের রচনা সংকলন]
৭. 'লিথি' [বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা]
৮. [তৃষ্ণার অগ্নিতে একা]

পুরুষের দৃষ্টি যাকে মহিমান্বিত করে তোলে
কবি যাকে বর্ণনায় করেছেন নিটোল মসৃণ[১]
(ওমর আলী)

'পেলব'— তোমার পেলব স্তনের
রাজ্যে এখনো যে কাঁপে আমার প্রাণের রৌদ্র।[২]
(ফজল শাহাবুদ্দীন)

'পেশল'—পেশল উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী[৩] (মধুসূদন)

'পূর্ণিত'— পূর্ণিত পীবর বুক,
শোভিছে বিদ্যুৎ দীপ্ত মেঘখণ্ড সম[৪] (নবীনচন্দ্র সেন)

'তেজী'—ঐখানে এক উন্মাদিনী নর্তকী দেখিয়েছিল তার তেজী স্তনের কাঁপন,[৫] (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

'উপচানো'— . . . . . উপচানো বুকে
বনের রহস্য কাঁপে যেন।[৬] (আল মাহমুদ)

'লঘু'—ও লঘু কুচ উতঙ্গ জম্ভীরা। (জায়সী)

'গুরু'—বক্ষ জঘন গুরু কটি ভেল খীণ (নয়নানন্দ কবিরাজ)

'উন্মুখ'—তোমার উন্মুখ স্তনে মুখ দিয়ে আমি ব্যবধাহীন বেঁচে রয়েছি[৭]
(শম্ভু রক্ষিত)

'উদ্দাম'—এগিয়ে আসে তোর নিটোল স্তনভার তুঙ্গ উদ্দাম[৮] (বোদলেয়ার অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

'উজ্জ্বল, উদ্ধত'— আর আমাকে টেনে নিয়ো তোমার কাছে
. . . .
তোমার উজ্জ্বল উদ্ধত বুকের মাঝখানে[৯]
(বুদ্ধদেব বসু)

---

১. 'রূপসী লাশ ও কতিপয় জিজ্ঞাসা' [প্রস্তরযুগ তাম্রযুগ]
২. [তৃষ্ণার অগ্নিতে একা]
৩. [মেঘনাদবধ কাব্য]
৪. [ত্রয়ী কাব্য (প্রভাস)]
৫. 'ধলভূমগড়ে আবার' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৬. 'অরণ্যে ক্লান্তির দিন' [লোক লোকান্তর]
৭. 'তবু তোমার সম্মোহনে জন্ম নিয়ে' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]
৮. 'সুন্দর জাহাজ' [বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা]
৯. 'সন্ধ্যায়' [নতুন পাতা (কবিতা সংগ্রহ "প্রথম খণ্ড")]

'হুলসই'— (উল্লসিত) হিঅ **হুলসই** কুচ কনক জঁভীরা।। (জায়সী)
'**অনচাখে**'—(অনাস্বাদিত) দারিউঁ দাখ ফরে **অনচাখে**। (জায়সী)
'**সুভর**' (পরিপূর্ণ)-উর অতি **সুভর** খীন অতি লঙ্কা। (জায়সী)
'**মৈমন্তা**' (**মদমত্ত**)-কুম্ভস্থল কুচ দোউ **মৈমন্তা**। (জায়সী)

কুচদ্বয়কে যে কত বিভিন্ন বিশেষণে বিচিত্র করা হয়-- সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা গেল। কখনো কখনো যে, বিশেষণকে মালার মত গাঁথা হয়েছে-- যেমন, "নিবিড় নির্মল কুচ মুকুল কোমল", [১] "হেলেনের বুক নিখুঁত, নিটোল, নরম, শাদা" [২] —সে সম্পর্কেও ধারণা হলো। ব্যবহার্য বিশেষণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে লাগসই এবং বহুব্যবহৃত বিশেষণ হচ্ছে—'উচচ' এবং 'পীন'। কুচের উচচতা এবং মাংসলতা কবিকূলের কাছে কাঙ্ক্ষিত ব'লে এই বিশেষণ দু'টি তাঁদের কাছে খুব প্রিয়। কুচপ্রসঙ্গ উত্থাপনকালে এই বিশেষণদু'টির উল্লেখও তাই কবিদের পরিচিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ব্যবহারে ব্যবহারে বিশেষণ দু'টির জৌলুষ কমে যাবার ভয় আছে জানা সত্ত্বেও কবিকূল এদের মোহ ছাড়তে পারেন না।

রমণীর কুচ একটি নয়--একজোড়া। যে কারণে কবিদের প্রয়োজন হয় কুচ, তার প্রতিশব্দ অথবা তার উপমানের সঙ্গে সংখ্যাবাচক শব্দযোজনার। এই

---

১. দৌলৎ কাজী
২. 'কবিতা' [কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা] বুদ্ধদেব বসু

১৬

58

সংখ্যাবাচক শব্দব্যবহারও তাঁদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সংখ্যাবাচক 'দুই' শব্দটিকে কুচ, তার প্রতিশব্দ বা উপমানের সঙ্গে যোজনা ক'রে তাঁরা কিভাবে ব্যবহার করেন—নীচে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হচ্ছে—

১. দৃঢ় করি **দুয়ি** তনে। (বড়ু চণ্ডীদাস)

২. উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই **দুই** স্তন বাহি[১] (রবীন্দ্রনাথ)

৩. যুবতীর স্তন **দ্বয়** তাহে কত লোভ হয়[২] (ঈশ্বরগুপ্ত)

৪. যেন বা **দুইটি** স্বর্ণস্তম্ভ উঠিয়াছে দেবলোকে[৩] (জসীমউদ্‌দীন)

৫. মমতার মধুভারে **দুটি** বক্ষ হইয়াছে পীন।[৪] (আবদুল কাদির)

৬. তুলার সমান **দুটা** মাংসপিণ্ড বুকে। (কৃত্তিবাস)

৭. তরঙ্গিত সরোবরে উঠিছে, পড়িছে,
ফুটোন্মুখ **যুগ্ম** তামরস।[৫] (নবীনচন্দ্র সেন)

৮. গিএ গজমুতী হার মনি মাঝে শোভে তার
উচ কুচ **যুগল** উপরে। (বড়ু চণ্ডীদাস)

৯. কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোক **যুগলা**। (বড়ু চণ্ডীদাস)

১০. উচ কুচ **যুগ** কনকগিরি (জ্ঞানদাস)

১১. ন জানল কতিখন তেজি গেল রে
বিছুরল চকেবা **জোর**। (বিদ্যাপতি)

১২. তেই উদসল কুচ **জোরা** (বিদ্যাপতি)

১৩. কনক-কটোর-চোর কুচ কোরক **জোরে**
উজোরিল মোতিমদাম।। (গোবিন্দদাস)

১৪. ডওফল **জোড়** নয়ান বিভোর, আঁখি সে সুন্দর
এহি সে পয়োধর রঞ্জিতা। (আলাওল)

---

১. 'গান্ধারীর আবেদন'

২. 'শীত'

৩. 'মালতীর ঘুম' [হলুদ বরণী]

৪. 'পৃথিবীর প্রেম' [উত্তর বসন্ত]

৫. [ত্রয়ীকাব্য (প্রভাস)]

১৫. আপনে মনসা দিল দুই স্তন জোড়া। (নারায়ণ দেব)

উপরের জরীপে দ্বিত্ববোধক শব্দের পনের রকম রূপ আমরা লক্ষ্য করেছি। তবে দ্বিত্বপ্রকাশক যে চারটি শব্দ কবিরা সর্বাধিক ব্যবহার করেন, সেগুলো হচ্ছে—'যুগল' 'যুগ', 'দুই' এবং 'দু'টি। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত এই শব্দগুলোর ব্যবহাররূপ এখন প্রত্যক্ষ করা যাক—

'যুগল'

১. স্তনচক্রবাক যুগলং[১] (কালিদাস)
২. শ্রীফলযুগল তোহোর তনে। (বড়ু চণ্ডীদাস)
৩. শ্রীফলযুগল জিনি কুচযুগ (চণ্ডীদাস)
৪. কুচযুগ মনোরম নবীন শ্রীফলসম
 কিবা নব নারাঙ্গযুগল। (দৌলত উজীর বাহরাম খান)
৫. তারপর শোভিত যুগল গিরিবর। (রামপ্রসাদ সেন)
৬. অবিরল শ্রীফল যুগল যেন দুটি। (মানিকরাম গাঙ্গুলি)
৭. একডালে ডালিম যুগল শোভাকার। (দোনা গাজী)
৮. কনক কটোরা তাহে যুগল সুমেরু।। (নওয়াজিস খান খোন্দকার)
৯. বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
 ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।[২] (রবীন্দ্রনাথ)
১০. বক্ষে তোমার
 যুগল কমল ফুল[৩] (জসীমউদ্দীন)
১১. তোমার যুগল স্তন স্বর্গ হয় রাত্রির নরকে।[৪]
 (শামসুর রাহমান)
১২. সে চায় আমাকে দেহের সীমিত আলস্যে
 স্তনযুগলের রহস্যময় বন্ধনে।[৫]
 (ফজল শাহাবুদ্দীন)

---

১. [শৃঙ্গারতিলকম্]
২. 'বিজয়িনী' [চিত্রা]
৩. 'বিমানবালা' [জলের লেখন]
৪. 'জর্ণাল, শ্রাবণ'
৫. 'সে' [তৃষ্ণার অগ্নিতে একা]

১৩. অথচ তুই সব দিয়েছিস, যুগল ঢেউ-এ-বুকের শোভা[১]
(শক্তিপদ ব্রহ্মচারী)

'যুগ'

১. ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে। (জয়দেব)
২. কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে। (বড়ু চণ্ডীদাস)
৩. কুচযুগ গিরি কনক কটোরি (চণ্ডীদাস)
৪. কুচযুগ চারু চকেবা। (বিদ্যাপতি)
৫. উচ কুচযুগ কনকগিরি। (জ্ঞানদাস)
৬. উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস। (গোপাল দাস)
৭. কুচযুগ হেমগিরি হর মনোহর। (ঘনরাম চক্রবর্তী)
৮. জিনিয়া কুঞ্জরকুম্ভ কুচযুগ ধরে দম্ভ। (মুকুন্দরাম)
৯. কুচযুগ তোর কনক কটোর; (দ্বিজ মাধব)
১০. দেখিয়া সুন্দর অতি কুচযুগ ভঙ্গি। (আলাওল)
১১. কুচযুগ মনোরম নবীন শ্রীফল সম (দৌলত উজীর বাহরাম খান)
১২. কুচযুগ মর্দন করএ নিরন্তর। (দোনা গাজী)
১৩. কেহ কারো যুগ কুচ চাপে ঘন ঘন। (আবদুল হাকিম)
১৪. ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচযুগমাঝে[২] (মধুসূদন)
১৫. ধরণীর স্তনযুগ করি দিব ক্ষত[৩] (মোহিতলাল মজুমদার)
১৬. বিশ্ব তোমার শরীর, সূর্য আর চন্দ্র তোমার স্তনযুগ[৪] (বুদ্ধদেব বসু)
১৭. চন্দন-অঙ্কনে স্নিগ্ধ স্তনযুগ---বিকশিত নীপ[৫] (অজিত দত্ত)
১৮. তুমি তার স্বপ্নে কেন বারবার স্তনযুগ যোনিজঙ্ঘা অধরোষ্ঠ নাভি নিয়ে জেগে ওঠো[৬] (তুষার চৌধুরী)

---

১. 'ভালোবাসতে দিলি না রে' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]
২. [মেঘনাদবধকাব্য]
৩. 'মোহমুদ্গর'
৪. 'শঙ্করাচার্যের 'আনন্দলহরী' অবলম্বনে স্তোত্র' [বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৫. 'মালতী' [অজিত দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৬. 'রূপকথার নিষ্ঠুরতা ও বহ্নিশিখা' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]

'দুই'

১. দৃঢ় করি দুয়ি তনে। (বড়ু চণ্ডীদাস)
২. মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল (বিদ্যাপতি)
৩. দুই স্তন হৈল জেন ডালিম্বের কুঁড়ি। (বিজয়গুপ্ত)
৪. গণ্ডশৈল দুই স্তন কপিল কেসভার। (মালাধর বসু)
৫. দুই স্তন দিল বামা দোহাকার মুখে। (মানিকরাম)
৬. স্তন দুই কমলের কলি। (জগজ্জীবন)
৭. কঠিন হিয়ার দুই শ্রীফল কঠিন। (আলাওল)
৮. কনক শ্রীফল দুই কিবা একডালে। (দোনা গাজী)
৯. উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি?[১] (রবীন্দ্রনাথ)
১০. চেয়ে দ্যাখো, দেবী, মোর দুই স্তন উঠেছে ফুলে,[২] (বুদ্ধদেব বসু)
১১. নরম সোনালি দুই বুক যেন স্বর্গভূমি[৩] (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

'দুটি'

১. সোনার কটুআ দুটি মানিকে পুরাআ। (বড়ু চণ্ডীদাস)
২. বসনে করিল কুচ দুটি মনোহর। (কৃষ্ণরাম দাস)
৩. কমল কলিকা, জিনে কিবা কুচ দুটি। (মানিকরাম গাঙ্গুলি)
৪. . . . . . হৃদয়ে তরঙ্গ দুটি'।[৪] (নবীনচন্দ্র সেন)
৫. বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়।[৫] (রবীন্দ্রনাথ)
৬. বক্ষের পরে আধমুকুলিত যুগল কমল দুটি।[৬] (জসীমউদ্‌দীন)
৭. তোমাতেই পীন হিমগিরি দুটি উপমা।[৭] (বিষ্ণু দে)
৮. হেলেনের বুকে দুটি পাকা ফল ভরেছে রসে।[৮] (বুদ্ধদেব বসু)

---

১. 'গান্ধারীর আবেদন'
২. 'কবিতা' [বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৩. 'সুন্দরের পাশে' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৪. [ত্রয়ীকাব্য (রৈবতক)]
৫. 'হৃদয় আসন' [কড়ি ও কোমল]
৬. 'কৈশর যৌবন দুহু মেলি গেল' [হলুদ বরণী]
৭. 'উজ্জীবনের স্বপ্নসদ্য চক্ষে' [বছর পঁচিশ]
৮. 'কবিতা' [বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা]

৯. মমতার মধুভারে দুটি বক্ষ হইয়াছে পীন।[১] (আবদুল কাদির)
১০. জ্বলজ্বলে দুটি স্বর্ণকুম্ভ[২] (শামসুর রাহমান)
১১. শঙ্খমাজা স্তন দুটি মনে হবে শ্বেত পদ্মকলি[৩] (আল মাহমুদ)

বিদেশী কবিরাও দ্বিত্বপ্রকাশক শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকেন কুচবর্ণনাকালে এবং দ্বিত্ববোধক শব্দের নানান রূপও ব্যবহার ক'রে থাকেন। দু'একটি উদাহরণ দেয়া যাক—

১. Or else a cherry (**double** graced)
Within a lily?[৪] (Robert Herrick)

২. জানহু দুবৌ সিরীফল জোরা ।।
এক পাট বৈ দুনৌ রাজা।
সাম ছত্র দূনহুঁ সির ছাজা ।।
জানহু দোউ লটু এক সাথা। (জায়সী)

৩. কুচ গোলা দুই হিরদয় লাএ। (জায়সী)

৪. অস নারঁগ দহুঁ কা কহঁ রাখে।। (জায়সী)

৫. সিংঘ-লঙ্ক কুম্ভস্থল জোরু। (জায়সী)

৬. কুচ কঞ্চুকী সিরীফল উভৈ। (জায়সী)

জায়সীর কাব্যে দেখা গেল 'দুই' শব্দটির নানান রূপান্তর-দুবৌ, জোরা, দুনৌ, দূনহুঁ, দোউ, দুই, দহুঁ, জোরু, উভৈ ইত্যাদি।

বক্ষবন্দনাকালে সকলকালের কবিই যে সংখ্যাসূচক শব্দকে স্মরণ করেন—সেকথা প্রমাণিত হল। দ্বিত্ববোধক সংখ্যাকে একবার ব্যবহার ক'রেই কবিকুল সন্তুষ্ট নন—তাঁরা এর পৌনঃপুনিক ব্যবহার ক'রে থাকেন। এমনও দেখা গেছে যে, একজন কবিই একস্থানে চার চরণে পাঁচবার শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন—উপরের ২ নম্বর উদ্ধৃতিটিই তার প্রমাণ। আসলে কুচপ্রসঙ্গ উত্থাপনকালে দ্বিত্বজ্ঞাপক শব্দের উল্লেখ আবশ্যক হ'য়ে দাঁড়ায়, কেননা কুচবন্দনাকালে দুই কুচের প্রতি সমান পক্ষপাত প্রদর্শনই হচ্ছে কুচমুগ্ধ কবির সঙ্গত দায়িত্ব। দুটি

---

১. 'পৃথিবীর প্রেম' [উত্তর বসন্ত]
২. 'মিশ্ররাগ'
৩. 'সিম্ফনি' [লোক লোকান্তর]
৪. 'Upon The Nipples of Julias Breast'

কুঁড়ি, দুটি ফুল, দুটি ডালিম, দুটি কমলা, দুটি শ্রীফল, দুটি বাটি, দুটি পাহাড়কে পাশাপাশি রেখে তাই কবিকুল দ্বিত্বের প্রতি সমান মমতা প্রদর্শন করেন। এই দুইয়ের প্রতি তাঁদের যে সমান পক্ষপাত, সেটা বোঝানোর জন্য তাঁরা দুই পাহাড়ে সোনালি রূপালি—দুই রঙের শোভা দেখেন অথবা সুরেশ্বরী নদীর ধারাকে দুই পাহাড়ের ওপর সমান আকারে প্রবাহিত করান, যেমন—

১. এক পয়োধর চন্দনলেপিত আরে সহজই গোর ।
হিম ধরাধর কনক ভূধর কোরে মিলিল জোর ।। (বিদ্যাপতি)

২. গিএ গজমুতী হার মনিমাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।

হঞাঁ সমান আকারে সুরেশরী দুইধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে ।।

(বড়ু চণ্ডীদাস)

পাশাপাশি রক্ষিত দুই কুঁড়িকে, দুই ডালিমকে বা দুই শ্রীফলকে আরও নিকটবর্তীরূপে, আরও ঘনিষ্ঠরূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় কবি তাদের এক শাখায় সংস্থাপিত করেন, যেমন—

১. বুকেত বান্ধিয়া রাখে কন্যা জোড় কুসুমের কলি

(লোককবি)

২. এক ডালে ডালিম যুগল শোভাকার।

(দোনা গাজী)

৩. কনক শ্রীফল দুই কিবা একডালে।

(দোনা গাজী)

এমনকি তাঁরা নায়িকাদেহকে বৃক্ষ কল্পনা ক'রে একবৃক্ষে দুটি ফলের রূপও দেখেছেন—

১. একগাছে গোবীচান্দ দুই শ্রীফল ধরে।

(সুকুর মামুদ)

বৃক্ষের সকল অনাবশ্যক ফল ঝরিয়ে তাতে মাত্র দুটি সুপুষ্ট সবজাভ ফল রেখে দিয়ে কবি উপমানটিকে ক'রে তুললেন মোক্ষম।

কবি চক্রবাক-দম্পতির উপমান নিয়ে আসেন কুচদ্বয়কে আরো ঘনিষ্ঠ লগ্ন রূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষায়। দিবসের মিলনসুখী চক্রবাক-চক্রবাকী যেন রাত্রিতে বিচ্ছেদের আশংকায় একজন আর একজনকে আঁকড়ে ধ'রে আছে—

চক্রবাক যুগ নিশি বিচ্ছেদের ডরে।
অখণ্ড মিলনে কি রহিয়াছে উরঃ সরে।।

(আলাওল)

কুচযুগলের প্রতি সমান মমত্ববশতঃ কবি উভয়কে জায়া ও পতিরূপে দেখালেন এবং ঐ দুইকে দেখালেন অবিচ্ছেদ্য। এক সিংহাসনে দুই রাজার অধিষ্ঠান অসম্ভব হ'লেও কবি সেই অসম্ভবকে সাধন করেছেন নায়িকার হৃদয়-সিংহাসনে দুই রাজাকে বসিয়ে—রাজাদের শিরোদেশে ছত্র-আচ্ছাদন দিতেও কবি ভোলেননি—

এক পাট বৈ দুনৌ রাজা।
সাম ছত্র দূনহুঁ সির ছাজা।

(জায়সী)

কোনো কোনো কবির মনে হয়েছে কুচ দুটি তো অবিকল একরকম দেখতে—অতএব ওরা 'যমজ'। আর এই চিন্তা থেকেই এসেছে যমজ হরিণ বৎসের উপমান—"শোশন্ পুষ্পের মধ্যে ভক্ষণকারী মৃগের দুই যমজ বৎসের ন্যায় তোমার দুই স্তন।"[১]

(প্রাচীন কবি রচিত বাইবেল)

এখানে 'যমজ' শব্দটি দ্বিত্বসূচক 'দুই' শব্দেরই অন্য এক রূপান্তর।

তবে সংখ্যাবাচক শব্দ উল্লেখ না করলেও কবিকুল কখনোই ভোলেন না যে, তাঁরা দুই কুচের বন্দনায় নেমেছেন—এক কুচের নয়। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

কখন যে চাঁদ ওঠে আড়াআড়ি পাহাড়ের ফাঁকে;
যেন কার পাথুরে স্তনের কাছে ঝুলে আছে শাদা
চাঁদির লকেট।[২] (আল মাহমুদ)

---

১. রঙ্গলালের প্রবন্ধ থেকে

২. 'অরণ্যে ক্লান্তির দিন' [লোক লোকান্তর]

উদ্ধৃতিটিতে 'আড়াআড়ি' শব্দ ব্যবহার ক'রে বোঝানো হয়েছে পাহাড় একটি নয়--দুটি। এক পাহাড়ের আড়ালে চন্দ্রোদয়ে সৌন্দর্য নেই--আছে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে--তাই কবি পাহাড় যে দুটি, সে বিষয়ে ইঙ্গিত করছেন।

আর কবি যেখানে দ্বিত্বপ্রকাশক শব্দ উচ্চারণ করেন না আবার অন্য কোনোভাবে দ্বিত্বও বোঝান না—সেখানে তাঁর মনে মনে থাকে যে, পাঠক তাঁর প্রযুক্ত উপমানটিকে দ্বিত্বরূপেই দেখবেন; যেমন, মধুসূদন যখন লিখলেন—

কদম্ব সুন্দর--
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে
কেননা মন্মথ-মন মথেন যে ধনী
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন।[১]

—তখন পাঠক যে একটি নয়, বরং দুটি কদম্বের সৌন্দর্যরূপ অবলোকন করবেন, সে বিষয়ে কবি নিশ্চিন্ত।

দ্বিত্বজ্ঞাপক সংখ্যাপ্রসঙ্গ আলোচনাকালে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। সেটি হ'লো, যুগকুচের প্রতি দৃকপাতশেষে কবিকুল কুচদ্বয়ের উপমান অন্বেষণ তো করেছেনই, মাঝে মাঝে কুচের অবস্থানভূমি সমগ্র বক্ষ-প্রদেশের উপমানও অন্বেষণ করেছেন; এবং উভয় প্রকার উপমানের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, যেমন—কুচদ্বয় যখন ডালিম—বক্ষ-দেশ তখন পল্লবিত প্রশাখা; কুচদ্বয় যখন চক্রবাক--বক্ষদেশ তখন সরোবর; কুচদ্বয় যখন রাজা—বক্ষদেশ তখন সিংহাসন ইত্যাদি ইত্যাদি।

১. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য]

নারীর বক্ষশোভাকে কবিরা বিভিন্ন রূপে নিরীক্ষণ করেছেন। এই রূপাবলোকন চলেছে কখনো নানান স্থানে—কখনো দূর থেকে—কখনো কাছ থেকে—কখনো আলোয়—কখনো অন্ধকারে—কখনো দিনে—কখনো রাতে! কুচযুগলকে কখনো তাঁরা দেখেছেন বসনাবৃত[১], কখনো বসনহীন, কখনো অঞ্চলাবৃত, কখনো অঞ্চলহীন, কখনো অর্ধাঞ্চল-আবৃত, কখনো ছিন্ন অঞ্চলাবৃত, কখনো বাকলাবৃত, কখনো কাঁচুলিকঠিন, কখনো কাঁচুলিহীন, কখনো শিথিল কাঁচুলি-আবৃত, কখনো ছিন্ন কাঁচুলি-আচ্ছাদিত, কখনো শ্রমজলসিক্ত কাঁচুলি-জড়িত, কখনো চিত্রিত কাঁচুলিসজ্জিত, কখনো অলংকৃত কাঁচুলি-পরিহিত, কখনো নক্ষত্রখচিত কাঁচুলিপরিহিত, কখনো কর-কাঁচুলি-লগ্ন, কখনো নাগ

---

১. বসন আবার বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন নামের, বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন উপাদানের, যেমন—

বিভিন্ন প্রকারের বসন :

(১) ঘাঘরা—
লাল চুলের ফর্সা এক মুঠো
বালিকা তোর ঘাঘরা ভরা ফুটো
হালকা গেরো উন্মোচন করুক
দুটি চোখের মতো রে তোর বুক।

(বোদলেয়ার / 'লাল চুলের ভিখিরি মেয়েকে' অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

(২) শাড়ী—
নীল শাড়ী মোহনকারী
উছলিতে দেখি পাশ।
- - - - - - - - - - - - - - -
কুচযুগ গিরি কনককটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে। (চণ্ডীদাস)

(৩) ব্লাউজ— ওপাশের এলো খোঁপা, ব্লাউজের নিচে কিছু মসৃণ নগ্নতা
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/'কথা আছে')

বিভিন্ন নামের বসন :

(১) হেমরি শাড়ী—
কাঞ্চন কটোরা কুচ অধিক সুচারু।
কাঞ্চন পটের পরে হিঙ্গুলানি মেরু॥
- - - - - - - - - - - - - - -
বিচিত্র হেমরি শাড়ী কাচি আছে তা এ॥

(মুহম্মদ কবীর/'মনোহর-মধুমালতীর পরিচয় ও প্রণয়')

(২) বেলন শাড়ী—
সুবর্ণের স্তনে জিনি বালার্ক চারু॥
- - - - - - - - - - - - - - -
পৈঢ়ণ বেলন শাড়ী বহু মূল্য ধরে।

(নওয়াজিস খান খোন্দকার/'ঘুমন্ত রাজকন্যার রূপ')

কাঁচুলিবেষ্টিত, কখনো আভরণসজ্জিত, কখনো আভরণহীন, কখনো হরিদ্রা-রঞ্জিত, কখনো কুমুকমরঞ্জিত, কখনো কস্তুরীলেপিত, চন্দনচর্চিত কখনো, ন্দনবর্জিত কখনো বা, যাদুর ঔষধলেপিত এমনকি বিষরঞ্জিত ও কখনো। একথার প্রমাণস্বরূপ উপযুক্ত উদ্ধৃতিরাশি চয়ন করতে পারি—

কুচরূপ :

নানান স্থানে---

গৃহে—এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে: পরিলা দুকূলে

বিভিন্ন রঙের বসন :

(১) সোনালি--- বুকের কাঁচলি যেন করে ঝিকিমিকি।
চন্দ্র সূর্য মেঘে যেন হয়ে যায় লুকি।
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
সোনালি সকল বস্ত্র জোলেখার গায়।
(ফকির গরীবুল্লাহ/'জোলেখার স্বপ্ন')

(২) গোলাপি— গোলাপি অঞ্চলখানি
লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি।
(রবীন্দ্রনাথ/'বিম্ববতী')

(৩) সবুজ--- ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
(রবীন্দ্রনাথ)

(৪) নীল--- হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়।।
- - - - - - - - - - - - - - -
শ্রীফল যুগল জিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
(চণ্ডীদাস)

বিভিন্ন উপাদানের বসন :

(১) জরি--- বিচিত্র কাঞ্চুলি শোভে গাএর উপর।
কেবল রাতুল অতি শীতল পয়োধর।।
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
যৌবন মাতলি কন্যা হেলি হেলি পড়ে।
সুরঙ্গ অঙ্গে জড়ি পাড় ঝরি গড়ে।।
(মুহম্মদ কবীর/'মনোহর-মধুমালতীর পরিচয় ও প্রণয়)

(২) সাটিন--- বড় ধূম বড় ঘরে সাটিন কাঁচলি করে
চুমকির কাজ তার মাঝে।
পয়োধরে মনোলোভা অনঙ্গের অঙ্গশোভা
হেরি শশি শশধরে লাজে।
(ঈশ্বরগুপ্ত)

রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী ;[১] (মধুসূদন)

গনিকালয়ে— "গনিকালয়ে প্রবেশ করেই কেউ কেউ মূর্ছা যাচ্ছে। কোনো বিশাল-গজগামিনী, মদবিহ্বলা বেশ্যা বিচরণ করছে। ···অন্য কোথাও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ঘন, তুঙ্গ স্তনের অধিকারিণী ভ্রমন করছে। স্তনভারে কোমর ভেঙ্গে পড়ছে না দেখে মনে বিস্ময় জাগছে। . . . কারুর মদনবর্ত্য (স্তন) মৃগনাভিপঙ্কিত। ... কারুর স্থূল, শক্ত, মুক্তাযুক্ত হার স্থান না পেয়ে স্তনপট্ট শিখরে লুটিয়ে পড়ছে।"[২]
(আবদুর রহমান/অনুবাদ : মমতাজুর রহমান তরফদার)

কুঞ্জে— বিভ্রান্তা করপল্লবেন করবীমেকেন পর্য্যাকুলা-
মন্যেন স্তনমণ্ডলে নিদধতী স্রস্তং দুকূলাঞ্চলম্।
এষা চন্দনলেশলাঞ্ছিততনুস্তাম্বুলরক্তাধরা,
নির্যাতি প্রিয়-মন্দিরা দ্রুতিপতে: সাক্ষাজ্জয়শ্রীরিব।।[৩]
(কালিদাস)

সরোবরে— মেহুজলে স্নান করে বধূ জন সঙ্গে।
. . . .
তিতির সকল দেহ কুচে ধারা বহে।
উর্ধ্ব কুম্ভ মুক্ত করি যেন বৃষ্টি সহে।।
(দৌলৎ কাজী)

স্নানাগারে— রমনীর স্নানলীলাকালীন সৌন্দর্য হৃদয়বান পুরুষের নিরন্তর অনুশীলনের বিষয় হতে পারে। একে অর্থাৎ জলধারা নিষিক্ত রমণীকে শুদ্ধ শিল্প বলা যায়। ... জলের সাবলীল রেখাগুলি দর্শনার বিশুদ্ধ মরালগ্রীবা স্পর্শ ক'রে অতঃপর বক্ষের মধুর উপত্যকায় ধীরে ধীরে নামছে।[৪] (মঞ্জুভাষ মিত্র)

---

১. [মেঘনাদবধকাব্য] ২. [সন্দেশ-রাসক]
৩. [পুষ্পবান বিলাসম্]
৪. 'দর্শনার শরীর ১৯' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]

কুচরূপ ঃ

নানারূপে—

দিবসে—দোষ নিওনাক হে লাজ-শোভনা। বক্ষে তোমার
যুগল কমল ফুল,
সিক্ত বসন শাসন না মানি
যদি উঁকি দেয় নিমেষে করিয়া ভুল .
যদি আকাশের সোনা সোনা রোদ
সেখানে ছড়ায়ে পড়ে[১],

(জসীমউদ্‌দীন)

নিশীথে—তোমার যুগল স্তন স্বর্গ হয় রাত্রির নরকে।[২]

(শামসুর রাহমান)

বসনাবৃত কুচশোভা—আশ্বিন মাসেতে যেমন পদুমের কলি।
বসনে ঢাঁকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি।।

(দ্বিজ ঈশান)

বসনহীন কুচশোভা—বুকের বসন খুলে খলখল হাসে
দেখ হে নাগর কুচ কনক মহেশে।।

(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

অঞ্চলাবৃত— ...স্ব-অঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা!
সে আঁচল ইন্দ্রানীর পীনস্তনোপরি
ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে।[৩]

(মধুসূদন)

অঞ্চলহীন— কিসকে ঘুচায়িলেঁ রাধা নেতের আঞ্চল।
দেখায়িলেঁ কুচভার করায়িলেঁ বিকল।।

(বড়ু চণ্ডীদাস)

---

১. 'বিমানমালা' [জলের লেখন]
২. 'জর্ণাল, শ্রাবণ'
৩. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য]

অর্ধাঞ্চল-আবৃত— আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তব্‌ ধরি দগধে অনঙ্গ।।
(বিদ্যাপতি)

ছিন্ন অঞ্চলাবৃত— ভাঁগিলেক তনের আঞ্চলে।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

বাকল-আবৃত— রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন;[১]
(মধুসূদন)

কাঁচুলিবদ্ধ— ময়ূরকণ্ঠি পরেছি কাঁচলখানি।[২]
(রবীন্দ্রনাথ)

কাঁচুলিহীন— (১) বুকের কাঁচলি খুলে করে কত রঙ্গ।
(মানিকরাম)

(২) দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জর জর যত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচুলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি।
(ভারতচন্দ্র)

শিথিল কাঁচুলি-আবৃত—আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।[৩]
(রবীন্দ্রনাথ)

ছিন্ন কাঁচুলি আচ্ছাদিত—(১) কাঞ্চুলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডসি হার।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

(২) কাঞ্চুলী ফাড়িল কার কুচে লক্ষ রেখা।
(দোনা গাজী)

---

১. 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা' [বীরাঙ্গনা কাব্য]
২. 'ভ্রষ্টলগ্ন' [কল্পনা]
৩. 'নিদ্রিতা' [সোনার তরী]

শ্রমজলসিক্ত কাঁচুলি-জড়িত—যমুনার তীরে কদমের তলে
কাঞ্চুলী ভিজিআ গেল ঘামে।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

চিত্রিত কাঁচুলি-সজ্জিত—কমনীয় কুচযুগে কাঁচুলির শাখা।
কৃষ্ণাবতারের কথা কিছু আছে লেখা।।
(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

অলংকৃত কাঁচুলি-পরিহিত—বিচিত্র কাঁচলি পরে বুকের উপর
মণিমুক্তা প্রবাল মণ্ডিত মনোহর।
(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

নক্ষত্রখচিত কাঁচুলি-পরিহিত—. . . অপ্সরীর
তারাবেঁধা কাঁচুলি,[১]
(শামসুর রাহমান)

কর-কাঁচুলি-লগ্ন—আমার অঙ্গের কাঁচুলি কৃষ্ণ করাঙ্গুলি[২]

নাগ--কাঁচুলি-বেষ্টিত—(১) শ্বেতনাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলি।
(হরি দত্ত)
(২) কাচলিয়া পরে দেবী আড়িয়াল বেকা।
(বিজয়গুপ্ত)

আভরণ-সজ্জিত— কণ্ঠে মণিহার অতি শোভাকার
রত্ন পয়োধরে দোলে।
(ফাজিল নাসির মাহমুদ)

আভরণহীন--চীর চন্দন হার উরে ন দেলা।
(বিদ্যাপতি)

হরিদ্রারঞ্জিত— অন্যে ২ এ তেল হলদি লই করে।
কুমারিক মাঞ্চে গীত গাহে পিকস্বরে।
কেহ হস্ত কেহ পদ কেহ করএ মাঞ্চন।
কেহ বক্ষ পৃষ্টে কেহ মানঞ্চএ বদন।।
(করমুল্লা)

---

১. 'আত্মপ্রতিকৃতি' [রৌদ্র করোটিতে]
২. 'ভূমিকা: সংস্কৃত কবিতা ও 'মেঘদূত' [কালিদাসের মেঘদূত] অনু: বুদ্ধদেব বসু

কুমকুম রঞ্জিত—(১) কুচ কুমকুমে মাখল হিয় তোর।

(বিদ্যাপতি)

(২) কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা।[১]

(রবীন্দ্রনাথ)

কস্তুরিলেপিত—স্তনতটে পরে রাই কুমকুম কস্তুরি।

(পরশুরাম)

চন্দনচর্চিত এবং চন্দনবর্জিত—এক পয়োধর চন্দনলেপিত আরে সহজই গোর।

(বিদ্যাপতি)

যাদুর ঔষধলেপিত—বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষ যদি পায়,
বুকের কাঁচলি খুলে মোহনি লাগায়।।

(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

গরললেপিত—পেয়ে আজ্ঞা পুতুনা পরমানন্দ মনে।
বিনাশিতে বাসুদেবে বিষ মাখে স্তনে।

(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

স্নানকালে সিক্ত বসনাবৃত কুচ দেখেছেন কবি (সজল চীর পয়োধর সীমা/ কনক বেল জনি পড়ি গেও হীমা—বিদ্যাপতি)। বসনহীন জলসিক্ত স্তনও দেখেছেন (তিতির সকল দেহ কুচে ধারা বহে/উর্ধ্ব কুম্ভ মুক্ত করি যেন বৃষ্টি সহে।—দৌলৎ কাজী)। বাতাসে স্তনের বসন-আবরণ উড়তে দেখেছেন কবি (১. বুকের বসন ওড়ে মলয়ের বায়।—মানিকরাম গাঙ্গুলি; ২. বিচলিত করে বায়ে কুচের বসন।—ঘনরাম চক্রবর্তী)। বিরহিনীর অশ্রু স্তনচূড়ায় গড়িয়ে পড়তে দেখেছেন কবি ("নয়নবিন্দু স্তনচূড়ায় পড়ে জলতে জলতে শিবশিরের চন্দ্রকান্তি হ'লো।"—বিদ্যাপতি), কজ্জলযুক্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে কুচযুগকে কালিমাময় করে তুলেছে তা-ও দেখেছেন ("অশ্রুগলিত কজ্জলে রঞ্জিত রাধাবক্ষ যেন মৃগমদে স্বর্ণশম্ভুর পূজা।"[২]— বিদ্যাপতি), দেখেছেন নয়নজলে কুমকুম কস্তুরি সব ধুয়ে যেতে (স্তনতটে পরিছিলা কুমকুম কস্তুরি/নঞানের জলে সব তেতিল সুন্দরি।—পরশুরাম)। কখনো চূর্ণকুন্তল এলিয়ে পড়েছে স্তনে

---

১. 'সেকাল' [ক্ষণিকা]

২. ৫৪১

("মুক্ত কবরী উল্টাইয়া বক্ষে পড়িতেছে, যেন স্বর্ণগিরিতে চামর ধরিয়াছে।"[১] —বিদ্যাপতি), কখনো স্তনাগ্রে লুটিয়ে পড়ছে ঘনকৃষ্ণ বেণী (উরঁ লুর সামরি বেনী/কমলকোস জনি কারি নগিনী।—বিদ্যাপতি), কখনো নায়িকার বিরহমলিন অধর নত হয়ে পয়োধরে সন্নিহিত হয়েছে, তার সঙ্গে মিশেছে রস-বিষাক্ত সাপের মত বেণী (উত্তঙ্গ পীন পয়োধর উপর/লখিঅ অধর ছায়া।/ কনকগিরি পবার উপজল/বাপু মনোভব মায়া।।/ তেঁা পুনু সে নারী বিরহে ঝামরি/পলটি পরলি বেণী।/ সাঁস সমীরণ পিবএ ধাউলি/জনি সে কারি নগিনী।।—বিদ্যাপতি), হাত, আঙুল, নখ কুচলগ্ন আছে কখনো (অম্বর বিঘটুঅ কামিক কামিনি, করে কুচ ঝাপু সুছন্দা/কনক সম্ভুসম অনুপম সুন্দর দুই পঙ্কজ দস চন্দা।।—- বিদ্যাপতি), কখনো কুচ-কেশ-হার একত্রিত হ'য়ে মনোরম অলংকারের জন্ম দেয় (কুচজুগ পর চিকুর ফুজি পসরল/তা অরুঝাএল হারা।/জনি সুমেরু উপর মিলি উগল/চাঁদ বিহীন সব তারা।।— বিদ্যাপতি), কখনো মস্তক এসে লুটিয়ে পড়ে পয়োধরে (মাথা থুয়ে পয়োধরে/ কোলে বীণা খেলা করে/স্বর্গীয় অমিয় স্বরে জানিনে কি কথা বলে।[২]— বিহারীলাল)। কখনো কুচ এবং মুখ লগ্ন—লগ্ন কখনো কুচ-কেশ, কুচ-কেশ-মুখ, কুচ-কেশ-অধর, কুচ-কেশ-হার, কুচ-অশ্রু, কুচ-কাজল-অশ্রু, কুচ-চন্দন, কুচ-কর, কুচ-করতল, কুচ-হাত-নখ, কুচ-হাত-আঙুল-বস্ত্র, কুচ-নখরেখা, কুচ-হার-নখরেখা, কুচ-নখরেখা-কাঁচুলি—বক্ষ-প্রদর্শনীতে সত্যি অনেক চিত্রই আছে। কুচ দেহের মধ্যবিন্দু ব'লে কুচের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গের যৌগিক অলংকার সংখ্যায় এত বেশী।

লগ্ন অবস্থায় আরো বিভিন্ন প্রকারে কবিকূল কুচরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন, যেমন—কুচদ্বয়কে তাঁরা কখনো দেখেছেন নায়িকার করতলে, কখনো দূতী বা সখীর করতলে, কখনো নায়কের করতলে। নায়কের শুধু করতলই নয়— বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে লগ্ন কুচরূপও দর্শন করেছেন কবিকূল। বিভিন্ন বস্তু বা প্রাণীর সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থায়ও কুচরূপ দর্শন করেছেন তাঁরা। এখন এতদ্‌সংক্রান্ত উপযুক্ত দৃষ্টান্ত চয়িত হচ্ছে—

---

১. ৭৪৭

২. [সারদামঙ্গল]

নায়িকার করাবৃত কুচ—করজুগ পিহিত পয়োধর অঞ্চল
চঞ্চল দেখি চিত ভেলা।
হেম কমলন জনি অরুণিত চঞ্চল
মিহির-তর নিন্দ গেলা ।। (বিদ্যাপতি)।

নায়কের করধৃত কুচ—করে কুচমণ্ডল রহলিহুঁ গোএ।
কমলে কনকগিরি ঝাঁপি ন হোএ।।
(বিদ্যাপতি)

এক সখীর করতলে নিষ্পেষিত অপর সখীর কুচ—
কেহ কারো যুগ কুচ চাপে ঘন ঘন।
(আব্দুল হাকিম)

এক গোপীর ওষ্ঠ দ্বারা শোষিত আর এক গোপীর কুচ—
কোন গোপী হয় যেন পুতুনা সমান।
কৃষ্ণ হইয়া কেহো তার করে স্তন পান।।
(পরশুরাম)

নায়কের বিভিন্ন অঙ্গে লগ্ন কুচরূপঃ

নায়কের বাহুতে—এ চারুগজের উপরে শোভিত
যুগল কেশরিরাজ।।
কেশরী উপরে এ দুই সায়র,
সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে এ দুই তমাল,
চারি শাখা আছে ধরি।।
(জ্ঞানদাস)

করতলে—উৎপলে পূজত হেমক শিব।। (জ্ঞানদাস)

করাঙ্গুলিতে—আশ্লেষ-আবেশ-তৃষ্ণা, উষ্ণতনু-আস্বাদনে আনন্দ-আশ্বাস
প্রতি সূক্ষ্ম রোমকূপে নিরন্তর তোলে কী উচ্ছ্বাস!
স্তনাগ্রচূড়ার স্পর্শ কনিষ্ঠার ক্ষীণ প্রান্তভাগে
মদির শিহরসুখে ক্ষণে ক্ষণে জাগে।[১]
(বুদ্ধদেব বসু)

১. 'মোহমুক্ত' [বন্দীর বন্দনা]

নখে—দৃঢ় করি দুয়ি তনে
নখ দিল ঘন ঘনে।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

বুকে—কঠিন হিয়ার দুই শ্রীফল কঠিন।
গাঢ় আলিঙ্গনে রহে পীন উরে চিন ।।
(আলাওল)

মুখে— ... ... নতজানু হয়ে
নিরীক্ষণ করি ওই জঙ্ঘা ও জঘন, স্তনসন্ধির গোপনে
রাখি মুখ।[১]...
(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

ঠোঁটে—আঙুলের ডগা, ঠোঁট
সেখানে জাগিয়ে তোলে
স্তনের নিদ্রিত বোঁটা—রোমকূপে রোমকূপে তোলে
অসামান্য আনন্দঘনতা,[২]
(রফিক আজাদ)

দাঁতে—কাজের মধ্যে কাজ শুধু নায়িকার অধীর আঁখির
মধ্যে বন্দী অলস মধ্যাহ্নে তার
কোমল কৈলাশে মাথা রেখে একটু ঘুমোনো
আর ঘুমোতে ঘুমোতে দুধে আর্দ্র স্তনের বোঁটায়
নতুন দাঁতের খিলখিল কামড়।[৩]
(নির্মলেন্দু গুণ)

জিভে—নিচু হয়ে তার স্তনের বোঁটায় বুলিয়ে দিলাম তৃষ্ণাতুর জিভ[৪]
(বেলাল চৌধুরী)

চুলে—প্রদীপ নিবায়ে দিব,
বক্ষে মাথা তুলি নিব,
স্নিগ্ধ করে পরশিব
সজল কপোল---

---

১. 'চিরমায়া' [খোলা মুঠি (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা)]
২. 'স্পর্শের পুরাণ' ৩. 'নিজের ঘরে আগুন'
৪. 'অবিরল সূর্য জল আর কবিতার' [আত্মপ্রতিকৃতি স্থিরজীবন ও নিসর্গ]

বেণীমুক্ত কেশজাল
স্পর্শিবে তাপিত ভাল
কোমল বক্ষের তাল
মৃদুমন্দ দোল।
নিঃশ্বাস বীজনে মোর কাঁপিবে কুন্তল তব
মুদিবে নয়ন—
(রবীন্দ্রনাথ)

পিঠে—কুচ তূঁবী অব পীঠি গড়োব্ৌঁ।[১]
(জায়সী)

পদতলে---(১) রাজা ভরথরি সুনা জো জ্ঞানী।
জেহি কে ঘর সোরহ সৈ রানী॥
কুচ লীন্হে তরব্‌া সহরাই।
ভা জোগী কোউ সংগ ন লাঈ।[২]
(জায়সী)

(২) বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
(চন্ডীদাস)

(৩) আজ পেলে তাঁয় হুমড়ি খেয়ে
প'ড়তুম মাগো যুগলপদে,
বুকে ধরে পদ-কোকনদ
স্নান করাতাম আঁখির হ্রদে।[৩]
(নজরুল)

---

১. ("এখনই আমার কুচাগ্রভাগের গন্না তাঁর পিঠে বিঁধিয়ে দেব।" [পদ্মাবতী (১ম খণ্ড)] অনুবাদ—দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

২. ("জ্ঞানী ভর্তৃহরি রাজার কথা তো শুনেছ, যাঁর গৃহে ষোরশ' রাণী ছিল। তারা নিজেদের স্তনযুগল তাঁর পদতলে চেপে ধরল, তবুও তিনি যোগী হলেন এবং কাউকেই সঙ্গে নিলেন না।" [পদ্মাবতী (১ম খণ্ড)] অনুবাদঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩. 'অবেলার ডাক' [দোলন-চাঁপা]

সর্বাঙ্গে---(১)শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর, রাখ বক্ষ 'পর মোর।
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে বাহু মৃণালক ডোর।[১]
(রবীন্দ্রনাথ)

(২) এমন উন্মাতাল, নোনা দেয়ালের মতো
তোমার পায়ের উপর ধ্বসে পড়ি
... ...
আর ভিক্ষুকের মত আমাদের, তুলে নাও বুকে।[২]
(নাইজেরিয়ার কবি—জন পেপার ক্লার্ক/
অনুবাদ: করুণাময় গোস্বামী)

বিভিন্ন বস্তু বা প্রাণীর সঙ্গে সংলগ্ন কুচরূপ:

বীণার সঙ্গে — হেলি উর্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ আতংকারিত কঠিন পীড়ণে
নিদারুণ করুণ মূর্ছনা[৩] (রবীন্দ্রনাথ)

হারের সঙ্গে—তনের উপর হারে (বড়ু চণ্ডীদাস)

কলমের সঙ্গে — অথবা রাখিয়ো সন্তর্পণে খোঁপার ভিতরে গুঁজে
কলমের মতো তোমার বুকের গর্বিনী গম্বুজে।[৪]
(নির্মলেন্দু গুণ)

ছবির সঙ্গে — ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরবে মরু কানন গিরি[৫]
(নজরুল)

ফুলের সঙ্গে—(১) একটি গোলাপফুল রেখেছি বক্ষের মাঝে
তব ঘ্রাণ শেষে
আমারে ফিরায়ে দিলে অধরে পরশি তাহা
পরি লব কেশে।[৬] (রবীন্দ্রনাথ)

---

১. ১৩ নং পদ [ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী] ২. 'অলোকুন' [আফ্রিকার কবিতা] ৩. 'স্বর্গ হইতে বিদায়' [চিত্রা] ৪. 'কৃষ্ণা চতুর্দশী: এক' ৫. 'অভিশাপ' [দোলন-চাঁপা] ৬. 'সান্ত্বনা' [চিত্রা]

(২) প্রিয়া মোর মনের মত ফুল বুকে মোর মদ হাতে[১]
(হাফিয/অনুবাদ : ডঃ মু. শহীদুল্লাহ)

পদ্মপত্রের সঙ্গে — আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনী দল সংনাহা করে।। (বড়ু চণ্ডীদাস)

কপোতের সঙ্গে — কপোতটিয়ে লয়ে বুকে
সোহাগ করত মুখে মুখে[২] (রবীন্দ্রনাথ)

রাজহাঁসের সঙ্গে — বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ[৩]
(রবীন্দ্রনাথ)

হরিণের সঙ্গে — ক্ষুদ্র মৃগশিশু এক দেখ কি সুন্দর
খেলিছে যুবতী সঙ্গে! ছুটিয়া ছুটিয়া
কেমন ফিরিয়া পুনঃ লুকাইছে মুখ
যুবতীর চারু অঙ্কে—চুম্বি চারু বুক।
দেখ ক্ষুদ্র পা দুখানি রাখি অংসো পরে
চাটিছে কেমন ওই অনিন্দ্য বদন—[৪]
(নবীনচন্দ্র সেন)

সাপের সঙ্গে — হালিয়া নাগ দেবীর হৃদয়ে শোভে হার।
(বিপ্রদাস পিপিলাই)

বিভিন্ন কর্মে রত অবস্থায় নায়িকার বক্ষপ্রদেশের যে ভঙ্গিমা হয়—কবিকুল সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টিচালনা করেছেন সঠিক চিত্রাঙ্কনের জন্য। তাঁরা দেখেছেন—নায়িকা যখন লীলাভরে গমন করে, তখন তার বক্ষপদ্ম শিহরিত হয় কিংবা বক্ষকলস থেকে মধু ছলকে পড়তে চায়; নায়িকা যখন ছুটে চলে, তখন তার ঘর্মাক্ত কুচযুগল কম্পিত; নায়িকা যখন নৃত্যশীলা,

১. [দিওয়ান-ই-হাফিয]
২. 'সেকাল' [ক্ষণিকা]
৩. 'বিজয়িনী' [চিত্রা]
৪. [ত্রয়ীকাব্য (রৈবতক 'দ্বিতীয় সর্গ')]

ক্রীড়ারতা অথবা অশ্বচালনরতা তখন তার কুচযুগ দ্রুত আন্দোলিত; নায়িকা যখন কলহরতা তখন তার কুচযুগ নখলাঞ্ছিত। কবিকুল দেখেছেন পুষ্পচয়নরতা, স্নানরতা, প্রসাধনরতা, কেশবন্ধনরতা রমণীর কুচভঙ্গিমা—দেখেছেন ঢেঁকিচালনরতা, হরিদ্রাপেষণরতা, দধিমন্থনরতা, রন্ধনরতা, সেবারতা, পাঠরতার কুচভঙ্গিমা।

গমনরতা — (১) ফাল্গুনে দেখিয়াছিনু স্বপ্নশীলা সখীরে আমার—
তনুলতা লীলায়িয়া চলিয়াছে মন্দার চরনে;
শুভ্রবুকে পদ্মকলি শিহরায় সুগন্ধি শয়নে;[১]
(আবদুল কাদির)

(২) তুমি কার কাম বধূ
কাঁকাল লচকি চলিতে ছলকে বুকের কলসে মধু[২]
(আবদুল কাদির)

দৌড়রতা — কিন্তু, জানি, ছুটবে তারও পিছনে কান্তিময়ী যুবতীরা উদ্দাম
উন্মোচিত স্তনে তুলে কাঁপন, পরিশ্রমে, মদস্রাবে বিলোল[৩]
(বুদ্ধদেব বসু)

নৃত্যরতা — রাই নাচত শ্যামসঙ্গে॥
. . . .
তাতা দ্রিমি ডিমি বাজে মৃদঙ্গ।
সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ॥
. . . .
হিয়ে হীর-হার অলস লোল।
চরণ-মঞ্জীর ঘুঙ্গুর বোল॥
(জ্ঞানদাস)

ক্রীড়ারতা — ফুলের গেড়ুয়া ধরয়ে লুফিয়া সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে মুচকি মুচকি হাস॥
(গোপাল দাস)

---

১. 'মৃত্যুস্বপ্ন'
২. 'যৌবনবতী'
৩. 'শঙ্করাচার্যের আনন্দলহরী অবলম্বনে স্তোত্র' [বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা]

অশ্বচালনরতা — অশ্ব-সঞ্চালন বেগে দীর্ঘ কৃষ্ণবেণী
পীন বক্ষে পড়িয়াছে খসি।
অশ্বসঞ্চালন-শ্রমে উঠিছে, পড়িছে,
লীলা করি উন্নত উরস;
তরঙ্গিত সরোবরে উঠিছে, পড়িছে
ফুটোন্মুখ যুগ্ম তামরস।[১] (নবীনচন্দ্র সেন)

কলহরতা — অছ্‌রী জনহুঁ অখারে বাজেঁ॥
ভা বাহুঁ ন বাহুঁ ন সৌ জোরা।
হিয় সোঁ হিয় কোই বাগ ন মোরা॥
কুচ সোঁ কুচ ভই সৌহেঁ অনী।
নব্‌হিঁ ন না এ টুটহিঁ তনী॥
কুম্ভস্থল জিমি গজ মৈমন্তা।
দূবে়া আই ভিরে চৌদন্তা॥[২] (জায়সী)

("দুই অপসরী যেন ভূমিতে লড়াই করতে লাগলেন। বাহুর সঙ্গে বাহু আবদ্ধ হল, বক্ষের সঙ্গে সংলগ্ন হল বক্ষ, কেউ কাউকে বাগ মানাতে পারলেন না। নখচিহ্নিত কুচযুগল কুচযুগলের সন্নিহিত হল, কেউ কাউকে নত করতে পারলেন না, নীবিবন্ধ খুলে গেল। মদমত্ত দন্তীর ন্যায় তাঁরা পরস্পরকে আক্রমন করলেন।" অনুবাদ: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

পুষ্পচয়নরতা— (১) ভোরের ঝিলের জলে শালুক পদ্ম তোলে কে
ভ্রমর কুন্তলা কিশোরী
... .
বুকের আঁচলে ফুল উঠিছে শিহরি।[৩]
(নজরুল)

(২) একদিন অস্তগামী দিবাকর করে
স্নানান্তে বসিয়া কোনো সরসীর ধারে
দেখিলাম এক নারী, নম্রা কুচভারে

---

১. [ত্রয়ীকাব্য (প্রভাস 'ষষ্ঠ সর্গ')]
২. [পদ্মাবতী (নাগমতি পদ্মাবতী বিবাদ খণ্ড)]
৩. নজরুল সংগীত

ভাঙ্গিল মৃণাল এক মৃণালিনী করে,[১]
(বলদেব পালিত)

স্নানরতা — অস্পষ্ট ধারনা তুমি এক। স্বপ্ন কুয়াশায় ঢাকা?
যখন তোমার মুখে চিবুকে গ্রীবায় স্তনমূলে
নামে জলধারা
তখন তোমাকে কীরকম মনে হয়
পারবো না বলতে কখনো।[২]
(শামসুর রাহমান)

প্রসাধনরতা --- (১) আনবে গোলাপে ফাল্গুনের উজান
কামতাপিত কুমারী তার ছোট্ট গোপন
স্তনের ফাঁকে সে ফুল করবে রোপণ[৩]
(ই. ই. কামিংস/অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

(২) আজি চৈত্র-পূর্ণিমায় মালতী দুলালো হীরা দুল,
সিন্দুর বিন্দুর 'পরে সাজাইল সোনালিয়া টিপ,
অলক দুলায়ে দিল, খোঁপায় গুঁজিল লাল ফুল,
সোনার প্রদীপ-ভাণ্ডে গন্ধতেলে জ্বালিল প্রদীপ।
চন্দন-অঙ্কনে স্নিগ্ধ স্তনযুগ—বিকশিত নীপ —
অতিসূক্ষ্ম হেমাঙ্কিত কাঁচুলিতে আবরিল সুখে,
দর্পণে হেরিল ছায়া বারম্বার, দেহ-মোহ-দ্বীপ
বিমুগ্ধা ধরণী-বক্ষে বিরচিল অসীম কৌতুকে,

অপরূপ মালতী সে—অধরে অমৃত তার চুম্বন-কামনা তার বুকে।[৪]
(অজিত দত্ত)

---

১. 'নারীর প্রেম' [কাব্যমালা (কাব্যবাণী)]
২. 'প্রতীক্ষা' [শূন্যতায় তুমি শোকসভা]
৩. 'WHEN GOD LETS My BODY BE'
('যখন র'বোনা আর মর্ত্য ছাঁচে')
[বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৪. 'মালতী' [অজিত দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

কেশবন্ধনরতা — বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলেঁ বদন কমলে।।
অঙ্গভঙ্গ কৈলে কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে।।
কিসকে ঘুচায়িলেঁ রাধা নেতের আঞ্চল।
দেখায়িলেঁ কুচভার করায়িলেঁ বিকল।।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

ঢেঁকিচালনরতা — ক্লান্ত কমলের মত শ্রান্ত দেহভার
রাখিয়া ঢেঁকীর আড়ে যুবতী সুন্দরী
রক্ত পাদপদ্মে ঘন করিছে প্রহার,
এলোমেলো বেশে বালা বন আলো করি।
মেঘাচ্ছন্ন গিরি যেন ঘোর ভূকম্পন
বিপুল তরঙ্গ তুলি দেয় কাঁপাইয়া
সে বিশাল স্ফীত বক্ষে মন্দ আন্দোলন
দেখা যায় ছিন্নভিন্ন কেশদাম দিয়া।
(গোবিন্দচন্দ্র দাস)

হরিদ্রাপেষণরতা — হলুদ বাটিছে হলুদ বরণী মেয়ে,
হলুদের পাটা হাসিয়া গড়ায় রাঙা অনুরাগে নেয়ে।
দুই হাতে ধরি কঠিন পুতারে ঘসিছে পাটার পরে,
কাঁচের চুড়ি যে রিনিকি ঝিনিকি নাচিছে খুশীর ভরে।
দুইটি জঙ্ঘা দুইধারে মেলা কাঠ-গড়া কামনার,
তাহার উপর উঠিতে নামিতে সোনার দেহটি তার ;
মদ্দিত দু'টি যুগল সারসী শাড়ী সরসীর নীরে,
ডুবিতে ভাসিতে পুষ্প ধনুরে স্মরিতেছে ঘুরে ফিরে।[১]
(জসীমউদ্দীন)

দধিমন্থনরতা — নিজ দাসী যত গৃহকর্মরত
আপনি মথয়ে দধি।।

---

১. [হলদ বরণী]

ক্ষৌম পরিধান ঘন পাশ টান
শ্রমে ঘর্ম্মমুখী কুচ দোলে।[১]
(মাধবাচার্য)

রন্ধনরতা — দুঃখিনীরা কাজে নামে, ঠাণ্ডা আর
রোগা স্তনগুলি
ঝুলিয়ে ফুঁ দেয় কাঠে[২]
(বোদলেয়ার/অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

সেবারতা — আমার স্ত্রী শিশুটির
মাথায় পানির ধারা দিচ্ছিলেন। তাঁর চোখ ছিল
পলকহীন পাথর।
স্তন দুটি দুধের ভারে ফলের আবেগে ঝুলে আছে[৩]
(আল মাহমুদ)

পাঠরতা—(১) আলোকের আভা তার অলকের চুলে,
বুকের কাছেতে হাঁটু তুলে
বসে আছে ঠেস দিয়ে পিপুলগুঁড়িতে,
পাশেই পাহাড়ে নদী নুড়িতে নুড়িতে,
ফুলে উঠে চলে যায় বেগে।
... ...
ইংরেজ কবির লেখা একমনে পড়িছে তরুণী,[৪]
(রবীন্দ্রনাথ)

(২) নড়বে হাওয়ায় ঢিলে ব্লাউজের চওড়া কিনার,
চুলগুলি সব চোখে আর বুকে, চিবুকে তোমার
ঝরবে হাওয়ায় ;—কবিতা আমরা পড়বো যখন[৫]
(বুদ্ধদেব বসু)

---

১. [কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য]
২. 'প্রভাতী প্রদোষ'
৩. 'অন্তরভেদী অবলোকন'
৪. 'অসম্ভব ছবি' [সানাই]
৫. 'কবিতা' [কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা]

কুচের দৃষ্টিবিদ্ধ, স্পর্শশিহরিত, চুম্বনসিক্ত, নখক্ষতশোভিত, দংশনবিক্ষত, অতিরিক্ত হস্তাকর্ষণে নিষ্পেষিত, শ্রমশীকরযুক্ত রূপ দেখে কবিরা উল্লসিত।

কুচের দ�ৃষ্টিবিদ্ধ রূপ—পিয়ালার মতো দুটি বক্ষপদ্মে উড়ে গেলো দৃষ্টির ভ্রমর।[১]

(আল্ মাহমুদ)

স্পর্শশিহরিত রূপ—"হাত দিয়া কুচ গোপন করি, বিদ্যুৎ পড়িবার সময় ঢাঁকা যায়না।[২]"

(বিদ্যাপতি)

চুম্বনসিক্ত রূপ—১) কুচগিরি চুম্বে এক কাঁচুলি ছিটিল।

(আলাওল)

২) বুকে, নাভিমূলে, থুতনিতে
অথবা গ্রীবায় লেগে থাকে থরো থরো চুম্বনের
ম্যাজেণ্টা স্বাক্ষর।[৩]

(শামসুর রাহমান)

নখক্ষতশোভিত রূপ—কুচ কোরী ফর নখ খত রেহ।

(বিদ্যাপতি)

দংশনবিক্ষত রূপ—তাম্বুল অধর মধুর বিম্বফল কির দংশন কি বা দেল।
কুচ ছিরিফল পর বিহগ কিয়ে বৈঠল তাহে অরুণ রেখ ভেল।

(বৈষ্ণব কবি)

অতিরিক্ত হস্তাকর্ষণে নিষ্পেষিত রূপ—রঙ্গ পরিহর অতি ভেল গোর।
মাজি ধবল জনু কনক কটোর।।

(বিদ্যাপতি)

শ্রমজলযুক্ত রূপ—উলটিয়া রহিল সুমেরু ধরাধর।।
…শ্রমজল সতত বরিসে বৃষ্টিধার।।

(আলাওল)

---

১. 'অসুখে একজন"
২. ৪৮৮
৩. 'বিন্যাসের সপক্ষে' [এক ধরনের অহংকার]

নায়কের কলিকাদহনের উদ্যোগ দেখে শঙ্কাতুরা নায়িকা যখন অনুরাগ-হীন অস্বীকৃতি জানায়—তখনকার কুচরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। নায়িকা যখন মদনপীড়িত এবং কুচপীড়ন করতে দিতে আগ্রহী অথচ লজ্জায় সেকথা ব্যক্ত করতে পারছেনা — কবি দেখেছেন তখনকার কুচসৌন্দর্য। কামজর্জর নায়িকা যখন স্বেচ্ছায় রমনে সাগ্রহ এবং সরব সম্মতি জানায়—লক্ষ্য করেছেন তখনকার কুচশোভা। নায়ক যখন জোরপূর্বক লুট করে নিতে থাকে নায়িকার যৌবন—কুচের তখনকার কৌতুককর অবস্থা লক্ষ্য করে কবি পুলকিত। কুচ যখন নায়িকার অনায়ত্ত হয়ে নায়কের অধিকারে চলে যায়, কুচের তখনকার অবিস্মরণীয় শোভা দেখে কবি মুগ্ধ। যখন সংকোচ কেটে যায়---কামবিবশ নায়িকা দেহাবেগে উল্লসিত হয়ে ওঠে—কুচের তখনকার শিহরিত শোভা দেখে কবি তৃপ্ত। নায়ক যখন নম্রভাবে কুচভোগ করে এবং যখন হিংস্রভাবে কুচভোগ করে—তখনকার কুচরূপ দর্শন করার দুর্লভ সুযোগও কবি ছাড়েননি। দেখা যাচ্ছে, স্তনের রূপ কবি দেখেছেন সম্ভোগের ঠিক প্রাক্কালেই, দেখেছেন ভোগরত অবস্থায়, দেখেছেন বিপরীত বিহারের প্রাক্কালে, দেখেছেন বিপরীত বিহারকালে, ভোগোত্তর পর্যায়েও তার রূপ দেখতে ভোলেননি।

নায়কের মুগ্ধা-মথন-চেষ্টা লক্ষ্য ক'রে শৃঙ্গার-অনভিজ্ঞা নায়িকার অনুরাগ-হীন অস্বীকৃতিকালে কুচের অবস্থা---"(বালিকা) কাঁচা সুবর্ণ পয়োধরকে দুইটি বাহুর দ্বারা চাপিয়া প্রাণের মত রক্ষা করিতেছে।[১]" (বিদ্যাপতি)

নায়িকা যখন কামপরবশ ও মিলনলোলুপা—

আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচ কুম্ভ কহি গেল অপনক আস॥ (বিদ্যাপতি)

নায়িকা যখন রমনোদ্যত---মাটির মুদ্রার মত মন আর স্তন
অশ্লীল আরব্ধ বিষ তুলেছে ফনায়;
সাহসে আঘাতে স্পর্শে তোমার রমণ
শেষ করো।[২]

(আল মাহমুদ)

---

১. ৫৯

২. 'সাহসে আঘাতে স্পর্শে'

হৃতবসনা নায়িকা যখন লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ প্রয়াস করে—"বসন খুলিয়া গিয়াছে, বুক হাত দিয়া চাপিয়া রহিয়াছে, (যেন) বাহিরে রত্ন রাখিয়া আঁচলে গেরো দেওয়া হইতেছে।"[১] (বিদ্যাপতি)

কুচ যখন নায়কের অধিকারে চলে যায়—সংকোচ সত্ত্বেও যখন অসহ্য পুলকে নায়িকার দেহ রোমাঞ্চিত হয়—"আজ কানাইয়ের আয়ত্তে পড়িলাম, ···আপনার অঙ্গ অনায়ত্ত হইল। হাত দিয়া কুচ গোপন করি, বিদ্যুৎ পড়িবার সময় ঢাকা যায় না।"[২] (বিদ্যাপতি)।

যখন লজ্জা দূরে যায়—আত্মসংবরণে অসমর্থা নায়িকা শিহরিত হ'তে হ'তে আকুল হ'য়ে যায়—"করে কুচ ধারণ করিতে নারী আকুল হইল, দেখিয়া মুরারি অধর-মধু পান করিল।"[৩] (বিদ্যাপতি)।

অধিকৃত কুচ যখন নায়ক নম্রভাবে ভোগ করে—"বারবার বিহ্বল হইয়া আমার কুচ স্পর্শ করিল, যেন নির্ধন সোনার বাটি পাইল।[৪]

(বিদ্যাপতি)।

ভোগক্রিয়া যখন দুর্ধর্ষ হ'য়ে ওঠে—"(কুচদ্বয়) শ্রীফলের ন্যায় ছিল, (এখন), আবরণশূন্য নারঙ্গ ফলের ন্যায় করিয়াছে।"[৫] (বিদ্যাপতি)।

সম্ভোগের বিভিন্ন পর্যায়ে কুচরূপকে আর একবার দেখে নিই।
সম্ভোগের ঠিক প্রাক্কালে—"কুচকুম্ভের উপর রোমাঞ্চ হইতেছে।"[৬]

(বিদ্যাপতি)

ভোগরত অবস্থায়—

১) তবে উঠিল গর্জিয়া সেন রঞ্জার উপর।
ঐমনি দুকরে ক'রে ধরে পয়োধর।।

(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

২) পয়োধর গ্রীবা ধরি ঘন বাহু তাড়ি।
রতিযুদ্ধে যেন দুই মত্তে গড়াগড়ি।।

(দৌলৎ কাজী)

---

১. ৬৭৫
২. ৪৮৮
৩. ৮৫৫
৪. ৭৬
৫. ২৯১
৬ ১০৯

বিপরীত বিহারের প্রাক্কালে—উচ কুচ ফুটিয়া চঞ্চল মন অতি।
বিপরীত রতি দেহ পরম যুবতী।
(কৃষ্ণরাম দাস)

বিপরীত বিহারকালে—১) "অম্বর (বসন) খসিল, পর্বত (স্তন)
উল্টাইয়া গেল। ধরনী (নিতম্ব) ডগমগ দুলিতেছে।"[১]
(বিদ্যাপতি)

২) উলটিয়া রহিল সুমেরু ধরাধর।
(আলাওল)

ভোগোত্তর পর্যায়ে—১) "সুরত সমাপ্ত করিয়া হস্ত পয়োধরে স্থাপন করিয়া নাগর শয়ন করিল; যেন পূজারী সুবর্ণ-শম্ভু পূজা করিয়া কমলের দ্বারা ঢাঁকিয়া ফেলিল।"[২]
(বিদ্যাপতি)

২) রসসিন্ধু সঞ্চারিয়া অতি বড় শ্রান্ত হৈয়া
দুইজন শুতিল শয়নে।
···আর ভুজ উরে দিয়া মৃদু তনু আবরিয়া
সুখে নিদ্রা গেল দুইজনে।।
(আলাওল)

৩) সব সাঙ্গ হলে পর, ঘুম আসবার আগে
নতুন টাকার মত সরল নিবারণ
দুখানি শরীর
বিছানায় অবিন্যস্ত।
ঠাণ্ডা বুকের কাছে স্বেদময় মুখ
উরুর উপরে আড়াআড়ি ফেলে রাখা
এই মাত্র লোভহীন হাত
চরাচরে তীব্র নির্জনতা, এই তো সময় ভালবাসার[৩]
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

১. ৬৭৮
২. ৮৭৪
৩. 'ভালোবাসা [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা],

১৬

কবিকুল বিভিন্ন ধরনের সম্ভোগকালেও কুচরূপকে লক্ষ্য করতে ভোলেননি।

১। মুখ্য সম্ভোগ :

ক) সংক্ষিপ্ত সম্ভোগকালে (পূর্বরাগের পর যে সম্ভোগ)—

যব ধনি ভুজ ভরি ধরল মুরারি।
ভিজল বসন তন রোদন বারি॥
···হসি হসি হরি যব খোলত বাস।
থরহরি কাঁপই নহি নহি ভাষ॥
অতি ডরে কাতর ধনী মুখ দেখি।
তর লহু লহু উর পর নখ রেখি॥[১]

(বিশ্বনাথ চক্রবর্তী)

পূর্বরাগ পর্যায়ে রতি-অনভিজ্ঞা মুগ্ধার এই ভীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। হরি হেসে হেসে বক্ষবাস খুলছেন আর অজ্ঞাতস্বাদা বালিকার পয়োধর অশ্রুসিক্ত হ'য়ে যাচ্ছে—থরথর ক'রে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। কুচগাত্রে নখরেখা তাকে বড়ই কাতর ক'রে তুলেছে।

খ) সংকীর্ণ সম্ভোগকালে (মানের পর যে সম্ভোগ)—

রাই যব হেরল হরিমুখ ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর॥
যবহুঁ কহল পহুঁ লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনি অবনত মাথ॥
যব হরি ধয়লহি অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাশ॥
যব পহুঁ পরশল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পুরল সব অঙ্গ॥ (বৈষ্ণব কবি)

---

১. [পদাবলী পরিচয়] শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মানান্তে এই যে দেহমিলন---এ সময়ও মানিনীর নয়ন অশ্রুসিক্ত। অপমানের জ্বালা আর অভিমানের বেদনা তাকে অশ্রুপূর ক'রে তুলেছে। অন্তর স্বতঃস্ফূর্ত সায় না দিলেও দয়িতের করস্পর্শে দয়িতার দেহ কিন্তু পুলকিত হ'য়ে উঠেছে। হরি অঞ্চল স্পর্শ করামাত্রই তাই রাধার বক্ষপ্রদেশ শিহরিত হ'য়ে উঠেছে।

গ) সম্পন্ন সম্ভোগকালে (কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ)—

দৃঢ় করি দুয়ি তনে।
নখ দিল ঘন ঘনে॥
(বড়ু চণ্ডীদাস)

প্রবাস থেকে ফিরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এ মিলনে নির্ভয় এবং পরিপূর্ণ আনন্দ ফুটে উঠেছে। নখাঘাতে নখাঘাতে বক্ষপ্রদেশ ক্ষতাক্ত হ'য়ে যাচ্ছে তবুও রাধিকা কাতরও নন, অশ্রুমুখীও নন---বরং উল্লসিত।

ঘ) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগকালে (সুদূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ)—

আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥
(বিদ্যাপতি)

সুদূর প্রবাসের পর হরি ফিরে এলে নিজের দেহ-বেদীতে কেমন ক'রে হরি-অধিষ্ঠান করবেন---শ্রীরাধা তাই ভাবছেন। বিরহের দুঃসহ দুঃখকালে কল্পনায় এই সম্ভোগচিত্রের জন্ম হচ্ছে---তাই এ সম্ভোগ সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। এই মিলন-সুখানুভূতির আনন্দ অফুরন্ত। এই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগসময়ে তাই কুচদ্বয় নিয়েছে মঙ্গলকলসের ভূমিকা। দেহ-বেদীতে প্রিয়-অধিষ্ঠানের সময় স্তনের এর চেয়ে মহৎ দায়িত্ব আর কি হ'তে পারে?

২। গৌণ সম্ভোগ: (স্বপ্ন-সম্মেলন গৌণ সম্ভোগের অন্তর্ভুক্ত)

করে কুচমণ্ডল রহলিহুঁ গোএ।
কমলে কনকগিরি ঝাঁপি ন হোএ॥
(বিদ্যাপতি)

রাই স্বপ্ন দেখছেন যেন মাধব দেহ-ভোগাকাঙ্ক্ষায় তাঁর অতি নিকটে এসে বসেছেন। তখন স্বাভাবিক সংকোচ বশতঃ রাধা কুচদ্বয় করাবৃত করলেন। মুগ্ধ কবি তখন মন্তব্য করেন, পদ্মফুলে পাহাড়কে আবৃত করা যায়না। স্বপ্নমিলনের সময় কুচের যে রূপসৃষ্টি হলো তা-ও স্বপ্নেরই মতো অপরূপ।

কবিকুল বিহ্বল হ'য়ে দেখেছেন কিশোরীর, তরুণীর, উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতীর, পূর্ণযৌবনা যুবতীর বক্ষের অপরূপ সঞ্চয়কে। লক্ষ্য করেছেন অপগতযৌবনার, প্রৌঢ়ার, বৃদ্ধার ব্যয়িত বক্ষকে। তবে কুচের যৌবনাবস্থা বর্ণনায়ই কবিদের অধিকাংশ অভিভূত সময় ব্যয় হয়েছে---বিগতযৌবনার বক্ষবর্ণনার দীর্ঘ অবকাশ তার হয়নি। লোলচর্মস্তনের বর্ণনায় কবিদের মধ্যে উৎসাহের খুবই অভাব লক্ষিত হয়েছে। এই অনুৎসাহের কারণ হচ্ছে---কবিরা যে হাটের সওদাগর—তার নাম রূপের হাট—এবং সেখানে তাঁরা যে সওদাটির বিকিকিনি করেন, তার নাম যৌবন। অন্য কোনো সওদার সেখানে কাটতি নেই বললেই চলে। তাই নিঃশেষিত বক্ষদর্শন নয়, বরং কবিদের যত কৌতূহল কিশোরীর অপরিণত বক্ষদর্শনে—যত উৎসাহ যুবতীর পরিণত বক্ষসম্ভোগে। কিশোরীর অপরিণত স্তন কিভাবে ধীরে ধীরে যৌবনের নিটোলতা লাভ করে—গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেই বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন কবি। স্তন-উদ্‌গম-স্থল লালিম হয়েছে মাত্র ('উরজ উদয়-থল লালিম দেল'[১]), এমন অবস্থা থেকে তাঁরা পর্যবেক্ষণ শুরু করেছেন। তারপর স্তনের অপরিস্ফুট, স্ফুটনোন্মুখ, অর্ধস্ফুট, পূর্ণপ্রস্ফুটিত,

---

১. বিদ্যাপতি।

ফুটতে না পেরে বিপর্যস্ত এবং ফোটার পরে ম্লান অবস্থার সঙ্গে ঘটেছে কবির পরিচয়।

অপরিস্ফুট স্তন—কমল কলিকা-কুচ হৃদয়ে উগিল।

(শাহ্ বারিদ খান)

স্ফুটনোন্মুখ— ফোটো ফোটো তাহে (বক্ষে) দুটি প্রণয় পীযুষভরা
প্রেমিকের প্রাণহরা
সোনার নলিনী।

(কায়কোবাদ)

অর্ধস্ফুট— বক্ষের পরে আধমুকুলিত যুগল কমল দুটি
এখনো সুবাসে ভরে নাই দিক পল্লব দলে ফুটি।[১]

(জসীমউদ্‌দীন)

পূর্ণপ্রস্ফুটিত —মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল।

(বিদ্যাপতি)

ফুটতে না পেরে বিপর্যস্ত—আর দেখ পদ্মকলি, অলি-মনোলোভা
হোরেছিল প্রাণ তব কুচকলি-শোভা ॥
নীহার করিল তারে, অশেষ আঘাত।
ফুটিবে কি উঠিবে কি, সদলে নিপাত ॥[২]

(ঈশ্বরগুপ্ত)

ফোটার পরে ম্লান—"কমলের ন্যায় উচ্চ কুচযুগ বক্ষে ভার হইয়াছিল,
এখন তাহা ফুটিয়া ম্লান হইল।"[৩]

(বিদ্যাপতি)

যৌবনবতী বালার স্তন মুহূর্তে মুহূর্তে কেমন ক'রে স্ফীত হ'তে থাকে, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। স্তনবিকাশের সাথে সাথে যে কাঁচুলিবন্ধন আঁট হ'য়ে আসছে, শকুন্তলা তা বুঝতে পারেননা।

---

১. 'কৈশর যৌবন দুহু মেলি গেল'
২. [ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ]
৩. ৮৭১ (বিরহিনীর তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শে স্তন মলিন হয়েছে বোঝানো হচ্ছে।)

তাই তিনি অনসূয়াকে বলেন—"সখি অনসূয়া, খুব আঁট করে বল্কল বেঁধে প্রিয়ংবদা আমাকে আড়ষ্ট ক'রে রেখেছে। একটু আলগা ক'রে দে তো বাঁধনটা।

অনসূয়া– দিচ্ছি (একটু আলগা করে দিলেন)।

প্রিয়ংবদা---(সহাস্যে) এ ব্যাপারে তুই বরং তোর যৌবনকেই দোষ দে, যে যৌবন স্তন বিস্তারের জন্যে দায়ী।"[১]

[শকুন্তলা--(স্মিত্বা) সহি অনসূএ, অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদম্‌হি। সিটিলেহি দাব ণং।

অনসূয়া---তহ। (ইতি শিথিলয়তি)।

প্রিয়ংবদা---(সহাসম্‌) এত্থ দাব পওোহরবিত্থারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ।][২]

কিশোরীর নবীন স্তন স্ফীত হ'তে হ'তে কেমন করে শেষপর্যন্ত যৌবনের টোলহীন সুগঠন লাভ করে, চারটি চরণে সেই রূপান্তরের কথা চমৎকার উপমায় ধরেছেন রূপদক্ষ বিদ্যাপতি—

পহিল বদরি কুচ, পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ॥
সো পুন ভৈ গেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥

ক্ষুদ্রাকৃতি কুল থেকে কমলায়, কমলা থেকে দাড়িম্বে, দাড়িম্ব থেকে সুডৌল এবং বৃহদায়তন শ্রীফলে রূপান্তরিত হয়ে পয়োধর লাভ করে তার পূর্ণ পরিণতি। উত্তরযৌবনে স্তনের এই নিভাঁজ মাংসস্ফীতি কুঞ্চিত এবং শিথিল হ'য়ে আসে। চক্রাকৃতির কঠিন মাংসপিণ্ড তার অদ্ভুত বেদনাসহ কোথায় যায় হারিয়ে। সেই শিথিল স্তনবর্ণনায় কবিদের যত অনুৎসাহই থাক, বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে কুচের বিবর্তন পর্যবেক্ষকের চোখে তাঁদের দেখতেই হয়েছে মাঝে মধ্যে। তাই প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে স্তন তার উদ্ধত শির কেমন ক'রে নত ক'রে ফেলে, তা দেখেছেন কবি ("নম্র

১. [মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)]
২. [অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌] কালিদাস।

শিরঃ এবে উচচ কুচ"[১]—মধুসূদন), ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের মত স্তন তার বর্তুলত্ব কেমন ক'রে হারিয়ে ফেলে, দেখেছেন তা-ও ("পাশা-পাশি শীতল রমণী—তার একদা সুগোল বুক/নষ্ট চাঁদ,"[২]—আবু হেনা মোস্তফা কামাল)। যৌবনগর্বী নিরেট স্তন নিঃশ্বাসের তালে তালে মৃদু ওঠানামা করতে পারে ("উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।"[৩]--রবীন্দ্রনাথ), ছন্দায়িত গতিভঙ্গির ছন্দে ছন্দে আন্দোলিত হ'তে পারে, নৃত্যের তালে তালে দোদুল্যমান হ'তে পারে ("পাঁচশ কামিনী দুলুনিপ্রবন স্তন বের ক'রে ধেই ধেই নাচ শুরু করে।[৪]"--শামসুর রাহমান), প্রিয়তমের হাত তাকে ক্রীড়াচ্ছলে দুলিয়ে দিতে পারে, বিপরীত বিহারকালে তা অভিনব ভঙ্গিতে আলোড়িত হ'তে পারে--কিন্তু বাতাসের সাধ্য কি তাকে দোলায়? অথচ যৌবন অপহৃত হ'লে সেই তুঙ্গ স্তনই যখন ঝুলন্ত অসহায়তা লাভ করে, তখন বাতাস অনায়াসে তাকে দোলাতে পারে---(১. "গলিত তোমার কুচ হেলয়ে পবন।"--মুকুন্দরাম; ২. "অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।" ---ভারতচন্দ্র)। সন্তানের জন্ম দিতে দিতে রমণীর দেহের বাঁধুনি হ'য়ে পড়ে শিথিল তাই স্বভাবতঃই কুচ হ'য়ে পড়ে গলিত। চলতে গেলে তখন দৃষ্টিকটুভাবে দুলতে থাকে কুচদ্বয়। কাঁচুলিবন্ধন তখন আরো আঁটসাঁট না করলে আর চলেনা। বারবনিতা বারুই-বউ সম্পর্কে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী যথার্থই বলেন—চলিতে চলিতে কুচযুগ যাবে দুলে/তিন ছেলের মা মাগী কাঁচুলী বান্ধে তুলে॥ যুবতীর ঘন সতেজ কুচদ্বয় ক্রমশঃ শিথিল হ'তে হ'তে বার্ধক্যে হ'য়ে পড়ে শীর্ণ, বিশুষ্ক। লোকধাঁধায় তাই বলা হয়েছে—

যুবতীর তাজা মোটা
বুড়ীর হুক্‌না।

এই বিশুষ্কতা এতই প্রকট যে, এককালের অমৃতনির্ঝরে আর এক বিন্দু রসও অবশিষ্ট থাকেনা ("স্তনদ্বয় ঝুলিয়া পড়িয়াছে . . . . . .এক ফোঁটাও রস নাই।"[৫]---বিদ্যাপতি)। এই বিশুষ্কতার জন্য বৃদ্ধার পয়োধরকে মৃত

---

১. 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' [বীরাঙ্গনা কাব্য]
২. [আপন যৌবন বৈরী]
৩. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]
৪. 'নো এক্সিট' [আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি]
৫ ৬

বলতে চান বোদ্‌লেয়ার--বুড়ী বেশ্যার শুক্‌নো শহীদ স্তনে[১]। কুচের অপরূপ কাঠিন্য গলিত হ'য়ে যাওয়া, গোলত্ব বিনষ্ট হওয়া এবং রসশূন্য হ'য়ে পড়াই তার শেষ অবস্থান্তর নয়। অবশেষে বৃদ্ধবয়সে বক্ষের মোহনীয় স্থান থেকেও চ্যুত হ'য়ে যায় স্তন। নাভিমূলে পড়ে এলিয়ে--(১) নাভিমূলে দুই কুচ লুলে। (বড়ু চণ্ডীদাস) (২) স্তন দুই গোটা তার দোলে নাভিমূলে। (দুঃখী শ্যামদাস)।

গর্ভ—রমণীদেহের এক বিশেষ অবস্থা। সেই বিশেষ সময়ে কুচের রূপপরিবর্তন পরীক্ষকের দৃষ্টিতে দেখেছেন কবিরা। কুচ তখন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে—বৃন্তদ্বয় হয় ঘোরকৃষ্ণ বা ঘননীল—

(১) প্রান্ত ছেয়ে আছে আম্র বনরাজি ঝলক দেয় তাতে পক্ক ফল
বর্ণে চিক্কন বেণীর মত তুমি আরূঢ় হলে সেই শৃঙ্গে
দৃশ্য হবে যেন ধরার স্তনতট অমর মিথুনের ভোগ্য
গর্ভসূচনায় মধ্যে কালো আর প্রান্তে পাণ্ডুর ছড়ানো।[২]
(কালিদাস/অনুবাদঃ বুদ্ধদেব বসু)

(২) দিনে দিনে কুচের আগে পাণ্ডুর বর্ণ ধরে।
(দ্বিজ মাধব)

---

১. 'পাঠকের প্রতি' [বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা] অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু
২. [কালিদাসের মেঘদূত]

(৩) কুচাগ্র হইল কাল উদর ডাগর।
মৃত্তিকায় শয়নেতে সদা সমাদর॥
... পাণ্ডুবর্ণ হ'ল অঙ্গ খসে আভরণ॥
কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ হইল স্তনবোঁটে॥ (কৃত্তিবাস)

(৪) উপরে পড়িল ভেলা উচ কুচ দ্বন্দ্ব।
সাতকুম্ভ কুম্ভমুখে নীল অরবিন্দ॥
(কৃষ্ণরাম)

(৫) শরীর করএ জ্বালা কুচাগ্র কালিম।
(শা' বারিদখান)

(৬) কালিমা কুচের আগে কিসের কারণে।
ঘন নখরেখ তাহে পান্ডুর বরণে॥
(বলরাম কবিশেখর)

(৭) তিন একমাস হত্যে চিহ্ন গেল পাওয়া।
কুচাগ্রেতে আনি পড়ে পেটে নড়ে ছেলে।
(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

গর্ভকালে কুচ কেনই বা নতমুখ হয় এবং কুচবৃন্ত কেনই বা অত-কালিমাময় হয়, ভারতচন্দ্র তার চমৎকাব ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

উদর আকাশে সুত চাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয়॥
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিনে উচ।
অভিমানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ॥

যে কুচ-শ্রীফলের ভারে ক্ষীণ কটিদেশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হতো, এখন সুদিন পেয়ে সেই ক্ষীণ কটিই দিন দিন উন্নত হয়ে উঠছে। অভিমানে কালামুখ কুচ তাই এখন নম্রমুখ। সুযোগ বুঝে লুক্কায়িত শিরগুলো শির উঁচু করছে—

কাল পেয়ে শির তোলা দিল যত শির। (ভারতচন্দ্র)

স্তন এখন দুগ্ধ পরিপূরিত। স্তন-প্রচাপনের দ্বারা গর্ভলক্ষণ বোঝার চেষ্টা করছেন কবি— কালিমা কুচের আগে দুগ্ধ দেখে চাপি।
নিশ্চয় জানিল গর্ভে সন্ধে নাহি ভাবি॥
(কৃষ্ণরাম)

স্তনে ক্ষীরের স্বাদুতা লক্ষ্য ক'রে রুধির যেন নীরে পরিণত হচ্ছে তাকে দুগ্ধরূপ দানের জন্য—

স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির। (ভারতচন্দ্র)

রবীন্দ্রনাথ বলেন প্রাণে যখন স্নেহ জাগে, স্তনে দুগ্ধ পুরে ওঠে—তখনই জননী তার জঠরের গোপন শিশুকে জানতে পারে —

জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে।[১]

মৃতবৎসা প্রসূতির স্তন দুধের ভারে কেমন করে ফেটে যাবার মত হয়--তীক্ষ্ণ চোখে তাও পর্যবেক্ষণ করেছেন কবি --

গর্ভে ধ'রে পেলাম ক্লেশে সার্থক না হল শেষে
হায় মোর কি ছিল অনীকে।
ভাবিতে অনল উঠে ক্ষীর ভরে স্তন ফাটে
তোমা বিনে দিব কার মুখে।
(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

যে স্তন শিশুর অধিকারে—সে স্তন সম্বন্ধে কবিদের ততখানি ঔৎসুক্য না থাকলেও তবুও আমরা কিছু কিছু স্মরণযোগ্য চিত্র খুঁজে পাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ জননীর স্তন্য পান করেন, তখনকার দৃশ্য কবির চোখে আকাশে পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের মত অপরূপ-

১. 'সমুদ্রের প্রতি' [সোনার তরী]

যশোদার কোলে মোন কুতুহলে
স্তন পান হরি কৈল ॥
দেব-ভগবান করে স্তন পান
জননির কোলে বসি।
হেন মনে লয় কৈরাছে উদয়
শোল কলা জেন শশি ॥
(পরশুরাম)

দেবরাজকে স্তন্যদানকালে মাতা যশোদাও পরমানন্দিত—

আর য়েক দিনে রানি কোলে লইয়া জাদুমনী
কৌতুকে করান স্তন পান ॥
(পরশুরাম)

স্তন পানে অপরিতৃপ্তি থাকলে কৃষ্ণ দধিমন্থনের ভাণ্ড ভেঙে কোপ প্রকাশ করতে থাকেন—

স্তন পানে পূর্ন্ন নৈল কৃষ্ণের উদর।
কোপেতে কাঁপ এ কৃষ্ণ অব্যয় অধর ॥
ক্রোধ করি কৃষ্ণচন্দ্র মোটা হাতে লইয়া।
দধি মর্ন্থনের ভাণ্ড ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ (পরশুরাম)

স্তন্যপানে অতৃপ্ত শিশুর কাণ্ড দেখে যশোদা হাসতে লাগলেন—

হাশীতে লাগীলা রানী মোনেতে বুঝিয়া
জাদু ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছে স্তন না পাইয়া।
(পরশুরাম)

কৃষ্ণনিধনের উদ্দেশ্যে স্তনে গরললেপন ক'রে পুতুনা যখন ছলনা ক'রে শিশু কৃষ্ণকে দুগ্ধপান করাতে গিয়েছিল, তখন কৃষ্ণের সেই প্রচণ্ড চোষণ রীতিমত দর্শনীয় ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—

আহা মরি ওরে বাছা নন্দের নন্দন।
দুখিনীর দুগ্ধ পান কর বাপধন ॥
তা জানিয়া ত্রিবিক্রম স্তনে দিয়ে মুখ।
এমন টানিলা তার বুকে লাগে হুক ॥
(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

সেই প্রচণ্ড চোষণ পুতুনার প্রাণকে স্তনবৃন্তে টেনে এনেছিল। এবং এভাবেই পুতুনার মৃত্যু হয়েছিল—

চুচুকে চুম্বক দিয়া করেন স্তনপান।
পূতুনার প্রাণের সহিতে পড়ে টান।।
মরি মরি প্রাণ যায় ডাকে পূতনি।
কৃষ্ণের চুম্বকে ধায় স্তনমুখে পানি।।
(অভিরাম দাস)

মনসামঙ্গল কাব্য থেকে শিশুর স্তন্যপানের একটি চিত্র তুলে ধরা যাক। রজকিনী নেতার পুত্র স্তন্যপানের জন্য জ্বালাতন করলে, দেবতাদের কাপড় কাচার বিলম্ব হবে ভেবে এক আছাড়ে নেতা তাকে মেরে ফেললো। তারপর কাপড় কাচা শেষ হলে পুত্রকে জীবন্ত ক'রে তাকে স্তন্যদান করতে বসলো। রজকিনী--ধুইএ্যা লইল সতী দেবের বসন।

ছেল্যাকে জিয়াইয়া পাছে পিয়াইল স্তন।।
(জগজ্জীবন)

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে দেখা যায়-সুন্দর যখন ধরা পড়েছিল, সে সংবাদ শুনে বালক-বৃদ্ধ-যুবক সবাই ছুটেছিল; স্তন্যপানরত শিশুকে মাটিতে ফেলে ছুটেছিল সুন্দরী যুবতী--

ধরা গেল চোর সোর পড়িল নগরে।
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় নাহি রয় ঘরে।।
স্তন পান করে শিশু কোলে যে ধনীর।
মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির।।

স্পষ্ট কল্পনা করে নেয়া যায়, দুঃসংবাদটি পাওয়ার আগে সুন্দরী রামা আলস্য-ভরে কোলের শিশুকে তার শোভন স্তন পান করাচ্ছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে রঞ্জাবতীকে দেখি একই সঙ্গে দুই শিশুর মুখে দুই স্তন দিয়ে সুখে আকুল হ'য়ে উঠতে-

পুলকে পুরিল তনু সীমা নাই সুখে।
দুই স্তন দিল বামা দোহাকার মুখে।।
(মানিকরাম)

কামধেনু যখন মনুষ্যরূপ ধারণ করেছিল, কন্যা নন্দিনী তার স্তন্যপান করছিল—বিহারীলালের চোখে তখনকার দৃশ্য—

ফিকি ফিকি হাসি মুখে,
পয়োধর পিয়ে সুখে;
চোকেতে কি কথা কয়।
নারী বুঝে, নরে নয়।
মায়ে ঝিয়ে হাসি খুশী,
মূর্ত্তি কিবা অকলুষী।[১]

শিশুর স্তন্যপান দৃশ্যটিকে বিহারীলাল 'অকলুষী' ব'লে বর্ণনা করলেন। মাতৃস্তনপানরত সুতৃপ্ত শিশু—দৃশ্যটি রবীন্দ্রনাথের চোখেও বড়ই মহিমাময়-রূপে প্রতিভাত হয়। কুসুমমুকুল তরুলতাতৃণগুল্ম পদ্মার জীবনরসধারা পানে কত না পরিতৃপ্ত! চিত্রখানি রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবে এঁকেছেন—

তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুমমুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্তহিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।[২]

শিশুরা মাতৃস্তনের অজস্র ধারা পান করতে করতে যেন শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে—এই অজস্রতা তাদের পরিতৃপ্তি দিয়েছে—তাদের মুখে দিয়েছে সুখস্বপ্নহাসি।

কবি যেন শিশু। ধরিত্রীমাতার স্তনে মুখ দিয়ে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা মেটাতে চান তিনি—

আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে

---

১. [সাধের আসন]
২. 'বসুন্ধরা' [সোনার তরী]

মিটাইবে জীবনের শতলক্ষ ক্ষুধা
শতলক্ষ আনন্দের স্তন্যরস সুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।[১]

শিশুর মত স্তন আঁকড়ে ধ'রে আদিম আনন্দরস শোষণ ক'রে নিতে চান তিনি--

ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে--জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ॥[২]

কবি কখনো বৃক্ষকে জননী বসুন্ধরার সন্তান কল্পনা করেন। স্তন্যপানরত শিশু যেমন মায়ের স্তন মুঠিতে আঁকড়ে রাখে, তেমনি শিকড়ের মুঠিতে পৃথিবীর বক্ষ আঁকড়ে ধ'রে বৃক্ষ যেন তার প্রাণরস শোষণ করতে থাকে---

শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে বক্ষ পৃথিবীর
প্রাণরস কর তুমি পান,
ওগো আম্রবন।[৩]

কোনো এক বিদেশী কবির কবিতায়ও দেখি বৃক্ষ সন্তানরূপে কল্পিত হ'য়েছে। তার ক্ষুধার্ত মুখের সুতীব্র শোষণ মাতা বসুধার মধুক্ষরা স্তনবৃন্তে, নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে--

A tree whose hungry mouth is pressed
Against the earth's sweetflowlng breast.

মোহিতলাল মজুমদারকেও দেখি স্তন্যপানরত প্রবল দুরন্ত শিশুদের উথলে-ওঠা অবোধ প্রীতিময় মুখ এবং মদির নয়নের ছবি আঁকতে---

---

১. 'বসুন্ধরা' [সোনার তরী]
২. 'মধ্যাহ্ন' [চৈতালি]
৩. 'আম্রবন' [বনবানী]

জননী দাঁড়ায়ে হোথা---স্তন্যস্রাবী ক্ষীর
পিয়িছে উল্লাসে মাতি', কাতারে কাতারে,
প্রবল দুরন্ত যারা, হাস্য অশ্রুধারে
উথলে অবোধ-প্রীতি, নয়ন মদির।[১]

রঙ্গাবতী একসঙ্গে দুই শিশুকে স্তন্যদান ক'রেছিলেন---এখানে মাতা ধরিত্রী কাতারবদ্ধ শিশুকে স্তন্যদান করছেন। ধরণীমাতার স্তন্যপান বর্ণনায় মোহিতলাল আরও কয়েকবার কল্লোলিত হয়েছেন---

কত যুগ কত জনম ধরিয়া কত হাহাকার করি'
ধরণী-মাতার স্তন যে আঁকড়ি তুলিবে অধরে ধরি';
স্পন্দিত হবে স্তব্ধ হৃদয় ক্রন্দন করি শেষে
জুড়াবে জীবন, অজানা হরষে অবশে উঠিবে হেসে।[২]

দেখা যাচ্ছে ধরিত্রীমাতার স্তন্যপানরত সন্তানের অজানা হর্ষে স্পন্দিত হৃদয়ের ছবি কবি নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন। অন্যত্র নিঃশেষ শোষণে ক্ষুধাতুর দশনাঘাতে ধরণীর স্তন জর্জরিত করে দেবার ছবি এঁকেছেন তিনি---

ধরণীর স্তনযুগ করি' দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে
করিব জর্জর
আমরা বর্বর।[৩]

এবার আমরা শিশুর স্তন্যপান দৃশ্যটিকে অমর শেক্সপীয়রের চোখে দেখবো। জননীর স্তন্যবৃন্ত দন্তহীন মাড়িতে পেষণ করতে করতে হাস্যোজ্জ্বল তৃপ্ত শিশু যখন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন কোমল ভালোবাসায় জননীর অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। মাতৃত্বের সেই মোহন অনুভব শেক্সপীয়র ব্যক্ত করেছেন লেডী ম্যাকবেথের জবানীতে

....I have given suck, and know
How tender 'tis to love the babe that milks me;

---

১. 'এক আশা'
২. 'পাপ'
৩. মোহমুদ্গর'

I would, while it was smiling in my face,
Have pluck'd my nipple from his boneless gums[১]

রমণীর কোলভরা স্বাস্থ্য-সুন্দর নিরাবরণ নগ্ন শিশুটি কৌতূহলী চোখে মায়ের পবিত্র প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, রমণী তার অর্দ্ধস্ফুট আরক্ত কোমল ওষ্ঠাধরপুটে রূপমন্থর মহান পয়োধর তুলে দিয়েছে—দৃশ্যটি দেখতে দেখতে কবির হঠাৎ ইচ্ছে করে একটি সর্ব-সমর্পিত শিশুর আনন্দে-আবেগে প্রিয়াকে একান্ত ক'রে পেতে। কিন্তু বাস্তবে এই আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাই তিনি স্বপ্নদৃশ্যের অবতারণা করেন---

অন্য রূপকল্পে উপাসনা

কালকে রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম
একান্ত হ'য়ে তুমি যেন আমার খুব কাছে এসে বসেছ
লাল-পাড় তসরের শাড়ী তোমার পরণে।
চওড়া লাল পাড়টি চাঁদের মতো সুডোল তোমার
লাবণ্যঘন সুন্দর মুখখানিকে ঘিরে আছে;
. . . .
খোলা জানালা থেকে ভোরের নরম রৌদ্র এসে পড়েছে তোমার
চোখে মুখে বুকে বাহুতে কোলের উপর;
নিরাভরণ তোমার শুভ্র সচ্ছল তনুতীর্থের
সমস্ত দেবায়ত দেবমন্দিরের চত্বরে, চূড়ায় চূড়ায়
তীর্যক কার্নিশের রূপে রেখায়।
রূপময়ী তোমার মধুর দেহতটে অন্য কোনো আবরণ নেই।
রেখাঙ্কিত তোমার নধর গ্রীবা, পেলব পুষ্পায়ত কাঁধের একাংশ,
অর্ধবিকশিত তোমার পরিপূর্ণ ভরা বুকের দীপ্ত মোহন
উদাত্ত উদার অনিন্দ্য উপত্যকা
নিবিড় এক শঙ্খ-শুভ্রতায় ঝলমল ক'রে উঠছে।
রূপোন্নত পরিপূর্ণ তোমার উচচ-শীর্ষ যুগ্ম স্তনের মহিমায়
ঐশ্বর্যময়ী রাজেন্দ্রানীর মতো তুমি ব'সে আছ;

১, [Macbeth]

অথচ তোমার দেহে কোথাও নেই সামান্যতম আভরণ অলংকার।
পীনোন্নত বর্ণপ্লাবী দুটি তোমার স্তনাগ্র চূড়ায়
দূর দিগন্তের আকাশ-আলোর অমল অম্লান প্রতিভা।
আর কোলভরা তোমার স্বাস্থ্য-সুন্দর একটি নিরাবরণ নগ্ন শিশু।
. . . . হঠাৎ মনে হল আমিই যেন সেই ছোট্ট শিশুটি হ'য়ে
শুদ্ধ নগ্নতায় শুয়ে আছি তোমার কোলে অবাক বিস্ময়ে
কৌতূহলী দু'টি চোখ মেলে ধরে পবিত্র প্রশান্ত তোমার মুখের দিকে
আর উজ্জ্বল শুভ্রতায় রূপমন্থর দৃপ্ত মহান তোমার ডান স্তনটি
সযত্নে তুমি তুলে ধ'রে আছ কত মমতায়
অর্ধস্ফুট আরক্ত কোমল আমার ওষ্ঠাধর-পুটে।
. . .তোমার শিথিল শাড়ীর প্রান্তভাগ কখন
ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছে একপাশে,—আর
অনন্য এক আশ্চর্য অলৌকিকে উদ্ভাসিত পরিপ্লাবী জ্যোৎস্না-পুলকিত
ফুল্ল কুসুমিত রহস্যময় রাত্রির মতো তোমার যুগল মাতৃবক্ষবৃত্ত
কী গভীর স্নিগ্ধতার লাবণ্যে, উন্মোচিত হয়ে আছে অনেকটাই।
আর পরিতৃপ্ত আনন্দে আবেগে উল্লাসে আমি পান করছি যেন
উদার উচ্ছ্বসিত তোমার স্তনধারা,
আর আমার ছোট্ট হাতের নধর নরম কচি আঙুলগুলি
ঊর্ধ্বোন্মুখ উন্মোচিত ক'রে
আঁকড়ে ধ'রে আছি তোমার গ্রীবা, খেলা করছি তোমার চুল,
তোমার চিবুক নিয়ে, তোমার দু'টি স্তনের খেলনা নিয়ে।
স্বপ্নের মধ্যে জানো অরুন্ধতী, এমন গভীর, একান্ত
এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ, এত নিবিড় ক'রে তোমাকে পেয়েছিলাম।
এমন একটি মোহনীয়া মদির তোমার গায়ের শেফালী-গন্ধ-ভারী
ভোরের ব্যঞ্জনায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম আমি।—সমগ্র আমার সত্তা!
অথচ এমন একটি পবিত্র শুদ্ধ বোধের অমল অঙ্গীকারে, আকাঙ্ক্ষায়
সম্পন্ন-সচ্ছল ঐশ্বর্যের উদাত্ত অলংকৃত পরাক্রান্ত দিব্য মহিমায়,
সমগ্র আমার সত্তা যেন অনাবৃত একটি পরিপূর্ণ শ্বেতপদ্মের মতো
ফুটে উঠছিল সারা রাত ধ'রে। . . .

১৭

১৮

---অমনি যদি স্বপ্নের মতোই আহা!
সর্ব-সমর্পিত একটি শিশুর আনন্দে অভিজ্ঞানে অভিমানে আবেগে
নিবিড় নির্লিপ্ত উদাসীন তোমাকে একান্ত ক'রে আমি পেতাম।
তাহলে কী যে ভালো হ'ত।
সমগ্র আমার সত্তা তাহলে আকাশের মতো হয়ে উঠতে পারত।
তোমার সম্পর্কে আমি যে আকাশের মতোই হতে চাই অরুন্ধতী![১]
(নচিকেতা ভরদ্বাজ)

স্তনকে কবিরা যেমন সমগ্রভাবে লক্ষ্য করেছেন, তেমনি লক্ষ্য করেছেন তার আংশিক রূপকেও। স্তনাগ্রের কৃষ্ণচক্র এবং তার মধ্যবর্তী দৃঢ় বৃন্তকে স্মরণ রেখেই তাঁরা উপযুক্ত উপমান অন্বেষণ করেছেন। ফুলবিষয়ক এবং ফলবিষয়ক অজস্র উপমা যখন তাঁরা নির্মাণ করেন---তখন তাঁরা খুব সুবিধা পান। বৃন্তটিকে আলাদাভাবে উল্লেখের আর প্রয়োজন হয় না। কেননা তাঁরা ধরেই নেন যে, পাঠক ফুল বা ফলকে বৃন্তবিচ্ছিন্ন অবস্থায় কল্পনা করবেন না। ফুলের পক্ষে বৃন্তটি যে কত প্রয়োজনীয়, গভীর চোখে কবি তা লক্ষ্য করেন। ঈষৎ রঙিন ফুলটি যেমন গাঢ় রঙের বৃন্তে লগ্ন থাকে তেমনি স্তনফুলটি গাঢ় রঙের বৃন্তের সঙ্গে সংলগ্ন। কোনো এক নেপথ্যশিল্পী বোঁটার মধ্য থেকে প্রাণের স্পর্শে আলোড়িত করতে করতে যেমন পুষ্পকে বিকশিত করেন, তেমনি কবি স্তনের নিদ্রিত বোঁটাকে আঙুলের ডগা এবং ঠোঁটের

---

১. [কালের কবিতা]।

স্পর্শে জাগিয়ে তোলেন--স্তনপুষ্পে সঞ্চারিত করে দেন অসামান্য আনন্দ-ঘনতা—

স্পর্শের নিপুণ দৌত্যে
অনায়াসে
আঙুলের ডগা, ঠোঁট
সেখানে জাগিয়ে তোলে
স্তনের নিদ্রিত বোঁটা---রোমকূপে রোমকূপে তোলে
অসামান্য আনন্দঘনতা[১];

(রফিক আজাদ)

পুষ্পবৃন্তের সঙ্গে তো বটেই, বিবর্ণ পুষ্পের সঙ্গেও অনেক কবি কুচবৃন্তের সাদৃশ্য খুঁজে পান। কুচবৃন্তের রঙ---লাল (মুঠো পিছলোনো স্তনের সূর্যমুখী লঙ্কার মতো বোঁটায় ধাক্কা মারলো কুয়াশা[২]), কালো (কুচাগ্রে শ্যামল মুদ্রা[৩]), খয়েরি, বাদামি, ছাইয়ে, সোনালি (স্তনের সোনালি বোঁটা[৪]), মেরুণ (মেরুণ রঙের তার স্তনের বোঁটায়[৫]), তামাটে (অর্ধনমিত পয়োধরের তামাটে উত্তুংগতায়[৬]), গোলাপি (তার সূচোলো গোলাবী মুখ মান্যবতী দেবীর স্তনের বিন্দুর মতো[৭]) রঙের সদৃশ হ'লেও রঙটি কিন্তু আশ্চর্য রকমের। ফুল পুরোনো হ'য়ে গেলে যেমন রঙ হয়---ফজল শাহাবুদ্দীন মনে করেন, রঙটা সেই ধরনের। তাঁর কবিতার কোনো এক রমণীর গোপন প্রার্থনা, এই রঙটিও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক প্রিয়তমের অশিষ্ট চুম্বনে—

কেন আমার স্তনবৃন্তের প্রাচীন ফুলের মত রঙ
মুছে যায়নি নিশ্চিহ্ন হয়নি প্রিয়তমের অশিষ্ট চুম্বনে [৮]

---

১. 'স্পর্শের পুরাণ'
২. 'দ্বারভাঙা জেলার রমণী' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৩. [পদ্মাবতী] আলাওল
৪. 'মৌল বিষন্নতা' [যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে] শামসুর রাহমান
৫. 'পড়েছে শীতের হাত' [আমার কজন সঙ্গী] শামসুর রাহমান
৬. 'যদি দেখা হতো' —হাবীবুর রহমান [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]
৭. 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের কবিতা পাঠ' [উইলিয়াম মেরিডিথের নির্বাচিত কবিতা] অনুবাদ: সৈয়দ আলী আহসান
৮. 'নিঃসঙ্গ প্রার্থনা'

কুচবৃন্তের যতগুলো রঙের উল্লেখ এখানে করা হ'লো, তার মধ্যে বেশী প্রশংসিত হয়েছে কালো রঙ। চোখের কালো তারাটি যেমন সুন্দর, কালো কাজল যেমন সুন্দর, সুন্দর যেমন কালো তিলটি, কালো ভ্রমরটি—কুচের কালো বৃন্তও তেমন সুন্দর—

স্যামল পোতলি সোভা নয়ান ধবলে।
অধিক সুচারু হ'এ রঞ্জিত কাজলে।।
মসিবিন্দু তিলক কপালে অনুপাম।
সুভিত বদন মাজে দন্তরেখা সাম।।
কুচাগ্রে স্যামল মুদ্রা অতি চারুতর।
নানা ফুলে মধু পীএ স্যামল ভ্রমর।।
(আলাওল)

কবি কখনো ব্যস্ত থাকেন কুচবৃন্তের রঙ নির্বাচনে আবার কখনো মনোযোগী হন বৃন্তের তীক্ষ্ণতার উপযোগী উপমান অন্বেষণে। তীক্ষ্ণমুখ বৃন্তে কবি বিদ্ধ করার প্রবণতা লক্ষ্য করেন—আর তাই কেতকী ফুলের কাঁটাটিকে, অগ্নিপুচ্ছ বাণটিকে বিদ্ধক আলিঙ্গনোপযোগী কুচাগ্রের উপমান মনে করেন—

বেধৈ ভঁউর কণ্ট কেতকী।
চাহহিঁ বেধ কীন্হ কঞ্চুকী।
. . .   .
অগিনি-বান দুই জানৌ সাধে।
জগ বেধহিঁ জউঁ হোহিঁ ন বাঁধে।।[১]
(জায়সী)

পর্বতের সঁুচালো চূড়া পাঠককে স্তনবৃন্ত সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। তবুও কবি সেই চূড়াটির ওপর পুঞ্জিত কৃষ্ণমেঘকে স্থাপন করে স্তনাগ্রের কৃষ্ণচক্র নির্মাণ ক'রে আনন্দ পান (বর্ণে চিক্কন বেণীর মতো তুমি আরূঢ় হ'লে সেই শৃঙ্গে/ দৃশ্য হবে যেন ধরার স্তনতট[২]----কালিদাস/অনুবাদঃ বুদ্ধদেব বসু)।

১. ("স্তনবৃন্তদ্বয় কেতকী ফুলের কাঁটার মতো ভ্রমরকে বিদ্ধ করতে পারে, এবং তারা কাঁচুলীকে বিদ্ধ করতে চায়। ....মনে হয় এ দুটি যেন অগ্নিবান, যদি বক্ষে বাঁধা না থাকত তাহলে জগৎকে বিদ্ধ করত।"--অনুবাদঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

২. [কালিদাসের মেঘদূত]

কখনো বা পর্বতের ওপর ফুটিয়ে তোলেন দুই পদ্ম ফুল--ব্যাপারটি বাস্তবে যতই অস্বাভাবিক হোক না কেন (মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল—বিদ্যাপতি)। গোলাকৃতির কৃষ্ণচক্রটিকে কবিরা কখনো মনে করেন, কুম্ভমুখে নীলপদ্ম সংস্থাপিত হয়েছে (সাতকুম্ভ কুম্ভমুখে নীল অরবিন্দ---কৃষ্ণরাম); কখনো মনে করেন, মঙ্গলকলসে ন্যস্ত আম্রপল্লব ("মঙ্গল-কলসের উপর আম্রপল্লব থাকে। কবি স্তনবৃন্তকে আম্রপল্লবরূপে বর্ণনা করিয়া কল্পনা-পরিধি সম্পূর্ণ করিয়াছেন।"[১])। কখনো কবিদের মনে হয় রত্নপূর্ণ কলসের মুখে কামদেব রেখেছেন তাঁর শ্যামবর্ণের ধনুকটি (কনক কলসে কিবা ভরিয়া রতন/স্যামচাপ সিরে দিয়া রাখীছে মদন।।---আলাওল)। ওটিকে সীলমোহরের ছাপ ব'লে কখনো তাঁদের ধারণা হয়। এই ধারণার কারণ, তাঁরা জানেন যে—রমণীরা পুরুষের মনকে চুরি ক'রে স্তনকলসে পুরে কলসের মুখ সীলমোহর করে রেখে দেয় (জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি/মুহরি রাখল কত বেরি।।---গোবিন্দদাস)। স্তনবৃন্তকে সুমোহন জটায় ও সর্পে বেষ্টিত শিবশির ব'লে কখনো তাঁদের মনে হয় ("নয়নবিন্দু স্তন-চূড়ায় পড়ে জ্বলতে জ্বলতে শিবশিরের চন্দ্রকান্তি হলো।"—বিদ্যাপতি)। কখনো তাঁদের মনে হয় ও দুটি রূপবান রাজার শ্যামছত্র (১. শ্যামছত্র শিরেতে বেকত ছত্রপতি।—আলাওল; ২. নতু ছত্রধারী রাজা বসিছে যুগল।—নওয়াজিস খান খোন্দকার)। আধুনিক এক কবি স্তনবৃন্তকে বিজলি বাতির 'সুইচ' কল্পনা ক'রে একটি নতুন উপমানের জন্ম দিয়েছেন (স্তনবৃন্ত দুটি কোন্ খোলা সুইচ? ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে[২]— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)।

প্রাচ্যের নীল, কৃষ্ণ, শ্যাম স্তনবৃন্তের কথা বলা হলো। এবার পাশ্চাত্ত্যের রক্তিম স্তনবৃন্তের রূপদর্শন করা যাক। বিদেশিনীর বলাকা-স্তনের সঙ্গে লগ্ন রক্তিম বৃন্তের রূপে মুগ্ধ বিদেশী কবি নানা উপমান আহরণ করে "Upon The Nipples of Julia's Breast" নামের একটি আস্ত কবিতাই লেখেন। জুলিয়ার স্তনোপরি চারু চুচুকদ্বয়কে তিনি বলেন—চমৎকার শুভ্রতার ওপর

---

১. বিদ্যাপতির ৭৫৫নং পদ প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি দ্রষ্টব্য। [চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি] শঙ্করীপ্রসাদ বসু

২. 'এই হাত ছুঁয়েছিল' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

যেন একটি রক্তগোলাপ, অথবা শ্বেতলিলির পরাগকেন্দ্রে যেন রক্তলাল চেরী, ধবল নবনীতে অর্ধনিমগ্ন ষ্ট্রবেরী যেন অথবা খাঁটি, মসৃণ শ্বেতোজ্জ্বল মুক্তার ওপর মহার্ঘ রক্তিম রুবিপাথর যেন—

UPON THE NIPPLES OF JULIA'S BREAST

Have ye beheld (with much delight
A red rose peeping through a white?
Or else a cherry (double graced)
Within a lilly? Centre placed?
Or ever marked the pretty lieam
A strawberry shows halfdrowned in cream?
Or seen rich rubies blushing through
A pure smooth pearl, and orient toe?
So like to this, may all the rest,
Is each neat riplet in her breast.

(Robert Herrick)

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের কৃষ্ণ ও রক্তিম স্তনবৃন্ত প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে বড় লোভ হচ্ছে। রাধা যেমন তাঁর স্তনের কৃষ্ণবৃন্তে প্রেমিক কৃষ্ণের রঙ দর্শন ক'রে শান্তিলাভ করতেন (কৃষ্ণঃ পুরঃ স্ফুরতি পার্শ্বযুগেচপশ্চা/চিচত্তস্য বৃত্তিষু দৃর্শোবিষয়েচ শশ্বৎ/শ্রীগন্ডয়োশ্চ কুচয়োস্তরলে যতোহস্যাঃ/শ্রীরাধিকা তদিহ কৃষ্ণময়ী তি সত্যম॥[১]—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ), প্রিয়ের অনুপস্থিতিকালে পাশ্চাত্ত্য সুন্দরীরাও তেমন আপন রক্তিম স্তনবৃন্তে তাঁদের লালবর্ণ হরিদের রঙ দর্শন ক'রে শান্তিলাভ করতে পারেন।

যুগল স্তনের মধ্যবর্তী পথটি সম্পর্কেও কবিরা যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। কেউ মনে করেন, স্তনচন্দ্রের আলোস্নাত মায়াবী সুনীল ছায়াপথ ওটি (যে হাত--যুগল স্তনে খোঁজে চাঁদ-শাদা/স্বপ্নের মদির পথ,...[২]—শামসুর রাহমান)। কেউ মনে করেন, ওটি মদনদেবের ধনু— মদন যেন স্তনশিবের প্রতি শরসন্ধান করছে—(কিবা কুচহর কাম করিতে বিনাশ/আড় ধনু ধরে...-আলাওল)। বলা বাহুল্য রমণীবক্ষস্থিত এই শিবের মদনাহত হবার বড়ই ইচ্ছা। কেউ

---

১. [গোবিন্দলীলামৃত]
২. 'সেই হাত'

মনে করেন, যুগল শৈলের সন্ধিসংযোগ ঐ পথটি, অতএব বিপদসংকুল---কেননা লোমলতারূপ নাগিনী ঐখানেই বাস করে। পথটি বিপদসংকুল তো বটেই, তাছাড়া দুইপাশে দুই খাড়া পাহাড়ের চাপে পথটি সংকীর্ণ ও দুর্গম। অতএব পুরুষের মত্ত হৃদয়হস্তীকে বন্দী রাখার মত এমন সুমোহন বন্দীশালা আর হয় না (সো বরনারী হামারি মন-বারণ বান্ধলি কুচগিরি মাঝ।--গোবিন্দ দাস)। পুরুষের মনবারণটিকে তো বটেই, জলজ্যান্ত পুরুষপ্রবরটিকেও সশরীরে এই সুশোভন বন্দীশালায় বন্দী ক'রে রাখা সম্ভব হয় ("যদি আমি জানিতাম প্রভু এমন নিষ্ঠুর (তাহা হইলে) কুচকাঞ্চনগিরির সন্ধিস্থলে কৌশলে তাহার করতল বাহুলতা (দিয়া) দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখিতাম।"[১]—বিদ্যাপতি)। দেহের অন্য সব অংশকে ছেড়ে নায়কের নয়ন ঐ বিশেষ স্থানটিতেই লুটিয়ে পড়ে। সেই অপরাধে মদনদেব নায়কের মনকে ঐ বন্দীশালায় বেঁধে রেখে দেন (রূপ লাগি মন ধাওল রে কুচকাঞ্চন গিরি সাঁধি/তে অপরাধে মনোভবরে ততহি ধএল জানি বাঁধি — বিদ্যাপতি)। মদনদেব অবশ্য একথা ভালোই জানেন যে, ঐ পথেই সুন্দরের মত সুড়ঙ্গ কেটে হৃদয় ছুটে যাবে হৃদয়ের সন্ধানে।

নাভিকুণ্ড থেকে উত্থিত যে শোভন রোমরাজি যুগল কুচের মধ্যবর্তী অংশ পর্যন্ত রেখাকারে বিন্যস্ত—সেটি নিয়েও কবিকুল কল্পনার চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কেউ মনে করেন, নাভিগহ্বর থেকে কৃষ্ণসর্প বের হ'য়ে মুখপদ্মের দিকে ধাবমান। অতঃপর নারঙ্গযুগলের মাঝখানে এসে হঠাৎ ময়ূর (গ্রীবা) দেখে যেন থমকে গেছে—

সাম ভুঅঁঙ্গিনি রোমাবলী।
নাভী নিকসি কঁব্ল কহঁ চলী।।
আই দুঔ নারঁগ বিচ ভঈ।
দেখি ময়ূর ঠমকি রহি গঈ।।
(জায়সী)

কেউ মনে করেন সাপটি কুচপর্বতে উঠতে চেয়েছিল আহার অন্বেষণের জন্য, কিন্তু গ্রীবাময়ূরকে দেখে অবশেষে শৈলসন্ধিসংযোগে লুকিয়ে থাকলো—

লোমাবলি নাগিনি বৈসএ কুণ্ডান্তরে।
পর্ব্বতে উঠীতে চাহে আহারের থরে।।

---

১ ৪৬৪

গিম নিলকণ্ঠ গিরি শ্রিঙ্গেত দেখীয়া।
সেলসন্দি সঞ্জোগে রহিল লুকাইয়া ।।
(আলাওল)

কুচ যখন শিবরূপে কল্পিত হয়েছে—রোমাবলী তখন শিবের সর্পভূষণ। শিব-বিনাশ-মানসে ঐ সর্পটিকে হরণোদ্যোগী দেখা যায় ধনুর্ধর কামদেবকে—

কিবা কুচহরে কাম করিতে বিনাস।
হরে ধনুধর লোমাবলি নাগপাস ।।
(আলাওল)

রোমাবলীকে জায়সী একস্থানে ভ্রমরপংক্তি মনে করেছেন। কুচচন্দনস্তম্ভের গন্ধোন্মত্ত হ'য়ে এই ভ্রমরপংক্তি যেন নিবিষ্ট—

মনহুঁ চঢ়ী ভঁউ রহ্ন কৈ পাঁতী।
চন্দন-খাঁভ বাস কৈ মাতী ।।

আলাওল একস্থলে লোমাবলীকে পিপীলিকাপংক্তি কল্পনা করেছেন। অধরসুধালোভে পিপীলিকাপংক্তি যাত্রা শুরু করেছিল—কিন্তু পথিমধ্যে মুক্তাহাররূপ গঙ্গা তাদের গমনে বাধা দেয়—

সুরঙ্গ অধরমধ্যে সুধারস অতি।
মধুলোভে উটে কিবা পিপীলিকা পাতি ।।

মুক্তাহার গঙ্গাধার পন্তেত দেখীয়া।
চমকি রহিল মনে ভরমিত হইয়া ।।

বিদ্যাপতি রোমাবলীকে হাতীর শুঁড়রূপে কল্পনা করেছেন—"কুচযুগ কুম্ভ-স্বরূপ (হস্তীর মস্তক) হইল, তাহাতে বাঁকা নখক্ষত যেন অঙ্কুশের মত দেখাইতেছে। রোমাবলী হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, উহা যেন জলপান করিবার জন্য নাভিকূপের দিকে অগ্রসর হইতেছে।"[১]

কোনো কোনো কবির ধারণা, ভারগুরু পয়োধরপাহাড়ের চাপে ক্ষীণ কটিদেশ যাতে ভেঙে না পড়ে, সেজন্য বিধাতা রোমাবলীরূপ সূতা বা লতা দিয়ে কটিপ্রদেশকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছেন—

১. ১৭

(১) "কটি ক্ষীণ, দেহের ভারে উহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে—(দেহ) সাজাইয়া বিধাতার এই অনুতাপ হইল; তাই নীল রেশমের সূতা অতিশয় দৃঢ় জানিয়া উহা দিয়া রোমরাজি সৃষ্টি করিলেন"।[১]

(বিদ্যাপতি)

(২) পিপীলিকা ভৃঙ্গ কটী জিনি অতি খীন।
ভাঙ্গিয়া পরএ জদি উর্দ্ধ গীরি চিন ॥
এ লাগি কটীন বিধি ইন্দ্রে বজ্র দিয়া।
লোমলতা লক্ষে পুনি রাখীল বান্দিয়া ॥

(আলাওল)

রোমাবলীকে কেউ বলেন মদনের অনুরাগরঙিন মসীচিহ্ন, আবার কেউ বলেন শিবের হস্তধৃত মদনের কেশ—

(১) "কোমল সুবর্ণ-নির্মিত মূর্তিরূপ পত্রে মদন মসী অর্থাৎ রোমাবলী লইয়া আপনার কথা লিখিল। অক্ষরপংক্তি পড়িতে পারিনা, দেখিয়া দেহ-কান্তি (অর্থাৎ কান্তিময় দেহ) পুলকিত হয়।[২]

(বিদ্যাপতি)

(২) উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিস্থলে।
ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে।

(ভারতচন্দ্র)

রোমাবলীকে উদ্ভিন্ন কোমল পদ্ম-নালের মতন দেখেন কেউবা—

তুচ্ছং রোমতরংগং উব্বিন্নং কুসুমনলএস্থ ॥[৩]

(আবদুর রহমান)

নাভিকূপে জল নেই—অথচ পাশেই জলের আদরে ঋদ্ধ শৈবালগুচ্ছের মত রোমাবলী দেখে বিস্ময় মানেন কোনো কবি—"নদীর (ত্রিবলী) কূলে যেন গভীর এক কূপ (নাভি), সেখানে জল নাই তবু শৈবাল (রোমাবলী) জন্মিয়াছে।।"[৪] (বিদ্যাপতি)

---

১. ২৪

২. ২৩১

৩. [সন্দেশ-রাসক]

৪. ২৭

জায়সী এবং বিদ্যাপতি—উভয় কবিকে দেখেছি রোমাবলীকে যমুনা কল্পনা করতে। জায়সী মনে করেছেন রোমাবলী যেন বিরহব্যাকুলা যমুনা, সঙ্গমে মিলিত হবার জন্য প্রয়াগের দিকে চলেছে—

কী কালিন্দী বিরহ-সতাঈ।
চলি পয়াগ অরইল বিচ আঈ ॥

বিদ্যাপতি যখন রোমাবলীকে যমুনারূপিনী করেছেন—তখন কল্পনার চমৎকারিত্ব আরও অধিক প্রদর্শন করেছেন—

"মাধব। দেখ পূর্ণিমার চন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছে। তাহার মুক্তাহার গঙ্গাধারার তুল্য, রোমাবলী যমুনার তুল্য, ত্রিবলী ত্রিবেণীর সমান, আর কামদেব পুরোহিত।"—একথা ব'লে সখী কৃষ্ণকে মদনের পূজা করতে অনুরোধ করেছে, যাতে নায়িকার মুখচন্দ্র রাহুমুক্ত হয়। বিদ্যাপতি এখানে প্রথমসমাগমে আগত নায়িকার বিবর্ণ মুখের সঙ্গে চন্দ্রগ্রহণের তুলনা করেছেন—ত্রিবলী-ত্রিবেণীতে সঙ্গমসৃষ্টি করেছেন হারগঙ্গা ও রোমাবলী-যমুনার—তৈরী করেছেন এক অপরূপ পূজার উপযোগী পরিবেশ।

নাভি থেকে বক্ষসন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত রোমরেখা কবিকুলের কাব্যে কিভাবে চিত্ররূপের সৃষ্টি করেছে এবং চিত্রগুলোকে কবিকুল কিভাবে আলঙ্কারিক কবি-কল্পনার সঙ্গে সুকৌশলে যুক্ত করেছেন—আমরা এতক্ষণ তা-ই পর্যবেক্ষণ করলাম।

কুচনির্গত দুগ্ধধারাকেও কবিরা রূপমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন। মানিকরাম গাঙ্গুলি যখন বলেন, 'ক্ষীরভরে স্তন ফাটে'—তখন এমন দুটি দুগ্ধস্ফীত পয়োধরের ছবি দেখতে পাই—দুগ্ধধারা যার বৃন্ত থেকে ঝর্ণার মতো উৎসারিত। রমণী যেন ধরণী। তার পয়োধরপর্বত থেকে নেমে আসছে দুগ্ধনদী জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, সতেজতা ও শ্যামলতা দানের জন্য—'দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।'[১] (মধুসূদন)। স্তন্যদুগ্ধকে তাই কেউ বলেন, 'মৃতসঞ্জীবনী সুধা' (মৃতসঞ্জীবনী সুধা তখনি পড়িবে ঝ'রে। —কায়কোবাদ), কেউ বলেন, 'সুধারস' (১. সুধাসম স্তনপানে জননীর মুখপানে/একদৃষ্টে করিবে ঈক্ষণ।—ঈশ্বরগুপ্ত ২. বালকের ক্ষুধাহরা সুধারসে ভেসে যায়—বিহারীলাল ৩. শতলক্ষ আনন্দের স্তন্যরস সুধা।[২]

১. 'কপোতাক্ষনদ' [চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী]
২. 'বসুন্ধরা' [সোনার তরী]

রবীন্দ্রনাথ), কেউ বলেন, 'অমৃত' (১. জান নাকি অয়ি মুগ্ধে/তোমারি অমৃতদুগ্ধে জীবসঞ্জীবনী বিদ্যা লভেছে অমরগণ।---বিহারীলাল, ২. এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা/মুখেতে রয়েছে লাগি।"[১] রবীন্দ্রনাথ), কেউ বলেন, 'জীবনরসধারা'—যা মায়ের অন্তরে সঞ্চরণ করে এবং উচ্ছলিত হ'য়ে ক্ষরিত হ'য়ে শিশুদের হর্ষাকুল এবং পরিতৃপ্ত ক'রে তোলে—

তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ,[২]
(রবীন্দ্রনাথ)

স্তননিঃসৃত দুগ্ধকে রবীন্দ্রনাথ কখনো 'আদিম আনন্দরস' নামেও অভিহিত করেন--জলে স্থলে মাতৃস্তনে শিশুর মতন/আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।।[৩] তাঁর ধারণা, রমণীর স্নেহবিগলিত চিত্তই যেন শুভ্র দুগ্ধরূপে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—

স্নেহ বিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি ?[৪]

১. 'বসুন্ধরা' [সোনার তরী]
২. 'বসুন্ধরা' [সোনার তরী]
৩. 'মধ্যাহ্ন' [চৈতালি]
৪. 'গান্ধারীর আবেদন'

কুচের সামগ্রিক এবং আংশিক রূপ কবি যেমন পর্যবেক্ষণ করেন, তেমনই পর্যবেক্ষণ করেন কুচের ওপর আরোপিত চিহ্নাদি, রঞ্জক-সৌরভদ্রব্যাদি, বন্ধন-বসন এবং আভরণকে। কুচে আরোপিত নখচ্ছেদ্য, দশনচ্ছেদ্য চিহ্নাদি, অনুলেপিত দ্রব্যাদি, বক্ষবন্ধনী এবং হার সম্পর্কেও কবিকুলের বিলাসলীলা অন্তহীন।

বাৎস্যায়ন[১] যে আটপ্রকার নখবিলেখনের কথা বলেছেন, কবিকুল তার সবগুলোরই নিরীক্ষাচালনায় আগ্রহী। বাৎস্যায়ন-বর্ণিত **নখবিলেখনের প্রকারভেদ** হচ্ছে—

আচ্ছুরিতকমর্দ্ধচন্দ্রা মন্ডলং
রেখা ব্যাঘ্রনখং ময়ূরপদকং।
শশপ্লুতকমুৎপলে পত্রকমিতি
রূপতোহষ্টৌ বিকল্পম্॥

অর্থাৎ এই আটপ্রকার নখচ্ছেদ্য হ'লো—

(১) আঁচড়-আকৃতি
(২) অর্ধচন্দ্রাকার
(৩) মন্ডলাকার
(৪) রেখাকার
(৫) ব্যাঘ্রনখাকৃতি
(৬) শিখী-চরণাকৃতি
(৭) শশক-চরণাকৃতি
(৮) পদ্মপত্রাকৃতি

কুচগাত্রে এই অষ্টপ্রকার নখবিলেখনের পরমানন্দ চর্চা করেন কবি--কখনো বা কুচসজ্জাক্রিয়ার এই সানন্দ দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর প্রিয় নায়কের ওপর।

---

১. [বাৎস্যায়নের কামসূত্র] ডঃ এস. এনঃ পাণ্ডে

তারপর এই উপভুক্ত কুচ কারো চোখে ধরা প'ড়ে যাবার পর নায়িকার যে লজ্জা, ভয় এবং সম্ভোগকথা সংগোপনের জন্য ছলনা—সেগুলো চমৎকার উপভোগ করেন কবিরা। ছলনার শরণ নিতে গিয়ে নায়িকা যে কতরকম মিথ্যে কৈফিয়ৎ সৃষ্টি ক'রে চলে---তার কয়েকটি কৌতুককর দৃষ্টান্ত চয়িত হচ্ছে।

সারা দিনমান কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার ক'রে রাধা যখন তার নেশারক্তিম চোখ, চুম্বনজর্জর ঠোঁট এবং নখরেখাঙ্কিত স্তন নিয়ে বাড়ী ফিরলো, তখন উৎকন্ঠিত সখী জানতে চাইলো--কে গাল দিয়েছে রাধাকে, কেনই বা সে ক্রন্দনোন্মুখ। উত্তরে রাধা জানালো---কেউ গাল দেয়নি, শুকের দংশনেই তার দাড়িম্ব-অধর দষ্ট হয়েছে এবং স্তনকে বেলফল ভেবে পাখী এসে তীক্ষ্ণ নখে আঁচড়ে দিয়েছে তাই রক্তরঞ্জিত দেখাচ্ছে–

উলটল কবরি অম্বর নাহি সম্বরি কহ কেবা গারি বা দেলি।
সখি কোন এতহু দুখ দেল।
বিকচ কমল ফুল লোচন ছলছল অব কাহে মুদিত ভেল।।
তাম্বুল অধর মধুর বিম্বফল কির দংশন কিবা দেল।
কুচ ছিরিফল পর বিহগ কিয়ে বৈঠল তাহে অরুণ রেখ ভেল।।
(বৈষ্ণবকবি)

কখনো কখনো রাধা ময়ূরকে দোষ দিয়েছে। রাধার ঐ মনোহর স্বর্ণহারটাই যত নষ্টের গোড়া। বাতাসে বুকের আঁচল উড়ে যাওয়ায় যেই ঐ লকলকে স্বর্ণহারটা বার হ'য়ে পড়েছে, অমনি কোত্থেকে সর্পভূক ময়ূর এসে সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাধার বুকে— নখ বিঁধিয়ে দিয়েছে কুচে—"(বক্ষের বস্ত্র পবনে বিস্রস্ত হওয়ায়) মনোহর হার ব্যক্ত হইল, তাহা উজ্জ্বল সর্পের মত দেখাইল। সেইজন্য ময়ূর বেগে ঝাঁপ দিল, নখর বিদ্ধ করিল।"[১] —বিদ্যাপতি)। নামহীন সেই ময়ূরটিকে রাধা যতই দোষী সাব্যস্ত করুক না কেন, রসিকা সখীর অবশ্য বুঝতে বাঁকী থাকে না ময়ূরটি কে!

সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার মন্দিরে প্রতিদিন চলে সুন্দরের গোপন বিহার। অবশেষে একদিন দেখা দেয় অনিবার্য গর্ভবিকাশ। দুষ্টা এক সখী বিদ্যার মাতাকে এই সর্বনাশা সংবাদ দিলে, মাতা বিদ্যার কুচ পরীক্ষা করতে গিয়ে

১. ৩৫০

নখরেখা দেখতে পান। জিজ্ঞাসিত বিদ্যা তখন মিথ্যে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে। প্রতিদিন শোবার সময় নাকি তার আদুরে বিড়াল বক্ষদেশ আঁচড়ে খামচে একাকার করে—সদাই শয়নকালে মার্জারী আসিয়া কোলে

আঁচড়িল পয়োধর যুগে।। (কৃষ্ণরাম দাস)

অন্যত্র বিদ্যা অন্যপ্রকার কৈফিয়ৎ দেয়। বলে—কুচে চন্দন লেপনকালে অকস্মাৎ কিভাবে নখের আঁচড় লেগেছে—

গায়ে কণ্ডু দেখ কুচে নখ রেখ
বিষম কণ্ডুর জালে।
যে বা পাণ্ডু গণ্ড দেখিলে প্রচণ্ড
লেপিত চন্দন কালে।।

(বলরাম কবিশেখর)

কখনো কখনো দেখা যায়, নখলেখনী সম্পর্কে নায়িকা ছদ্ম-কৈফিয়ৎ রচনা করেনা বরং পরমোল্লাসে সখীসমক্ষে নিজ দেহে বাঞ্ছিত নায়কের উপভোগ বর্ণনা করে। অনুরাগবিবশা নায়িকা কম্প্রমধুর কণ্ঠে বক্ষাঙ্গের নখবিলেখনকে 'নব শশিতুল্য অনুরাগের অঙ্কুর'[১] নামে অভিহিত করে। কখনো কখনো আবার বিপরীত চিত্রও দেখা যায়—যখন সখীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে নায়িকা ক্রন্দনোন্মুখ কণ্ঠে জানায় নবপদ্মে ভ্রমরের ঝম্পবিলাসের কথা—

বদনে দশন দিয়া দগধে পরাণ।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান।
না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
নব কুচে নখ দেখি জিউ মোর কাঁপে।
জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে।

(বৈষ্ণব কবি)

পরস্ত্রীর দেহের অনাবৃত অংশে নখবিলেখন দিতে হয়না—বসনাবৃত অঙ্গে দেয়া যেতে পারে, যেমন—উরু। শ্রীকৃষ্ণ সে নিয়ম না মেনে দেহের অর্ধোন্মুক্ত অংশ কুচে নখচ্ছেদ্য অঙ্কনের প্রচেষ্টা করলে, ভীতিশিহরিতা

১. ৭৭ (বিদ্যাপতি)

রাধা বারণ করে। স্বামী আইহন যদি এই নখবিলাস দেখতে পায়, তাহলে আর নিস্তার নেই—

আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআ বুলিব দন্তাঘাতে।।
নখাঘাত না দিহ মোর পয়োভারে।
আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিঁক নিস্তারে।।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

উপরে যে কয়টি দৃষ্টান্ত চয়িত হলো, তাতে আচ্ছুরিতক, ময়ূরপদক, ব্যাঘ্রনখ এবং অর্ধচন্দ্রজাতীয় নখচ্ছেদ্যের সন্ধান পাওয়া গেলো। নখপ্রচাপনের মাত্রা অনুযায়ী নখবিলেখনের যে বিভাগ ১) মৃদু ২) মধ্য এবং ৩) অতি-মাত্রা—তার সব ক'টিই বর্ণিত উদ্ধৃতিগুলোতে সহজলভ্য। নখবিলেখনের যে প্রধান দুই ভাগ ১) রূপবৎ (যে নখলেখনীর সাহায্যে নানাধরনের চিত্র বা চিহ্ন আঁকা হয়) এবং ২) অরূপবৎ (নির্দিষ্ট কোনো আকার দেবার প্রচেষ্টা না ক'রে যথেচ্ছ আঁচড়ানো)—চয়িত উদ্ধৃতিতে সেগুলোও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দেহমেদিনীতে মনের খুশীতে প্রেমের এই খননচিহ্নগুলো অঙ্কন ক'রে কবি তার রূপ দেখেন। এই খননচিহ্নগুলো তাঁর চোখে প্রতিভাত হয় সৌন্দর্যচিহ্নরূপে। মৃদুমাত্রার নখবিলেখনে এই প্রিয় অঙ্গে কবি স্বাক্ষর করেন আপন নাম—

বুকের ওপর মৃদু কম্পমান নখবিলেখনে
লিখতে কি দেবে নাম? অনুজ্জ্বল উপাধিবিহীন?[১]
(আল মাহমুদ)

মধ্যমাত্রার নখবিলেখনে সৃজিত অর্ধচন্দ্রচিহ্ন দেখে কবি আনন্দবিভোর হ'য়ে পড়েন শিবশিরে চন্দ্রকলা দৃষ্ট হয়েছে ব'লে--

কুচ শম্ভু শিরে নখ চন্দ্রকলা।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা।
(ভারতচন্দ্র)

১. 'সোনালি কাবিন' [সোনালি কাবিন]

কবি যখন বিল্বফলের গায়ে পাপড়িআবদ্ধ কিংশুকের কলিটিকে আঁকেন, তখন তাঁর নখপ্রচাপন মধ্যমাত্রারই—"সে কাঁচা শ্রীফলে নখমূর্তি দিল, যেন কিংশুক ফুলের কুঁড়ি হইল।"[১] (বিদ্যাপতি) ; কিন্তু যখন পূর্ণবিকশিত প্রগাঢ় কিংশুকটি আঁকেন, তখন সেই নখপ্রচাপন অবশ্যই অতিমাত্রার। সজোর নখপীড়নে গৌর কুচগাত্রে যখন ছোপ ছোপ রক্ত পাপড়ি-আকৃতি লাভ করে, তখনই কবি পূর্ণস্ফুট বর্ণোজ্জ্বল কিংশুক ফুল দর্শন করছেন ভেবে বিমোহিত হন। মুগ্ধ কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সেই নখচিহ্নকে বলেন, 'সুন্দর'। কবির আবেশপূর্ণ নয়ন দেখতে থাকে সোনার শিবকে কেউ যেন রক্তকিংশুকে পূজা করেছে--"তোমার পীন পয়োধরে সুন্দর নখচিহ্ন, সোনার শিবকে কেহ কিংশুকফুলে পূজা করিয়াছে।" (বিদ্যাপতি)। নায়ক কষ্টপ্রদানের অভিপ্রায়ে নায়িকাবক্ষে স্বেচ্ছাচারী নখচালনা করেন--কবি একথা বিশ্বাস করেন না। আসলে ও সত্য কথা হলো, কামনার তাগিদেই দেহ রক্তাক্ত হয়। কবি পীড়ণকে শোধন ক'রে নিচ্ছেন পূজার কল্পনায়—"নখের রক্তরাগ দ্বারা পয়োধর পূজা হইয়াছে।"[২] (বিদ্যাপতি)। তবু একেক সময় কবি কামনার প্রচণ্ডতাকালে কামনার বিদারণরূপ লক্ষ্য ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে পড়েন। নখক্ষতেয় ক্ষুধারূপ দেখে বিস্মিত কবি তখন বলেন--"(কুচদ্বয়) শ্রীফলের ন্যায় ছিল, (এখন) আবরণশূন্য নারঙ্গ ফলের ন্যায় করিয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন...দুই হস্তে ছিল ক্ষুধিত নখর।"[৩] ভয়কম্পিতা নায়িকাও তখন নিজবক্ষে নখাস্ত্রঘাতের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা এভাবে বলেছে--"সুন্দর কুচযুগল নখের ক্ষতে ভরিয়া গেল--সিংহ যেন গজকুম্ভ বিদীর্ণ করিল।"[৪] (বিদ্যাপতি)। কামনার তীব্র অবস্থায় এসব অরূপবৎ নখাঘাতের প্রয়োজন অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। রূপবৎ নখবিলেখনকালে কবিকুল পাখি, চাঁদ, ফুল, ফুলকলি, কলমীলতা ইত্যাদি বহু ক্ষতচিহ্ন অঙ্কন ক'রে থাকেন, সযত্নে স্বাক্ষর ক'রে থাকেন আপন নাম।

নখচ্ছেদ্য যে একটি শিল্প--সে সম্পর্কে কবিকুল পূর্ণমাত্রায় সচেতন। তাঁরা বেশ জানেন, ধনুর্বিদ্যা, তলোয়ারবিদ্যা শেখার মত এই নখবিলেখনের

---

১. ৭৭

২. ১৩১

৩. ২৯১

৪. ৪১১

নানা পদ্ধতি ও প্রকারভেদ শিখতে হয়। নখপরিচর্য্যায় তাই তাঁদের পূর্ণ মনোযোগ। তাঁরা জানেন, করাতের মত খাঁজবিশিষ্ট দীর্ঘ নখ হয় প্রবল রতিশক্তিসম্পন্ন পুরুষের। সিংহের মত প্রবল বিক্রমে গজমস্তক বিদীর্ণ করা[১], সোনার বাটি ভেঙে চুরমার করা[২], কাঁচা বদরীকে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত করা[৩], শ্রীফলাকৃতি কুচযুগের চর্ম ছিন্ন ক'রে নবরঙ্গের ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি করা[৪]—এ ধরনের নখগুচ্ছের স্বাভাবিক প্রবনতা। কবি জানেন, ধান, যব, গম ইত্যাদি শস্যের ন্যায় সরু আগাবিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত কম ধারযুক্ত নখ হয় মাঝারি রতিশক্তিসম্পন্ন পুরুষের। কুচগাত্রে কুঁড়ি, ফুল, পাখি, লতা, প্রবাল ইত্যাদি চিত্রাঙ্কন[৫] এবং স্বনাম স্বাক্ষরেচ্ছা[৬] এ ধরনের নখের স্বাভাবিক প্রবণতা। কবি এও জানেন যে, সমানপৃষ্ঠ, উজ্জ্বল, কোমল, ভোঁতা, অর্ধচন্দ্রাকৃতি নখ হয় ক্ষীণ রতিশক্তিসম্পন্ন পুরুষের। অর্ধচন্দ্রজাতীয় নখচিহ্নাঙ্কন এ ধরনের নখের স্বাভাবিক প্রবণতা। অর্ধচন্দ্রাকৃতি নখই কুচপদ্মশিরে দ্বিতীয়ার চাঁদকে সংস্থাপিত করে[৭], শম্ভুশিরে চন্দ্রকলা আরোপ করে[৮], পর্বতশিখরে ঘটায় চন্দ্রোদয়।[৯]

নখলেখনীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কবিকুল অত্যন্ত সচেতন। রতিলীলাকালে নখবিলেখন নায়িকার হৃদয়ে আনয়ন করে পূর্ণরাগ। রতিলীলার একঘেঁয়েমি দূরীকরণের জন্য নখবিলেখনের ভূমিকা অপরিসীম। কামকেলির

---

১. "সুন্দর কুচযুগল নখের ক্ষতে ভরিয়া গেল---সিংহ যেন গজকুম্ভ বিদীর্ণ করিল।"
৪১১ (বিদ্যাপতি)

২. ৬৯০ (বিদ্যাপতি)। এই পদে ধৃষ্ট চোরনাগর কিভাবে সোনার বাটিকে নখের আঘাতে ভেঙেছিল, তার চাতুর্যপূর্ণ বর্ণনা আছে।

৩. কুচ কোরী ফর নখ ক্ষত রেহ (বিদ্যাপতি)

৪. "(কুচদ্বয়) শ্রীফলের ন্যায় ছিল (এখন) আবরণশূন্য নারঙ্গ ফলের ন্যায় করিয়াছে"।
---২৯১ (বিদ্যাপতি)

৫. আমারি আঁকা পত্রলেখা আমারি মালা বুকে। 'সাগরিকা' [মহুয়া] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. বুকের ওপর মৃদু কম্পমান নখবিলেখনে লিখতে কি দেবে নাম। ..
'সোনালি কাবিন' [সোনালি কাবিন] আল মাহমুদ

৭. "দুইটি পদ্মের উপর যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ" ২৬ (বিদ্যাপতি)

৮. কুচ শম্ভুশিরে নখ চন্দ্রকলা (ভারতচন্দ্র)

৯. "পীন পয়োধরে মনোহর নখরেখা হাত দিয়া ঢাকিতেছ কেন;
মেরুশিখরে নব শশধর উদিত হইলে চুরি গোপন থাকেনা।" (বিদ্যাপতি)

এই স্মারণীয়কগুলো নায়িকাকে মনে করিয়ে দেয় গতযামিনীর সুখদ স্মৃতি। নখমূর্তি দেখে সখীরা হয় কৌতূহলী---নায়ক নায়িকার হৃদয়ে পুনর্বার জাগে উপভোগবাসনা—প্রগাঢ় হয় উভয়ের প্রেম। নায়িকাবক্ষে নখচিহ্নদর্শনে সখীরা কৌতূহলী হ'য়েছে--অনুরাগথরথর কণ্ঠে নখের সৌন্দর্যস্বাক্ষরের প্রশংসা ক'রে নায়িকা তাদের কৌতূহল তৃপ্ত করেছে এবং বলেছে ক্রমবর্ধমান প্রেমের কথা—বিদ্যাপতির পদরাজি থেকে তেমন একটা উদাহরণ দেয়া যাক। এই পদে রাধা অলঙ্কারে অলঙ্কারে স্ব-দেহে কৃষ্ণদানকে অর্চনা করেছেন। নখের চন্দ্রচিহ্নকে তিনি বিহ্বল ভালোলাগায় ঘোষণা করেছেন 'অনুরাগের অঙ্কুর' ব'লে। শৃঙ্গারপ্রয়াসকালে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ নখচিত্রের সাহায্যে শ্রীরাধিকাকে কেমন করে দ্রব করেছেন, উপলব্ধি করা যায়। তিনি যখন কুচগাত্রে অজস্র নখচন্দ্রকলা রেখাঙ্কিত করছেন--রাধার তখন মনে হচ্ছে হৃদয়তলে নবানুরাগের অজস্র অঙ্কুর উদ্গীত হচ্ছে, যাদের আকৃতি নবশশীকলার মত-"নব শশিতুল্য অনুরাগের অঙ্কুর...নূতন প্রেম সংসারের সার, যাহা বর্ধিত হইতেছে তাহা কেমন করিয়া গোপন করিবে?"[১] নখচিহ্নের আরও উদ্দেশ্য আছে, কবি তা জানেন। প্রবাসে গেলে নায়িকা যাতে নায়ককে বিস্মৃত না হয়---পরন্তু এই চিহ্নদর্শনে যেন তার মনে জেগে ওঠে অতীতের রতিপুলকস্মৃতি—নখচিত্রের এও এক উদ্দেশ্য। প্রায়-শুকিয়ে-যাওয়া নখক্ষতও প্রায়-নিশ্চিহ্ন প্রেমকে পুনর্জীবিত করতে পারে। অন্যের উপভুক্তা কোনো রমণীর বক্ষোদেশে নখমূর্তি দর্শনেও কোনো যুবক তাকে ভোগের জন্য হ'তে পারে ব্যাকুল।

দশনচ্ছেদ্যের প্রকারভেদ (বাৎস্যায়নের মতে)—

(১) **গূঢ়ক**--একটি মাত্র উত্তম দাঁতের মৃদুচাপে সৃষ্ট অল্প লাল দাগ।
(২) **উচ্ছূনক**--দাঁতের বেশী প্রচাপনে সৃষ্ট স্পষ্ট লাল ফোলা দাগ।
(৩) **প্রবালমনি**—খানিকটা চামড়া দাঁত ও ঠোঁটের ভেতর পুরে চাপ দিয়ে সৃষ্ট প্রবালমনির মত লাল দাগ।
(৪) **মানিকমালা**-দংশনে সৃষ্ট মালার মত লাল দাগ।
(৫) **বিন্দুসিদ্ধি প্রক্রিয়া**--উপরের ঠোঁট ও নিচের পাটির সামনের দিকের একটি দাঁতের সাহায্যে ত্বকের সামান্য অংশমাত্র গ্রহণ ক'রে অল্প প্রচাপনে সৃষ্ট বিন্দু চিহ্ন।

১. ৭৭

(৬) **বিন্দুমালা**--সব দাঁত দিয়ে সৃষ্ট মালার মত বিন্দুচিহ্ন।

(৭) **খণ্ডাভ্রক**

(৮) **বরাহচর্বিতক**---দুই পাটি দাঁতে কুচমাংস উপর্যুপরি বেশ কিছুক্ষণ চর্বনে সৃষ্ট দীর্ঘ অভগ্ন চারটি বা ছয়টি রেখা---দন্তাঘাতে যেগুলোর মধ্যস্থান রক্তলাল। এই চর্বনপ্রক্রিয়া বরাহের চর্বনের ন্যায়।

কুচগাত্রে নখচ্ছেদ্যের মত উক্ত সকল প্রকার দশনচ্ছেদ্যেরও সানন্দ চর্চা করেছেন কবিকুল।

সুন্দরীরা কুচে যেসব প্রলেপন ব্যবহার করতেন, সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কবিরা আলোকপাত করেছেন। প্রলেপনের উপাদানগুলো হচ্ছে---চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী, বেনামূল ও উশীর।

কুচে চন্দনচর্চার কারনগুলো প্রথমে বিশ্লেষণ করি। রাধিকা যখন জ্যোৎস্নারজনীতে নগ্নবক্ষা হ'য়ে অভিসারযাত্রার অভিলাষ করতেন, তখন কুচে চন্দনচর্চা অত্যাবশ্যক হ'য়ে পড়তো, কেননা গৌর কুচগাত্র জ্যোৎস্নায় মিশে থাকলেও কৃষ্ণবৃন্ত দুটি কেউ দেখে ফেলার আশংকা ছিল। এই প্রলেপনে অনিন্দিত ত্বকের স্বাভাবিক লাবণ্য আবৃত হ'য়ে যাচ্ছে দেখে বিদ্যাপতি অবশ্য এমনটি করতে বারণ ক'রেছিলেন---কিন্তু রাধা বারণ শোনেননি। শ্বেতকুন্দে কুন্তলবিন্যাস ক'রে, শ্বেতমুক্তামালিকা কণ্ঠে ধারণ ক'রে, শ্বেতচন্দনে বক্ষপ্রসাধন ক'রে শ্বেতবসনা রাধা পারদে ডুবন্ত পুতুলের মত চাঁদনীরাতে অভিসারযাত্রা করেছেন জ্যোৎস্নার রঙের সঙ্গে মিশে—দুর্মুখদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে—

হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার।
চন্দন চরচিত রুচির কপুর।
চান্দনি রজনী উজোরলি গোরী।
হরি-অভিসার রভস-রসে ভোরি
(গোবিন্দদাস)।।

রাধা আপন কুচদ্বয়কে শিব ব'লে বিশ্বাস করতেন। তাই কুচে চন্দনপ্রলেপ দিয়ে শিবপূজাও হ'তো, বিভূতিভূষিত শিবদর্শনও হ'তো—

চন্দনে চরচু পয়োধর গৃম
গজমুকতা হার।
ভসমে ভরল জনি সঙ্কর
সির সুরসরি জলধার।।
(বিদ্যাপতি)

চন্দনের আরও কতগুলো উপকারিতা রয়েছে। প্রিয়তমের নখবিলেখনে রক্তাক্ত কুচে চন্দনপ্রলেপ খুবই প্রয়োজনীয়। চন্দনের শীতল, কোমল প্রলেপন নখাঘাতের জ্বালা যন্ত্রণা মুহূর্তেই দূরীভূত করে, রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। নখরেখা নিশ্চিহ্নকরণেও চন্দন সাহায্য করে---

যোষায় তুষিল বীর সুগন্ধি চন্দনে।
অধিক করিয়া দিল উচচ দুটি কুচে।
নখাঘাতে জ্বালা যত সেইক্ষণে ঘুচে।।
(কৃষ্ণরাম দাস)

বিরহপর্যায়ে নায়িকার যখন দশমীদশা হয়, তখন চন্দন ও কস্তরীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরহের দুঃসহ দহনে যখন নায়িকার দেহ দগ্ধীভূত, তখন চন্দন ও কস্তরীপ্রলেপনই হয় সুন্দর শান্তি। বিরহখিন্ন অথচ কামজর্জর কুচদ্বয়ের বিরহদহন এবং মদনাবেগ দমনে চন্দন অত্যাশ্চর্য মহৌষধের ন্যায় ফলদায়ক। বেনামূল ও উশীরের প্রলেপন এবং স-নাল পদ্মপত্রের আবরণও কুচের বিরহদাহ ও মদনতাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

উদাহরণ:

"শিষ্য-(চারদিক ঘুরে এবং তাকিয়ে শূন্যের উদ্দেশে) প্রিয়ংবদা, কার জন্যে এই বেনা-মূলের প্রলেপ আর নালসুদ্ধ পদ্মপাতা নিয়ে যাচ্ছ?

... ...

রাজা—স্তন দুটিতে উশীরের অনুলেপন, মৃণালের একটিই বলয়, তা-ও শিথিল। এত সন্তাপেও প্রিয়ার তাপিত দেহ কত সুন্দর দেখাচ্ছে। কাম ও গ্রীষ্ম এ দুটির তাপের আধিক্য যদিও সমান ব'লে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু যুবতীদের উপর গ্রীষ্মের প্রকোপ এমন মধুর হ'য়ে দেখা দেয় না।

... ...

রাজা—(শকুন্তলাকে ধরে) সুন্দরি।...যে পুষ্পশয্যায় পদ্মপাতা তোমার

স্তনের আবরণ হয়েছে, তা ত্যাগ ক'রে বেদনাকাতর এই কোমল অঙ্গ নিয়ে রোদে যাবে কেমন ক'রে?"[১] (কালিদাস/অনুবাদঃ জ্যোতিভূষণ চাকী)

বিরহকালে পদ্মপাপড়ির শয্যায় শয়ন করলে কুচ পদ্মদললগ্ন থাকে ব'লে দেহতাপ অনেকটা নিবারণ হয়। পেলব পুষ্পমালা গলায় ধারণ করলেও তার শীতলস্পর্শে কুচদ্বয়ে মদনাবেগ আংশিক অবদমিত থাকে ব'লে বিরহিনীগণ মনে করেন। অপভ্রংশ ভাষায় রচিত আব্দুর রহমানের 'সন্দেশ-রাসক' নামক দূতকাব্যে অবশ্য একজন ঘন তুঙ্গ স্তনের অধিকারিণী প্রোষিতভর্তৃকার সন্ধান পাওয়া গেছে, যিনি বিরহদাহ নিবারণে ফুলমালা, কমলদল, কস্তুরী ও চন্দনের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ব'লে ঘোষণা করেছেন—"শৈত্যলাভের জন্য উদরে হরিচন্দনের যে প্রলেপ দিয়েছিলাম, সর্প দ্বারা সেবিত হওয়ার দরুন তা স্তন দুটিকে অধিক পরিতপ্ত করছে।...হারলতা এবং ফুলের মালা...জ্বালা সৃষ্টি করল...। রাত্রে শারীরিক সুখের জন্য শয্যায় কমলদল বিছিয়ে দিলে তা দ্বিগুণ উদ্বেগ উৎপন্ন করল। সূর্যের কিরণে বিকশিত হওয়ার দরুন পদ্ম সূর্য-তপ্ত। বিষের সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল ব'লে অমৃতময় চন্দ্রও দাহ সৃষ্টি করছে। দুঃসহ ভুজঙ্গ দ্বারা দষ্ট চন্দন অঙ্গে তাপ সৃষ্টি করছে। অঙ্গার থেকে উৎপন্ন হার ফুলের বাণ দ্বারা সৃষ্ট মালা ক্ষতস্থানে জ্বলছে। ঘনসার এবং চন্দনে দেহ চর্চিত করা বৃথা। প্রিয় দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বিরহের অগ্নি প্রিয়ই আবার নিভাতে পারে," (অনুবাদ : মমতাজুর রহমান তরফদার)। বিরহের এক পর্যায়ে বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকেও বলতে শুনেছি—কে বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।
আহ্মার মনত ভাএ যেহেন গরল।।

মদনাবেগ এবং বিরহতাপের আধিক্য বিমোচনে বিলেপনদ্রব্যাদির ভূমিকা সম্পর্কে সুন্দরীরা কেউ কেউ অনাস্থা প্রকাশ করলেও বিলেপন-ব্যবহার কিন্তু তাঁরা কখনোই বর্জন করেন না।

পয়োধরে চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম অনুলেপনের আরো তাৎপর্য আছে। প্রিয়তমের বক্ষকে প্রসাধিত করার সলোভ আকাঙ্ক্ষাও এসব অনুলেপনের পেছনে কাজ ক'রে থাকে। সম্ভোগসময়ে কুচের চন্দনচিহ্ন, কুঙ্কুমস্পর্শ ও কস্তুরীসৌরভ প্রিয় পুরুষের বক্ষ রঞ্জিত ও সুরভিত ক'রে দেয়। এই

১, [সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (অভিজ্ঞান শকুন্তলম্)] নির্বাহী সম্পাদক—প্রসূন বসু

রঞ্জিত ও সুবাসিত বক্ষদর্শনে পুরুষের অন্তরে গতমিলনের সুখকথা উদিত হয় এবং সেই উপভুক্তাকে পুনর্বার পাওয়ার দুর্মর বাসনা জাগে। পুরুষের বক্ষে এইসকল উপভোগচিহ্ন অন্য রমণীকে ঈর্ষাকাতর এবং কামাকুল ক'রে তুলতে পারে। কৃষ্ণবক্ষের চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী ইত্যাদি রতিচিহ্ন বৈষ্ণব পদাবলীর অজস্র অবিস্মরণীয় অনন্যসুন্দর মানবিষয়ক পদের জন্ম দিয়েছে।

রসিক কবিরা বলেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল তখনই রমণীয়, যখন শ্রীরাধার চরণযাবক তাঁর কপোলদেশে ঈষৎ বিলম্বিত কেশদামকে অপরূপরূপে রঞ্জিত করে, তাঁর বক্ষস্থল তখনই মনোহর, যখন গোপাঙ্গনাদের কুচকুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হয়। এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে নীচের শ্লোকগুলোতে---

পদ্মা পয়োধরতটি পরিরম্ভলগ্ন কাশ্মীর মুদ্রিত মুরোমধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদস্বেদাম্বুপূরমনুপূরযতুপ্রিয়ংবঃ ।।[১]

("গাঢ় আলিঙ্গনকালে শ্রীরাধার স্তনপ্রান্তে লগ্ন কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত, অনঙ্গ-খেদজনিত ঘর্মজলপ্রবাহে ক্রীড়মান অনুরাগরূপে প্রকটিত মধুসূদনের বক্ষঃ-স্থল তোমাদের নিরন্তর প্রিয় বাসনা পূর্ণ করুন।")

পল্লবারুণ পাণিপঙ্কজ সঙ্গী বেনুরবাকুলম্।
ফুল্লপাটল পাটলী পরিবাদি পাদসরোরুহম্ ।।
উল্লসন্মমধুরাধরদ্যুতি-মঞ্জরী সরসাননম্।
বল্লবীকুচ কুঙ্কুম-পঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে ।।[২]
(শ্রীবিল্বমঙ্গলঠাকুর)

("যাঁর পল্লবের ন্যায় অরুণবর্ণ পাণিপঙ্কজে বেণু বিরাজিত, যাঁর বেণুরবে সকলে আকুল হয়, যাঁর পাদপদ্ম প্রফুল্ল পাটলী পুষ্পকে নিন্দা করে, ব্রজাঙ্গনাদের চুম্বনে যাঁর অধর উল্লসিত এবং সেই মাধুর্যময় অধরের কান্তি শ্রেণীর দ্বারা যাঁর মুখপদ্ম সরস, এবং যার শ্রীঅঙ্গ বল্লবীগণের আলিঙ্গনে কুচকুঙ্কুমদ্বারা চর্চিত--সেই ভগবানই বৈষ্ণবদের আশ্রয়।")

১. [শ্রীগীতগোবিন্দ, ১সর্গ ২৬]
২. [শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে, ৯নং শ্লোক]

শ্রীরাধা যে সবসময় নিজেই কুচদ্বয়ে কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন লেপন করেন, তা নয়। অনুলেপনের কাজ শ্রীকৃষ্ণও বহুসময় ক'রে থাকেন। এটি শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রিয় কাজ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মধুর লীলাস্থলী পরমশ্লাঘ্য বৃন্দাবনকে কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন দিয়ে অঙ্কন করেন রাধাবক্ষে। নানা চিত্র বিচিত্র লতাপাতা ফুল কুঁড়ি গুল্ম তরু কুটির অঙ্কন করেন তিনি পরমানন্দে। অতঃপর বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশোভিত বৃন্দাবনের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালি শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে সর্বদা বিরাজ করেন—

বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালি বালা
স্তনান্তরং যাম বনান্তরম্বা।
অপাস্য বৃন্দাবন পাদলাস্য
মুপাস্য-মন্যং ন বিলোকয়ামঃ॥[১]
(বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)

দেখা যাচ্ছে, অনুলেপনদ্রব্যাদি দ্বারা কুচকে শুধু এলোমেলোভাবেই রঞ্জিত করা হ'তোনা—সে রঞ্জনকর্ম ছিলো শিল্পিত, নয়ননন্দিত। চন্দনাঙ্কিত নয়ন-নন্দন পত্রলেখা এবং কুঙ্কুমগন্ধের বিমুগ্ধ অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে।
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।[২]

সুচর্চিত কুচে কুঙ্কুম, কস্তুরী লেপনের প্রয়োজনীয়তা তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাঠক-মাত্রই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। শরীরের বিশেষ ঘ্রাণের সঙ্গে আরোপিত এইসব উত্তেজক ঘ্রাণ মিশ্রিত হ'য়ে যে মাদকতার জন্ম দেয়, তা প্রণয়ীকে গন্ধোন্মত্ত কামাকুল ক'রে তুলতে সহায়ক হয়। প্রিয়তমের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে সুখদানও এই লেপনকর্মের আর একটি উদ্দেশ্য। লেপিত কস্তুরীর তীব্র সৌগন্ধ্য নায়িকার অন্তরকেও আবেগোন্মত্ত এবং রমনব্যাকুল ক'রে তোলে।

---

১. [শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত]
২. [কল্পনা]

অভিসারকালে কুচের যেসব প্রসাধন অপরিহার্য, তার মধ্যে কস্তুরী অন্যতম। গন্ধঅধীর অভিসারিকা কস্তুরীহরিণের মতই কাঁটালতা মাড়িয়ে ছুটে চলে---

'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগসম।'[১]
(রবীন্দ্রনাথ)

লতা, পাতা, শিকড় ইত্যাদির রসে তৈরী ঔষধও অনেক রমণী পয়োধরে লেপন করে। এইসব ঔষধের প্রভাবে অপরিচিত পুরুষের অন্তরে মোহ-জাল বিস্তার করা হয়। কোনো বিশেষ পুরুষকে বশ করার জন্য কোনো কোনো রমণী এই ঔষধ ব্যবহার করে। সাধারণতঃ গনিকারা এই ঔষধ বেশী ব্যবহার করে অনেক নাগর আকর্ষণের প্রয়োজনে---

বিদগধ বিদেশী পুরুষ যদি পায়,
বুকের কাঁচলি খুলে মোহনি লাগায়॥
(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

সময়বিশেষে কুচে কজ্জ্বললেপনও জরুরী হ'য়ে পড়ে। ধরা যাক, অভিসারের স্থান, কাল ইত্যাদি ঠিক ক'রে নায়ক দূতীকে পাঠিয়েছে নায়িকাকে খবর দেবার জন্য। দূতী গিয়ে দেখলো, নায়িকা সখী-পরিবৃত। তখন সংকেতে দূতী সন্দেশ পরিবেশন করে। আঁচলে বুকের মনিহার ঢেঁকে বোঝায়, অভিসারের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে যমুনা-তীরে এবং চোখের কাজল আপন পয়োধরে এঁকে বোঝায়, চাঁদ ডুবে গেলেই হবে অভিসারের লগ্ন---

সখীগণ মাঝে শ্রীমতিরে হেরি
দূতী কহে ইশারায়
উতলা হয়োনা ওগো প্রিয়তমে,
বিচ্ছেদ-বেদনায়।
গোপন-মিলন-সংকেত কহে
বিভ্রম করি সবে,

১. ৭ সংখ্যক কবিতা [উৎসর্গ]

চাঁদ ডুবে গেলে যমুনার কূলে
মিলন দোঁহার হবে।
সলাজ নয়নে, অঞ্চলে ঢাকি
বক্ষের মনিহার,
চোখের কাজল পয়োধরে আঁকি
দিল সংকেত তার।[১]
(কালিদাস / অনুবাদ : শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়)

এতক্ষণ আলোচনা করেছি কুচে আরোপিত নখচ্ছেদ্য, দশনচ্ছেদ্য চিহ্নাদি এবং অনুলেপনদ্রব্যাদি সম্পর্কে। এবার আলোচনায় আনা যাক বক্ষবন্ধনীকে। বক্ষবন্ধনী সম্পর্কেও কবিদের কৌতূহল সদাজাগ্রত। কত নাম এই বক্ষবন্ধনীর—কঁচুয়া[২], কাঁচুঅ[৩], কঞ্চুলিকা[৪], কাঞ্চুলী[৫], কাঞ্চলী[৬], কঞ্চুকী[৭], কঞ্চুক[৮], কাঁচুলি[৯], কাঁচল[১০], কাঁচলা[১১], কাঁচল[১২], নিচোল[১৩] ব্রেসিয়ার,[১৪] ব্রা[১৫]।

---

১. [পুষ্পবাণবিলাসম্]
২, কঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া। (বিদ্যাপতি)
৩. চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ কাটলি। (অমরুশতক/অনুঃ বিদ্যাপতি)
৪. কৃষ্ণকলির হেমাঞ্জলির চঞ্চলতা/কঞ্চুলিকার স্বর্ণলিখায় মিলায় কথা / 'অর্ঘ্য' [মহুয়া] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. কাঞ্চুলী ফাড়িল কার কুচে নক্ষরেখা। (দোনা গাজী)
৬. জড়াজড়ি ঘেঁসাঘেঁসি ছিড়িল কাঞ্চলী। (মালে মুহম্মদ)
৭. চাহহিঁ বেধ কীহ্ন কঞ্চুকী।। (জায়সী)
৮. কঞ্চুকে যব কর দেল। (জ্ঞানদাস)
৯. কমনীয় কুচযুগে কাঁচুলির শাখা। (মানিকরাম গাঙ্গুলি)
১০. বুকের কাঁচলি খুলে করে কত রঙ্গ। (মানিকরাম)
১১. অতনু কাঁচলা উপাম। (বিদ্যাপতি)
১২. ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি। 'ব্রষ্টলগ্ন' [কল্পনা] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩. বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি---'বিজয়িনী' [চিত্রা] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৪. তার বুকের ব্রেসিয়ারের শক্ত মাড়---'অবিশ্বাসিনী পত্নী' ফেদরিকা গারথিকা লোরকা
অনুবাদ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় [অন্যদেশের কবিতা]
১৫. হয়তো বা ব্রা খুলে দাঁড়াবে স্নানাগারে--'দরজার কাছে' [ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা]
শামসুর রাহমান

কুচের আচ্ছাদন হিসেবে কাঁচুলি কিরূপ নয়নরঞ্জক এবং কুচের সৌন্দর্য বর্ধনের ব্যাপারে কাঁচুলির ভূমিকা কত অত্যাবশ্যক, রবীন্দ্রনাথ এবং কালিদাসের দৃষ্টিতে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

শিথিলবিন্যস্ত কাঁচুলিতে নিদ্রিতা রাজকন্যার নিটোল স্তনভারকে কবি রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে পল্লবাচ্ছন্ন দুটি নির্মল ফুল—

আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।[১]

যৌবনপ্রভাবে বক্ষবিস্তৃতির কারণে শকুন্তলার বল্কলবন্ধন আঁটসাঁট হয়ে পড়ায় সখী অনসূয়া যখন বল্কলগ্রন্থি শিথিল ক'রে দিচ্ছিলেন, তখন গাছের আড়াল থেকে সেই অপরূপ কুচসৌন্দর্য দর্শন ক'রে রাজা স্বগতোক্তি করছিলেন---

কামম্, অননুরূপমস্যা বপুষোঃ বল্কলং,
ন' পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ
সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মন্ডনং নাকৃতীনাম।।[২]

(কালিদাস)

("বল্কল এই দেহের ঘোর প্রতিকূল---তথাপি বল্কলই যে ইহার দেহের সৌন্দর্য্য বর্ধিত করে নাই, এমন নয়। কেন না, শৈবালের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলে পদ্ম সুন্দর দেখায়; চন্দ্র-কলঙ্ক মলিন হইলেও চন্দ্রের সৌন্দর্যকে পরিবর্ধিত করে। সেইরূপ এই তন্বীও কঠিন বল্কল পরিধান করিয়া যেন আরও অধিক সুন্দর হইয়াছেন। যাহাদের আকৃতি স্বভাবতই সুন্দর, সব কিছুই তাহাদের অলঙ্কার।"[৩]---কালিদাসের উপরোক্ত শ্লোকের শ্রী ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীকৃত অনুবাদ)

১. 'নিদ্রিতা' [সোনার তরী] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. [অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্]
৩. [অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী)-তৃতীয় খণ্ড]
শ্রী ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত

লক্ষ্য করা গেল কাঁচুলিবেষ্টিত কুচ কালিদাসের চোখে শৈবালাবৃত পদ্মের মত, কলঙ্ক-আরোপিত চন্দ্রের মত অর্ধপ্রকাশ অর্ধগোপন ব'লেই অধিক সুন্দর।

বস্ত্রনির্মিত কাঁচুলি ছাড়াও নানা প্রকারের কাঁচুলির কল্পনা করেছেন কবিকুল, যেমন—

(১) **প্রনয়-মানরূপ কাঁচুলি**—প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন।
(শ্রীল রায় রামানন্দ)

(২) **অতনু-কাঁচুলি**—একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
(বিদ্যাপতি)

(৩) **কবি-কাঁচুলি**—আমি যৌবনভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর[১]
(নজরুল)

(৪) **নাগ-কাঁচুলি**—কন্যার বুকের পরে নাগিনীর সোনার কাঁচুলি,[২]
(অজিত দত্ত)

(৫) **কর-কাঁচুলি**—আমার অঙ্গের কাঁচুলি কৃষ্ণ করাঙ্গুলি[৩]

(৬) **বল্কল-কাঁচুলি**—রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে
আবরি বাকলে স্তন ;[৪]
(মধুসূদন)

(৭) **ফুল-কাঁচুলি**—

তরুণীর দল।। চামেলির এই কাঁচলি বেচবি কি দরে?
মালিনী।। বুনেছি সোহাগ দিয়ে বেচব আদরে।
তরুণীর দল।। কি জিনিস চাস মালিনী?
মালিনী ।। সোহাগের সর খালি নিই।
নয়নের নিই আরতি ফুল্ল অধরে!

---

১. 'বিদ্রোহী' [অগ্নিবীণা]
২. 'পাতাল কন্যা' [অজিত দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৩. [কালিদাসের মেঘদূত] বুদ্ধদেব বসু অনূদিত
৪. লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা [বীরাঙ্গনা কাব্য]

তরুণীর দল।। না, না, ভাই ঠিক বলনা,
মালিনী।। তবে চাই কানের সোনা,
দরদী দর করোনা কিনতে সুন্দরে।[১]
(সত্যেন দত্ত)

করিকুল কাঁচুলির নানান প্রকারভেদ কল্পনা ক'রেই তুষ্ট নন---কাঁচুলিকে সজ্জিত করার ব্যাপারেও তাঁদের সানন্দ মনোযোগ। মধ্যযুগের কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে দেবীদের কাঁচুলিসজ্জা প্রসঙ্গে এক একটি বড় বড় অধ্যায় রচিত হ'য়েছে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক—

কাঁচলি নির্ম্মাণ

বিশাই কাঁচলি লিখে ভারত পুরাণ দেখে
লিখে নানা পুরাণের সার।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান তুলি ধরে সাবধান
আগে লিখে দশ অবতার।।

ডানিভাগে বিশ্বকর্ম্মা লিখে মুণিগণ।
কপালে চন্দক ফোঁটা লোহিত বসন।।

তার পরে বিশ্বকর্ম্মা লিখে খগগণে।
প্রথমে বিষ্ণুর মান পন্নগ-অশনে।।

খেনে উঠে খেনে পড়ে খঞ্জনী-খঞ্জন।
চাতক-চাতকী জল মাগে অনুক্ষণ।।

বনপশু লিখে বিশাই হৈয়া সাবধান।
তুলারু ঘোড়ারু কৃষ্ণসার ঢোলকান।।

জলচর মকর লিখিল সাবধানে।
চারিপাশে নানা চিত্র করিল নির্ম্মাণে।।

কাঁচলির মধ্যভাগে লিখে বৃন্দাবন।
তার মধ্যে দোলপিঁড়ি কদম্বকানন।।

---

১. [ধূপের ধোঁয়ায় (নাটক)]

লিখিল আবর্ত্তশালী যমুনার তট।
তালের কানন লিখে ভাণ্ডীরক বট॥
অশ্বত্থ পাকুড়ি জাম পিপলী পনস।
টগর তুলসী দল লবঙ্গ বেতস॥
কেতকী ধাতকী আর লিখে নাগেশ্বর।
জাতী যুথি পুষ্প লেখে গন্ধে মনোহর॥
বিচিত্র কাঁচুলি বিশাই দিল চণ্ডিকারে।
আশীর্ব্বাদ পাইয়া বিশাই গেলা নিজ ঘরে॥
কাঁচলি পরিয়া মাতা বসিলা দুয়ারে।
শ্রীকবিকঙ্কনে গান ফুল্লরা আল্য ঘরে॥

উক্ত উদ্ধৃতিটিতে লক্ষ্য করা গেল, যে কাঁচুলি দেবীরা পরিধান ক'রে থাকেন---তাতে কি ধরনের চিত্র অঙ্কিত থাকে। মানিকরাম গাঙ্গুলির 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য থেকে অনুরূপ আর একটি উদ্ধৃতি উদ্ধার ক'রে দেবীদের চিত্রাঙ্কিত কাঁচুলির প্রতি আর একবার দৃক্‌পাত করা যেতে পারে—

করক সমান কুচে কাঁচুলির পাতি॥
রতনে জড়িত বিশ্বকর্মার গঠন।
তায় লেখা কৃষ্ণকথা অক্রুর আগমন॥

... ...

কিবা তায় কাঁচলি করিল অনুপাম।
দুসারি কদম্বগাছ ফুলের বাগান॥
ষড়ঋতু সাক্ষাৎ সকল শাখা লয়ে।
ভ্রমর ভ্রমরী বুলে ভ্রমণ করিয়ে।

... ...

পয়োধরে কাঁচলি প্রচিত্র পরিচ্ছদ।
বিষ্ণুরথ লেখা তায় বকাসুর বধ॥

... ...

কমনীয় কুচযুগে কাঁচুলির শাখা।
কৃষ্ণাবতারের কথা কিছু আছে লেখা॥

দেখা গেলো মধ্যযুগীয় কবিকুল দেবীদের কাঁচুলিতে বিশ্বকর্মার মুখাবয়ব, সর্পশয্যায় বিষ্ণু, কৃষ্ণকথা, বৃন্দাবন, কদম্বতরু, যমুনাতীর, ভ্রমরা-ভ্রমরী-পরিবৃত ফুলবাগান, ষড়ঋতু, অক্রুর আগমন, বিষ্ণুরথ. বকাসুরবধ—ইত্যাদি নানা চিত্র অঙ্কন করতেন।

কোনো কোনো কবিকে দেখা গেছে অন্ত্যজ শ্রেণীর রমণীর কাঁচুলিতে কাকের ছবি, বকের ছবির অঙ্কনকথা বর্ণনা করতে। সুন্দরী এবং ঐশ্বর্য-শালিনীর কাঁচুলিটিকে রত্নে কাঞ্চনে খচিত করতে কিংবা যে কোনো উপায়ে সুদৃশ্য করতে পুরাতন কবির মত আধুনিক কবিও আগ্রহ প্রকাশ করেন—বস্ত্রাবরণটিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক'রে তোলার জন্যেও আধুনিক কবির ব্যগ্রতা প্রকাশ পায়; নিম্নে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত---

১) রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে[১]

(মধুসূদন)

২) চন্দন-অঙ্কনে স্নিগ্ধ স্তনযুগ—বিকশিত নীপ
অতিসূক্ষ্ম হেমাঙ্কিত কাঁচুলিতে আবরিল সুখে[২]

(অজিত দত্ত)

৩) সূক্ষ্ম কাঁচুলির তলে শোভে তার শুভ্র পদ্মকলি[৩]

(আবদুল কাদির)

৪) অপ্সরীর তারা বেঁধা কাঁচুলি[৪]

(শামসুর রাহমান)

এই সজ্জিত কাঁচুলি যথাস্থানে অর্পিত হ'লে কবিকুলের প্রাণে জাগে ব্যগ্রতা·—

কারো কারো কাচলী আব্রতো পয়োধরে।
আকার দেখিয়া প্রাণ কেমন জানী করে।।

(পরশুরাম)

---

১. 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা' [বীরাঙ্গনা কাব্য]
২. 'মালতী' [অজিত দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৩. 'পৃথিবীর প্রেম' [উত্তর বসন্ত]
৪. 'আত্মপ্রতিকৃতি' [রৌদ্র করোটিতে]

কাঁচুলিবদ্ধ কুচদ্বয় দেখে কারও চোখ অচল হ'য়ে যায়—চিত্ত বন্দী হয়ে পড়ে—

কৌতুকে দেখিল কুচে কাঁচুলির ছাঁদা।
চাইতে অচল চক্ষু চিত্ত রয় বাঁধা॥
(ঘনরাম চক্রবর্তী)

এমনকি কুচকম্পনের কারনে কাঁচুলি থরথর করে উঠলে তার ভর গিয়ে পড়ে কারও হৃদয়ে—

কুচবরে কাঞ্চুলি করএ থরথর
রসিকের হৃদএ পড়এ তার ভর।
(দোনা গাজী)

কিন্তু যত সজ্জিতই করা হোক--কাঁচুলির শেষ পর্যন্ত অক্ষত থাকা আর হয়না—ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাওয়াই তার ভবিতব্য। কাঁচুলিতে হস্তসংস্থাপন-কালে নায়িক-হৃদয়ে অজস্র পুলক-মুকুল উদ্গত হয় বটে (কঞ্চুকে যব কর দেল/মুকুল হৃদয়ে তবে ভেল।। জ্ঞানদাস)—তবে সেই পুলক রোমাঞ্চ-কালে কাঁচুলিও ফাটতে থাকে চুন্ চুন্ ক'রে--'চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি'-(অমরুশতক / অনুঃ বিদ্যাপতি)। শৃঙ্গারসংগ্রামকালে কাঁচুলিকে ছিন্ন করবার বাসনা কৃষ্ণ এভাবে উল্লাস সহকারে ব্যক্ত ক'রেছিলেন —

ছাড়াইবোঁ তার ক্ষীর কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর
হাথ দিবো তাহার তনে।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

শৃঙ্গার-অন্ত্যে সর্বত্রই লক্ষিত হয় কাঁচুলির ছিন্ন মর্দিত রূপ—

১) সেজ বিধাঁসি বিরহ সংগ্রামা॥
... ...
কঞ্চুকী চূর চূর ভই তানী।১
(জায়সী)

২) কাঞ্চুলী ফাড়িল কার কুচে লক্ষ রেখা।
(দোনা গাজী)

৩) জড়াজড়ি ঘেঁসাঘেঁসি ছিড়িল কাঞ্চলী।
(সালে মুহম্মদ)

১. ("শৃঙ্গার-সংগ্রামে শয্যা বিধ্বস্ত হল। কাঁচুলী এবং বক্ষাবরণ চূর্ণ হল। —অনু: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) [পদ্মাবতী (১ম খণ্ড)]

তবে শুধু যে শৃঙ্গারসংগ্রামের কারণেই কাঁচুলি ছিন্ন হয়--তা নয়; উল্লসিত কুচদ্বয়ও অনেক সময় কাঁচুলির ছিন্নতার কারন হ'য়ে থাকে–

(১) বেধৈ ভঁউর কণ্ট কেতকী।
চাহহি বেধ কীহ্ন কঞ্চুকী॥[১]
(জায়সী)

(২) দেখা চাঁদ সুর জস সাজা।
... ...
হুলসি হিয়া কঞ্চুকি ন সমাঈ॥
হুলসে কুচ কসনী বদ টূটে॥[২]
(জায়সী)

কাঁচুলি অক্ষত থাক আর বিক্ষতই হোক—কুচলগ্ন হ'য়ে থাকা, তার কাছে স্বর্গবাসতুল্য—বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি

ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।[৩]
(রবীন্দ্রনাথ)

কাঁচুলির এই ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য দেখে কোনো কবি তাই নিজেই কাঁচুলি হ'য়ে শ্রীঅঙ্গকে জড়িয়ে থাকার বাসনা পোষণ করেন---

আমি যৌবনভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর।[৪]
(নজরুল)

দেবতা মদন ও তাঁর অপূর্ব ধনভাণ্ডারকে জড়িয়ে থাকতে চান অনুপম কাঁচুলি হ'য়ে– একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
(বিদ্যাপতি)

---

১. ("স্তনবৃন্তদ্বয় কেতকী ফুলের কাঁটার মতো ভ্রমরকে বিদ্ধ করতে পারে এবং তারা কাঁচুলীকে বিদ্ধ করতে চায়।— অনুঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

২. ("চাঁদ (পদ্মাবতী) দেখলেন সূর্য (রত্নসেন) কেমন সেজেছেন।.. ... কম্পিত বক্ষ কাঁচুলিতে আবদ্ধ রইল না। বক্ষবন্ধনী ছিঁড়ে স্তনযুগ স্ফুরিত হ'য়ে উঠল। অনুঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩. 'বিজয়িনী' [চিত্রা]

৪. 'বিদ্রোহী' [অগ্নিবীণা]

স্তনস্থিত হারটির প্রতিও কবিদের মনোযোগ কম নয়। কবির চোখে এই হার কখনো সর্প, কখনো মার্জার কখনো গঙ্গা, কখনো আল্পনা, কখনো তারকা কখনো মদনের ফাঁদ কখনো বা স্বয়ং মদন।[১]

হার যখন সর্প :

১. নহ ফণিরাজ উরে মণিহার।।[২]"

(বিদ্যাপতি)

২. "(বক্ষের বস্ত্র পবনে বিস্রস্ত হওয়ায়) মনোহর হার ব্যক্ত হইল, তাহা উজ্জ্বল সর্পের মত দেখাইল। সেইজন্য ময়ূর বেগে ঝাঁপ দিল, নখর বিদ্ধ করিল।"[৩]

(বিদ্যাপতি)

৩. "মানিনী রাধার নিকট সাধুতার পরীক্ষা দিতে উদগ্রীব কৃষ্ণ রাধার স্তন-ঘটের হার-সর্পের উপর হাত রাখিতে উৎসাহী। কৃষ্ণ জানেন হার-সর্প কাটেনা। যদি কাটেও তার পূর্বেই স্পর্শঘটিত আনন্দ পাইয়া যাইবেন সেই যথেষ্ট লাভ (৬৪৭)।"[৪]

৪. কুচ-হেম-ঘট মাঝে হার-ভুজঙ্গ আছে
তথির উপরে দেহি হাত। (দ্বিজ মাধব)

হার যখন মার্জার :

১. সোনার লকেট যেনো স্পর্শাতীত যুগল চাঁদের কাছাকাছি
ভেজা বেড়ালের মতো শুয়ে থাকে[৫]

(সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল)

---

১. ৬২৪ (বিদ্যাপতি)

২. (মদনের নিকট বাণভীতা রাধার অনুনয়বাক্য এটি। রাধা নিজে শিব নন ব'লে মদনকে বোঝাচ্ছেন।)

৩. ৩৫০ (এখানে বক্ষে কৃষ্ণের নখচিহ্ন সম্পর্কে রাধা সখীর কাছে মিথ্যা কৈফিয়ত দিচ্ছে।)

৪. বিদ্যাপতির একটি পদ বিষয়ে সমালোচকের বিশ্লেষণ এটি।
[গ্রন্থ: চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি] শঙ্করী প্রসাদ বসু পৃঃ ৫২৮

৫. 'ঈর্ষা' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]

১৯

२०

হার যখন গঙ্গা :

১. অমর ভুধর   সম পয়োধর
      মহঘ মোতিম হার।
   হেম-নির্মিত   শম্ভু শেখর
      গঙ্গ নির্মল ধার।। (বিদ্যাপতি)

২. চন্দনে চরচু   পয়োধর গৃম
      গজমুকতা হার।
   ভসমে ভরল   জনি সঙ্কর
      শির সুরসরি জলধার।। (বিদ্যাপতি)

৩. গিরিবর-গরুঅ-পয়োধর-পরশিত
      গীম গজমোতিক হারা।
   কাম কম্বু ভরি কনক শম্ভুপরি
      ঢারত সুরধুনীধারা।। (বিদ্যাপতি)

৪. পীন পয়োধর   অপরূপ সুন্দর
      উপর মোতিম হার।
   জনি কনকাচল   উপর বিমল জল
      দুই বহ সুরসরি ধার।। (বিদ্যাপতি)

গঙ্গা ও শিবকে একত্র দেখার বাসনা বিদ্যাপতির কবিতায় যে মহৎ অলংকার-গুলোর জন্ম দিয়েছে—উপরে তার কয়েকটি চয়িত হলো। কবি শিবকে পেয়েছেন রাধার বুকে, গঙ্গাকে পেয়েছেন মুক্তাহারে। প্রথম উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে স্বর্ণশিবের শিরে গঙ্গার নির্মল ধারা দর্শন ক'রে কবি খুশী হয়েছেন। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতেও শিবশিরে গঙ্গাধারা--শঙ্কর এখানে ভস্মাচ্ছাদিত (চন্দনচর্চিত কুচ)। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে আছে কনকাচল, ভারতীয় কবি-কল্পনায় কনকাচল চিরদিনই শিবাকার। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে, পূজারী কাম কম্বু ভ'রে কনক-শম্ভুর শিরে সুরধুনীধারা ঢালছে। শঙ্খ-কণ্ঠ থেকে দোলায়মান হারটি দেখে কবির মনে হয়েছে পূজারীর অঙ্গুলিধৃত শঙ্খ থেকে গাঙ্গ্যবারি ঝরছে।

কুচযুগলকে যখন পর্বত কল্পনা করা হয়েছে—কুচবৃন্তকে কমল, তখন ঐ বিরুদ্ধ পবিবেশে জাত মৃণালবিহীন কমল দু'টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হার গঙ্গাজল সরবরাহ করেছে—

মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাই।
মনিময় হার ধার কহ সুরসরি
তৈঁ নহি কমল সুখাঈ॥

(বিদ্যাপতি)

হার যখন দুগ্ধধারা ঃ

১. "উলটাইয়া পড়া কুচযুগের উপর বিলম্বিত হার দুলিতেছে; যেন কনক কলস দুগ্ধধারা বমন করিতেছে।"

(বিদ্যাপতি)

এটি বিপরীত রতির বর্ণনা। কনক-কলসের দুগ্ধ-বমন-কল্পনায় প্রেমের উদ্বেল রূপ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি প্রেমলীলার এক বিশেষ অবস্থার স্বভাব ও উন্মোচিত হয়েছে।

হার যখন আল্‌পনা ঃ

১. পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।

(বিদ্যাপতি)

মুক্তাহার এখানে প্রিয়মিলনের ভাবস্বপ্নে আচ্ছন্ন নায়িকার কল্পনায় দেহ-মন্দিরের আলপনারূপে মর্যাদাধন্য হয়েছে।

হার যখন তারকা :

১. মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতীহার।। (বড়ু চণ্ডীদাস)

২. "স্তনযুগলের উপর কেশ মুক্ত হইয়া প্রসারিত হইল, তাহাতে হার জড়াইয়া গেল, যেন সুমেরু-উপরে চন্দ্রবিহীন তারাসকল উদিত হইল।"[১] (বিদ্যাপতি)

হার যখন বিদ্যুৎ :

১. হালিয়া নাগ দেবীর হৃদয়ে শোভে হার।
সুমেরু শিখরে যেন বিজুলি ঝঙ্কার।। (বিপ্রদাস পিপিলাই)

হার যখন মদনের ফাঁদ :

১. হার হরল মন জনি বুঝি ঐসন
ফাঁস পসারল কাম।
(বিদ্যাপতি)

হার যখন নৃত্যরত মদন :

১. "অলকের ভারে মুখ ঢাকে যেন চন্দ্রমণ্ডলকে অন্ধকার ঢাকে। বিলোল হার লম্বিত হইয়া শোভিত—আনন্দিত মদন হিন্দোলা খেলিতেছে। কিঙ্কিনীমালা মধুর বাজিতে লাগিল, যেন মদনরাজের জয়তুর্য ![২]
(বিদ্যাপতি)

হার যখন প্রেমিক-বন্ধনের অদৃশ্য নিগড় :

আমি রাখব গেঁথে তারে রক্তমনির হারে,
বক্ষে দুলিবে গোপনে নিভৃত বেদনাতে।[৩]
(রবীন্দ্রনাথ)

---

১. ২১৪, পদটি বিপরীত বিহারের।
২. ৪৯৪, এ পদটিও বিপরীত বিহারের।
৩. '২২১' [গীতবিতান (প্রেম)]

হার যথন প্রেমিক:

মালারি মতন দুলিতাম তবে হৃদয়তলে
নানান ছলে,
বেড়িয়া গলে,[১]
(মিশরীয় কবি/অনুবাদ: সত্যেন দত্ত)

কবি কখনো দেবীর, কখনো মানবীর, কখনো রাক্ষসীর, কখনো অপ্সরী-কিন্নরীর, কখনো গন্ধর্ববালার, কখনো স্বর্গনর্তকীর, স্বর্বেশ্যার, পরীর, কখনো যক্ষনারীর, জংলী নারীর, যমদূতীর, পাতালকন্যার বক্ষদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। কুমারী, সধবা, বিধবা, স্বামীপরিত্যক্তা, কুলভ্রষ্টা, স্বকীয়া, পরকীয়া—সকল শ্রেণীর নারীরই বক্ষপ্রদর্শনীতে ঘুরেছেন। প্রদর্শনীতে আছে স্বদেশিনী, আছে বিদেশিনী, আছে উপজাতি রমণী। আছে হস্তিনী, আছে শঙ্খিনী, চিত্রিণী, পদ্মিনী। কবি দেখেছেন মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগলভাকে--দেখেছেন অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকন্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকাকে--অর্থাৎ মনের বিভিন্ন অবস্থায় তাদের কুচের যে রূপ হয়েছে, দেখেছেন সেই রূপ। এমনকি জড় প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্বের সঞ্চারণ ঘটিয়েও কবি দর্শন করেছেন কুচশোভা।

---

১ 'সাধ'

দেবী :

১) অন্নপূর্ণার—কটি অতি ক্ষীণতর নাভি সুধা সরোবর
উচ্চ কুচ সুধার কলস।
(ভারতচন্দ্র)

২) কালির—পীনোন্নত পয়োধর রজত কাঞ্চন কর
মুন্ডমালা ঘন করে রব।।
(বলরাম কবিশেখর)

৩) ইন্দ্রানীর—ইন্দ্রানীর করপদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয়।... ... .
... ... খুলিলা কাঁচলি;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি
রূপিনী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু নিভাননে
করি কেলি মত্ত যথা মধুকর যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বনস্থলে।[১]
(মধুসূদন)

৪) লক্ষ্মীর—কমল কোরক কদম্ব নিন্দক
সুধার কলস কুচ।
(ভারতচন্দ্র)

৫) কৌষিকীর—কমল কোরক কদম্ব নিন্দক
করি স্তুত কুম্ভ উচ।
(ভারতচন্দ্র)

---

১. [মেঘনাদবধ কাব্য]

৬) মনসার— অলকাবলী চিত্র-নাগ হইল শোভন।

… … …

সিন্দুরিয়া নাগ হৈলা সীমন্তে সিন্দুর।

… … …

হালিয়া নাগ দেবীর হৃদয়ে শোভে হার।
সুমেরু শিখরে জেন বিজুলি ঝংকার ॥
(বিপ্রদাস পিপিলাই)

অমরীর— ১) কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতনমালা,[১] (মধুসূদন)

২) অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে;
অমরী আমরা দেব।[২]
(মধুসূদন)

সুরবালার— সতত আদরে
সেবে তোমা সুররালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী;[৩] (মধুসূদন)

অপ্সরী-বিদ্যাধরীর—কোটি কোটি বিদ্যাধরী পরী অপ্সরী

… …

কোনো জনে পড়ে যেন বস্ত্র দূর করি
আর জনে চড়ে গিয়া দুই স্তনে ধরি।

… …

কেহ গিয়া দিউটি নিবাএ নানা ছলে
কুচে কর ক্ষেপএ চুম্বএ লৈয়া কোলে।
কাঞ্চুলি ফাড়িল কার কুচে লক্ষ রেখা ॥
(দোনা গাজী)

১-২. [মেঘনাদবধ কাব্য]
৩. 'অর্জ্জনের প্রতি দ্রৌপদী' [বীরাঙ্গনা কাব্য]

স্বর্বেশ্যার— কিন্তু উর্বশী---চিরকাল উর্ধ্বমুখ যার স্তনাগ্র,
রোমকূপ বিদ্যুৎগর্ভ, নিষ্ঠীবন ইন্দ্রপেয় সোম,
যে সরিয়ে দেয় রতিক্লান্ত তপস্বীদের, অঙ্গ থেকে,
কাঁচুলির মতো নির্ভার
অলজ্জিতা, আহ্লাদিনী, নগ্না ;[১]
(বুদ্ধদেব বসু)

যমদূতীর— পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প ; নখ অসি সম ;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে ;[২]
(মধুসূদন)

যক্ষনারীর — যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ
অযত্ন শিথিল বেশ
সেদিন ও তো এমনিতর অন্ধকার দিন।
(রবীন্দ্রনাথ)

জংলীনারীর— স্তন দুই নারিকেল লটকি আছএ।
করতাল শব্দ করে হাঁটিতে সমএ॥
(দোনা গাজী)

পাতালকন্যার—কন্যার সোনার দেহে হাজার ময়ূরকণ্ঠী সাপ,
কন্যার বুকের' পরে নাগিনীর সোনার কাঁচুলি,
সাপেরা মেলিয়া ফনা দূর করে গরলের তাপ
কাঁপিলে কন্যার চোখ দশলাখ ফনা ওঠে দুলি ;[৩]
(অজিত দত্ত)

---

১. শঙ্করাচার্যের 'আনন্দলহরী' অবলম্বনে স্তোত্র [বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা]
২. [মেঘনাদবধ কাব্য]
৩. 'পাতালকন্যা'

পরীর— ১) সে পাকা ধানের হীরকরেণু
নীল নলিনীর নীলিম অনু
মেখেছে মুখ বুক ভরি'।[১]
(নজরুল)

২) অতিকায় মৎস্যপৃষ্ঠে করেছি ভ্রমণ
সমুদ্দুরে বহুকাল, জলপরীদের দিব্যলালিম স্তনাগ্র ছুঁয়ে-ছেনে
গেছে বেলা[২]
(শামসুর রাহমান)

রাক্ষসীর— পেশল উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী।[৩]
(মধুসূদন)

মানবী :

কুমারীর—অরুণা রয়েছে খুব ঘুমে—
যে রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে ঘুম স্পষ্টত খুব নীল;
যে স্তনে লাগেনি দাঁত তার খুব মৃদু ওঠাপড়া
তলপেটে একটুও নেই ফাটা দাগ, এ শরীর আজও ঋণী নয়[৪]"
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

সধবার— নৈন গুলাল কন্ত সঁগ জাগী।।
... ...
বৈঠ ভৌঁর কুচ নারঁগ বারী।
লাগে নখ উছঁরী রঙ্গধারী।। (জায়সী)
(কান্তের সঙ্গে নিশি জাগরণে তোমার নয়ন হয়েছে
গুলালের মত লাল। নারঙ্গের মতো স্তনযুগলে ভ্রমর বসেছে,
দেখা দিয়েছে নখরেখার রক্তিমা। অনুবাদ : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিধবার— অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
(ভারতচন্দ্র)

---

১. 'নীলপরী'
২. 'টানেলে একাকী'
৩. [মেঘনাদবধ কাব্য]
৪. 'কঙ্কাল ও শাদা বাড়ি' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

স্বামীপরিত্যক্তার—খেলি, কেলি, মেলি সকল গেল মেরি,
যদি গেল কান্ত সে দূর।।
সরোবর সো হল মলিন নলিনী দল
নীর বিনু জনি শুকি যায়।
চলি যায় যৌবন টুটায় জীবন ধন
হরি বিনে মরণ সে ভায়।।
(দৌলৎ কাজী)

।। বিদেশিনী ।।

ফরাসী কন্যার—হালকা গেরো উন্মোচন করুক
দুটি চোখের মতো রে তোর বুক
দীপ্তিময় লাবণ্যের চাপে
আমরা জ্বলি পাপে।[১]
(বোদলেয়ার/অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)
বার্লিন-কন্যার—এর মেয়েরা এমন সুন্দরী, এমন বিনীত—
যে স্তন স্পর্শ করলে মনে হয় লজ্জাহীন।[২]
(আবুল হাসান)
বেদুয়ীন কুমারীর—কাঁচুলি দুলায়ে কাঁকাল লচকি' নিতে জমজম্-নীর
গুরুশ্রোণীভারে অলসগমনা বেদুয়ীন কুমারীর
কলস ছলকে, ...
... ...
ক্ষীণ কাঁচুলিতে পীন কুচযুগ আবরি' নবোঢ়া বালা
পান্নার হার গাঁথিছে বিরলে বুকের সুরভি-ঢালা।[৩]
(আবদুল কাদির)
অষ্ট্রিয়ান-কন্যার— অষ্ট্রিয়ান বাড়ীর বাগানে
যে তরুণী ফুল তোলে, নোয়ায় কম্পিত ডাল যার
স্তনভারে সূর্যগন্ধী ফলের সোনালি—[৪]
(শামসুর রাহমান)

১. 'লালচুলের ভিখিরি মেয়েকে'
২. 'অন্যরকম বার্লিন'
৩. 'হজরত মোহাম্মদ (অবতরণ)'
৪. 'নিরুদ্দেশ দেওয়াল'

॥ উপজাতি রমণী ॥

ভুটিয়া কন্যার— ভুটিয়া যুবতী চলে পথ;
আকাশ কালিমামাখা কুয়াশায় দিক্ ঢাকা,
চারিধারে কেবলই পর্বত;
. . . .
টসটসে রসে ভরপুর—
আপেলের মত মুখ আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর;
যৌবনের রসে ভরপুর—।[১]
(যতীন্দ্রমোহন বাগচী)

সাঁওতাল কন্যার—তোমার শরীরটা যেন পাকা আমের মতো রসালো
তোমার স্তন দুটি যেন সুডোল বেলফলের বিস্ময়;
(একটি দ্বৈত লোকগীতি/অনুবাদ : আবদুস সাত্তার)

চাক্‌মা কন্যার — ১)কেবল আশ্চর্য হই; ঝুড়িতে কাঠের বোঝা রেখে
সহজেই পিঠে বেঁধে চাকমা মেয়েটা অনায়াসে
সুউচ্চ পাহাড় বেয়ে কী করে উপরে এলো!
... ...
মৃন্ময় সূর্যের হাসি নিয়ে দীপ্ত মুখে
বুকে বেঁধে 'রাঙা খাদী' কী যে সুখে পরম কৌতুকে
মেয়েটা নিয়েছে পাঠ পাহাড়ী গ্রন্থের।[২]
(আবদুস সাত্তার)

২) ঝুড়িতে সব্‌জি নিয়ে হেঁটে আসে চাকমা কিশোরী,
বিচিত্র কাপড়ে বাঁধা ঘামে ভেজা উপচানো বুকে
বনের রহস্য কাঁপে যেন।[৩]
(আল মাহমুদ)

---

১. 'যৌবন চাঞ্চল্য' [কাব্য মালঞ্চ]

২. [অন্তরঙ্গ ধ্বনি]

৩. 'অরণ্যে ক্লান্তির দিন' [লোক লোকান্তর]

মুরং কন্যার—শঙ্খের বালুকা বুকে শুয়ে শুয়ে দেখি শুধু খাব
উত্তুঙ্গ লুসাই জুড়ে জুমিয়ারা বুনছে আমন;
মুরং মেয়ের দুই এলোমেলো প্রিমিটিভ বুক
পড়ন্ত পাহাড়ী রোদে পুরুষের পরশ উন্মুখ;
(মুহম্মদ নূরুল হুদা)

দেহগঠন এবং স্বভাব পর্যবেক্ষণ ক'রে রমণীকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হ'য়েছে—(১) হস্তিনী (২) শঙ্খিনী (৩) চিত্রিণী এবং (৪) পদ্মিনী। কবিকুল উক্ত চার শ্রেণীর নারীর কুচশোভাও লক্ষ্য করেছেন—

হস্তিনীর—পহিলে কহৌঁ হস্তিনী নারী।
হস্তী কৈ পরকীরতি সারী॥
সির ঔ পায়ঁ সুভর গিউ ছোটী।
উর কৈ খীনি লঙ্ক কৈ মোটী॥
কুম্ভস্থল কুচ মদ উর মাহীঁ।
গবন গয়ন্দ ঢাল জনু বাহীঁ॥[১] (জায়সী)

("প্রথমে হস্তিনী নারীর কথা বলছি। তার সমস্ত প্রকৃতি হস্তীতুল্য। এর মস্তক এবং চরণ বিশাল, কিন্তু গ্রীবা ক্ষুদ্রাকার। বক্ষস্থল ক্ষীণ, কটিদেশ বিস্তৃত। স্তনযুগল হস্তীকুম্ভের ন্যায় এবং বক্ষস্থলে তা মর্দিত। মত্ত গজের ন্যায় চলন এবং বাহু ঢালের ন্যায় প্রশস্ত।" অনুবাদঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

শঙ্খিনীর—দূসরি কহৌঁ সঙ্খিনী নারী।
করৈ বহুত বল অলপ-অহারী॥
উর অতি সুভর খীন অতি লঙ্কা।
গরব ভরী মন করৈ ন সঙ্কা॥
... ...
সেজ মিলত সামী কহঁ লাবৈ উর নখবান।
জেহি গুন সবৈ সিংঘ কে সো সঙ্খিনী সুলতান॥[২]
(জায়সী)

১-২. [পদ্মাবতী] দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

("দ্বিতীয়ত বলব শঙ্খিনী নারীর কথা। এ সবলা কিন্তু স্বল্পাহারী। বক্ষোদেশ পরিপূর্ণ, কটিদেশ ক্ষীণ। গর্বিতচিত্ত, নির্ভীকমনা।...স্বামীর সঙ্গে শয্যায় মিলনকালে পতির বক্ষে সে নখাঘাত করে। যার স্বভাব সমস্তই সিংহসদৃশ, হে সুলতান, সে-ই শঙ্খিনী নারী।" অনুবাদঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

চিত্রিণীর—তীসরি কহোঁ চিত্রিণী নারী।
মহা চতুর রস-প্রেম পিয়ারী।।
রূপ সুরূপ সিঙ্গার সবাঁই।
... ...
চিত্রিণী জৈস কুমুদ-রঙ্গ সোই বাসনা অঙ্গ।
পদমিনি সব চন্দন অসি ভঁবর ফিরাহিঁ তেহি সঙ্গ।।[১]
(জায়সী)

("তৃতীয়ত বলব চিত্রিণী নারীর কথা। (এ রমণী) খুব চতুরা, প্রেম রসের রসিকা। রূপে সুরূপা, সাজসজ্জা-নিপুনা। ...চিত্রিণী নারী যেমন কুমুদবর্ণা তেমনি তার অঙ্গও সুগন্ধময়। চন্দনগন্ধময় এই নারীর সঙ্গলাভের জন্য ভ্রমর এসে ঘুরে বেড়ায়।" অনুবাদঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

পদ্মিনীর—চৌথী কহোঁ পদমিনী নারী।
পদুম-গন্ধ সসি দৈউ সঁবারী।।
পদুমিনি জাতি পদুম রঁগ ওহীঁ।
পদুম-বাস মধুকর সঁগ হোহীঁ।
না সুঠি লাঁবী না সুঠি ছোটী।
না সুঠি পাতরি না সুঠি মোটী।।

সোরহ করা রঙ্গঁ ওহি বাণী।
সো সুলতান পদমিনী জানী।।
দীরঘ চারি চারি লঘু সোঈ।
সুভর চারি চহুঁ খীনৌ হোঈ।।
... ...
প্রথম কেস দীরঘ মন মোহৈ।
ঔ দীরঘ অঁগুরী কর সোহৈ।।

---

১. [পদ্মাবতী] দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

দীরঘ নৈন তীখ তহঁ দেখা।
দীরঘ গীউ কণ্ঠ তিনি রেখা ॥
পুনি লঘু দসন হোহিঁ জনু হীরা।
ঔ লঘু কুচ উত্তঙ্গ জঁভীরা ॥[১]
(জায়সী)

("চতুর্থত বলব পদ্মিনী নারীর কথা। দেবতা পদ্মগন্ধ দিয়ে এই চন্দ্রকে নির্মাণ করেছেন। পদ্মিনীজাতীয়া রমণীর রূপ ও রঙ পদ্মের ন্যায়। তার অঙ্গের পদ্মগন্ধে (লুব্ধ হয়ে) ভ্রমর নিত্যসঙ্গী। এ খুব লম্বা নয়, খুব বেঁটেও নয়, খুব কৃশ নয় আবার খুব মোটাও নয়। এর রূপ ষোলকলায় পূর্ণ, হে সুলতান, এই নারীকেই পদ্মিনী বলে। ষোড়শ শৃঙ্গারের মধ্যে যে চার প্রকারের দীর্ঘতা, চাররকমের লঘুতা, চারধরণের প্রশস্ততা এবং চার প্রকারের ক্ষীণতা (প্রসিদ্ধ), সবই এই নারীর মধ্যে আছে।...প্রথমে এর দীর্ঘ কেশ মনকে মুগ্ধ করে, দীর্ঘ অঙ্গুলিগুলি হাতের শোভা। দীর্ঘ নয়নে উজ্জ্বল দৃষ্টি, দীর্ঘ গ্রীবায় তিনটি কণ্ঠরেখা। আবার ক্ষুদ্র দাঁত যেন হীরের টুকরো। ক্ষুদ্র স্তনদ্বয় যেন উদ্‌গত লেবু।" অনুবাদ: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বৈষ্ণব পদাবলীতে রতিভেদে, বয়স ও গুণাদিভেদে এবং প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ভেদে নায়িকার নানান অবস্থান্তরের উল্লেখ আছে এবং সে অনুসারে নায়িকার নানা নামকরণ করা হয়েছে, যেমন—

রতিভেদেঃ

(১) সাধারণী (২) সমঞ্জসা (৩) সমর্থা

বয়স ও গুণাদিভেদেঃ

(১) মুগ্ধা (২) মধ্যা (৩) প্রগলভা

প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ভেদেঃ

১। অভিসারিকা—(ক) জ্যোৎস্নাভিসারিকা, (খ) তামসাভিসারিকা, (গ) বর্ষাভিসারিকা, (ঘ) দিবাভিসারিকা, (ঙ) কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, (চ) তীর্থযাত্রাভিসারিকা, (ছ) উন্মত্তাভিসারিকা, (জ) অসমঞ্জসাভিসারিকা।

১. [পদ্মাবতী] দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

২। বাসকসজ্জিকা—(ক) মোহিনী, (খ) জাগ্রতিকা, (গ) রোদিতা, (ঘ) মধ্যোক্তিকা, (ঙ) সুপ্তিকা, (চ) চকিতা, (ছ) সুরসা, (জ) উদ্দেশা।

৩। উৎকণ্ঠিতা – (ক) দুর্মতি, (খ) বিকলা, (গ) স্তব্ধা, (ঘ) উচচকিতা, (ঙ) অচেতনা, (চ) সুখোৎকণ্ঠিতা, (ছ) মুখরা, (জ) নির্ব্বন্ধা।

৪। বিপ্রলব্ধা— (ক) বিফলা, (খ) প্রেমমত্তা, (গ) ক্লেশা, (ঘ) বিনীতা, (ঙ) নির্দ্দয়া, (চ) প্রখরা, (ছ) দূত্যাদরা, (জ) ভীতা।

৫। খণ্ডিতা—(ক) নিন্দা, (খ) ক্রোধা, (গ) ভয়ানকা, (ঘ) প্রগল্‌ভা, (ঙ) মধ্যা, (চ) মুগ্ধা, (ছ) কম্পিতা, (জ) সন্তপ্তা।

৬। কলহান্তরিতা—(ক) আগ্রহা, (খ) ক্ষুব্ধা, (গ) ধীরা, (ঘ) অধীরা, (ঙ) কুপিতা, (চ) সমা, (ছ) মৃদুলা, (জ) বিধুরা।

৭। প্রোষিতভর্ত্তৃকা,—(ক) ভাবি, (খ) ভবন, (গ) ভূত, (ঘ) দশদশা, (ঙ) দূত-সংবাদ, (চ) বিলাপা, (ছ) সখ্যুক্তিকা, (জ) ভাবোল্লাসা।

৮। স্বাধীনভর্ত্তৃকা—(ক) কোপনা, (খ) মানিনী, (গ) মুগ্ধা, (ঘ) মধ্যা, (ঙ) সমুক্তিকা, (চ) সোল্লাসা, (ছ) অনুকূলা, (জ) অভিষিক্তা।

উপরোক্ত সকল অবস্থান্তরের সময় নায়িকার কুচরূপ প্রেক্ষণ করেছেন প্রেমাকুল বৈষ্ণব কবি - নায়িকার মনের বিভিন্ন রূপান্তরকালে কুচেও তাঁরা নানা রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন, লক্ষ্য করেছেন নানা অভিব্যক্তির প্রতিফলন। নিম্নে কোনো কোনো অবস্থান্তরকালে কুচরূপের প্রতি কবির অবলোকনকে প্রদর্শন করা গেলো।

বয়স ও গুণাদিভেদেঃ

(১) মুগ্ধার কুচরূপ—নবীন বয়স, অল্পমাত্র কাম যার, সেই তরুণীই মুগ্ধা। মুগ্ধা তরুণী রতিবিষয়ে বামা, সখী-অনুগতা, রতিচেষ্টায় অতিশয় লজ্জিতা অথচ গোপনে প্রযত্নশীলা, অপরাধী প্রিয়তমের প্রতি বাষ্পরুদ্ধনয়না, প্রিয় এবং অপ্রিয় কথনে অশক্তা, মানে পরাঙ্‌মুখী। মুগ্ধার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যদ্যোতক উদাহরণ হলো, 'কানু বদন হেরি, উছলিত অন্তর, লাজে বসনে মুখ ঝাঁপি', 'গুরুজনে নয়ন নয়নে রহে সুন্দরী নবযৌবন মুদি ভারি', 'কুচ কর পরশনে,

চমকি উঠয়ে ধনী, চুম্বনে রহু মুখ মোড়ি।' নিভৃত কুঞ্জকুটিরে বল্লভাক্রান্ত উপদ্রুত এক মুগ্ধার কুচরূপ অবলোকন করা যাক। এই অপরূপা নবীনাকে রেখে সখীরা চলে গেলে মদনাক্রান্ত পুরুষটি অর্গল বন্ধ করলো। চললো বস্ত্রহরণ এবং বস্ত্রসংবরণ প্রতিযোগিতা। যখন অস্ফুট কুচপদ্মকলি ভ্রমর টানাটানি করতে লাগলো তখন মুগ্ধার চোখ অশ্রুসজল হলো, অঙ্গ কাঁপতে লাগলো--"ওগো সখি আমাকে লইয়া যাইওনা, আমি নিতান্ত বালিকা, নাথ কামাকুল। ...না না করিতে করিতে নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, ভ্রমর পদ্মকলি টানাটানি করিতে লাগিল।[১] (বিদ্যাপতি)। রস-অনভিজ্ঞা, অ-বশীভূতা মুগ্ধার আর একটি চিত্র--"কুচযুগ স্পর্শ করিলে গা মোড়া দেয়, যেন তরুণ সর্প মন্ত্র মানেনা।"[২] (বিদ্যাপতি)

(২) মধ্যার কুচরূপ--মধ্যার লজ্জা ও মদন দুই সমান। প্রস্ফুটযৌবনা এই রমণী, যার বাক্যে ঈষৎ প্রগল্‌ভতা এবং মূর্চ্ছা পর্যন্ত ক্ষমতা, তিনি মানে কখনও মৃদু কখনও বা কর্কশা। এরকম এক মধ্যার কুচশোভা এবার দর্শন করা যাক—"যখন হরি কাঁচুলী কাড়িয়া লইল, (তখন সুন্দরী) অঙ্গ ঢাকিবার অনেক প্রযুক্তি করিল। তখনকার কথা বলা যায় না। সুন্দরী ধনী লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। দীপ দূরে জ্বলিতেছে, হাত দিয়া নিবান যায় না। লজ্জায় মরেনা ; রমণীর কঠিন পরাণ।"[৩] (বিদ্যাপতি)। হরি কাঁচুলি কেড়ে নেওয়ায় সুন্দরীর অন্তরে সুখ উপজাত হয়েছে। অনাবৃত কুচ কামুক পুরুষের দৃষ্টিনন্দিত হচ্ছে—এতে রমণউন্মুখ শ্রীমতির সর্বাঙ্গে পুলকবন্যা। সুখাকুল এই মধ্যা একই সঙ্গে মদনাবেগ এবং লজ্জায় বিহ্বলা, বিবশা—একই সঙ্গে সে লজ্জামূর্ছিতা এবং রসমূর্ছিতা। ৬৭৮ পদে নায়িকা প্রথমে স্পর্শে সরে গেছে, চকিত নয়নে চেয়ে মাটিতে নখ দিয়ে দাগ কেটেছে, কিন্তু চতুর কানাই প্রয়োজন বুঝে চরণস্পর্শ, করধারণ ও কুচগ্রহণ করাতে "গৌরাঙ্গী হাসিয়া তাকাইয়া বসনে মুখ লুকাইল—মনে হইল, রত্ন যেন দান করিয়া আবার তাহা চুরি করিয়া লইল।" (বিদ্যাপতি)। তীব্র মদনব্যাকুলতার জন্য গৌরাঙ্গী রত্ন দান করেছিল আর প্রবল লজ্জার কারণেই প্রদত্ত রত্ন পুনরায় চুরি করেছিল।

---

১. ২৭৪

২. ৬৭৭

৩. ৮৫

(৩) প্রগল্‌ভার কুচরূপ—প্রগল্‌ভা রমণী পূর্ণযৌবনা, মদান্ধা, বিপরীত সম্ভোগে ঔৎসুক্যশীলা, ভূরি ভাবোদ্‌গমে অভিজ্ঞা, রসাক্রান্তবল্লভা, উক্তিতে এবং চেষ্টায় নিপুণা, মানে অত্যন্ত কর্কশা। প্রগল্‌ভার কুচশোভা কবির দৃষ্টিতে—"আজ আমার সরম ভরম সব দূরে গেল। প্রিয় ঐরূপে আপনার ভাব (পুরুষের ভাব) আমাতে অনুভব করিয়া কি যে সুখ পান বলিতে পারি না।" . . . . "বিদ্যুৎলতার তলে তিমির প্রবেশ করিল, উভয়ের মধ্যে সুরধুনী ধারা। তরল তিমির যেন শশী ও সূর্য গ্রাস করিল। চারিদিকে তারা খসিয়া পড়িল। অম্বর খসিল, পর্বত উল্টাইয়া গেল। ধরণী ডগমগ দুলিতেছে। প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছে, ভ্রমরীরা কলরব করিতেছে। প্রলয়পয়োধিজল যেন আচ্ছাদন করিল।"[১] (বিপরীত রতির বর্ণনা—বিদ্যাপতি)। পুরুষায়িত আচরণকালে কুচপর্বতের উল্টে যাওয়ার সুখব্যাকুলতার কথা প্রগলভা রমণী যখন সখীর কাছে ব্যক্ত করছে—তখন সেই বর্ণনাভঙ্গি কেমন অলজ্জ এবং আড়ষ্টতাহীন—উক্ত উদ্ধৃতিতে সেটি লক্ষ্য করা গেল।

প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ভেদেঃ

(১) অভিসারিকার কুচরূপ—

(ক) জ্যোৎস্নাভিসারিকা—রাধিকা জ্যোৎস্নারাতে অভিসারযাত্রা করবেন ব'লে কুচ চন্দনচর্চিত করছেন। উদ্দেশ্য, শ্বেতচন্দনাঙ্কিত কুচ জ্যোৎস্নায় মিশে থাকবে— দুর্মুখেরা দেখতে পাবেনা। কিন্তু এমন করলে কুচের অকৃত্রিম লাবণ্য আবৃত হ'য়ে যাবে ব'লে কবির দুঃখ—

চন্দনে ধবল ন করু
হিমে বুড়ি জাএত সুমেরু ॥
(বিদ্যাপতি)

রাধা কিন্তু শুধু চন্দনচর্চা ক'রেই ক্ষান্ত হন না। জ্যোৎস্নায় অদৃশ্য থাকার অভিপ্রায়ে তিনি চন্দনচর্চিত কুচের ওপর শ্বেত মোতির হার পরেন—

হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার।
চন্দন চরচিত রুচির কপুর।
... ...

---

১. ৬৯৮

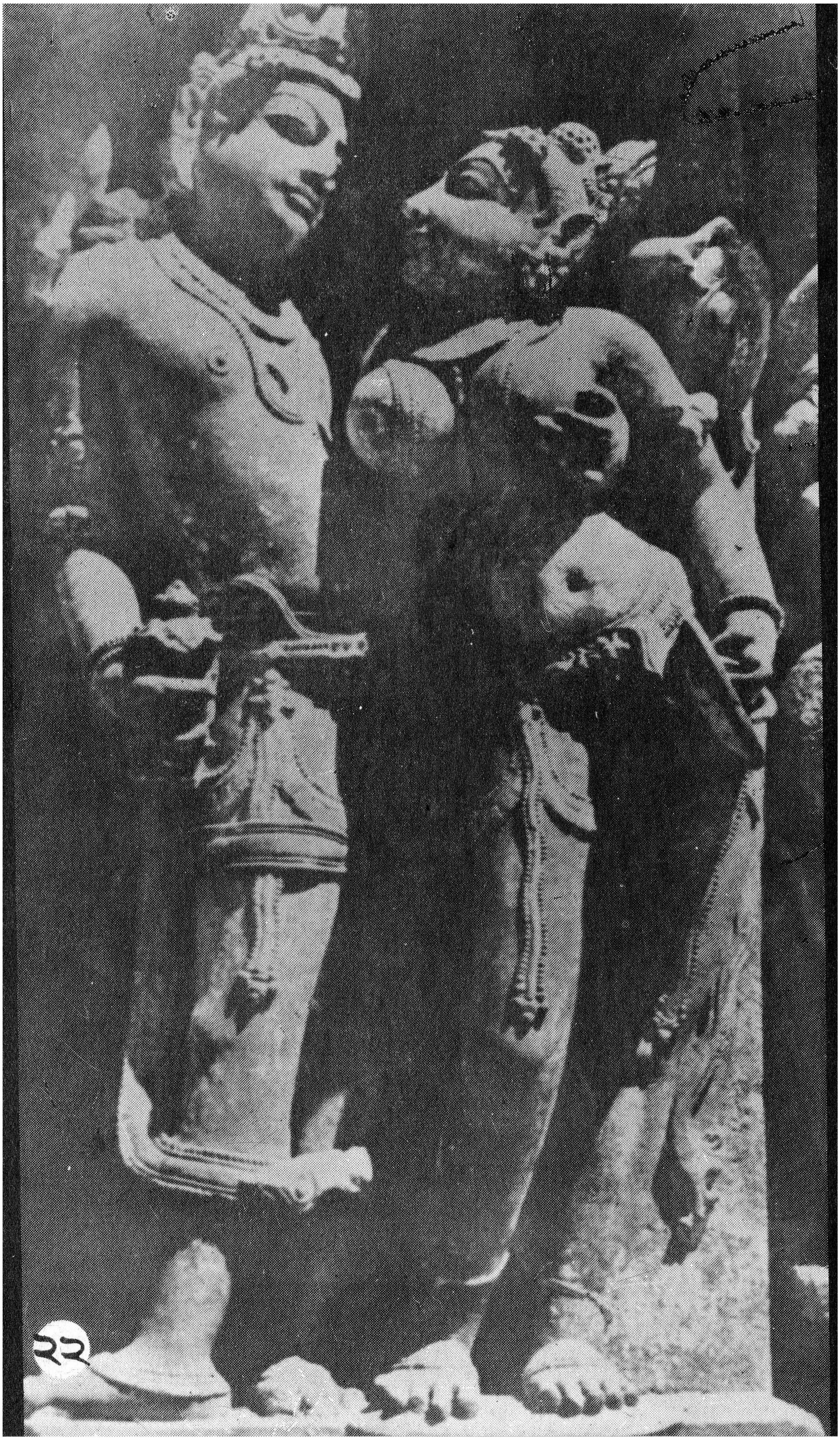
२२

চান্দনি রজনী উজোরলি গোরী।
হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরি।।
(গোবিন্দদাস)

(খ) তামসাভিসারিকা—তামসাভিসারিকা রাধা তমসাচ্ছন্ন রাতে অভিসারযাত্রার প্রাক্কালে কুচে শ্বেচন্দনচর্চা করেন না প্রকাশিত হবার ভয়ে—তখন তিনি কুচপ্রসাধন করেন নীল কস্তুরীতে—

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
(গোবিন্দদাস)

কালো রাত্রি-যমুনা সাঁতরে পার হবার জন্য কুচকে ভেলা করেন তিনি—"দুঃসহ যমুনা নদী কুচযুগলকে ভেলা করিয়া ভাগ্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম।"
(বিদ্যাপতি)

(গ) বর্ষাভিসারিকা—বর্ষাভিসারকালে বৃষ্টি-আলিঙ্গনে প্রতিবন্ধক মনে করেন রাধা মোতিহারকে। তাই তিনি তা পরিধানে বিরত হন। বরং নীল মৃগমদে কুচসজ্জা করতে এবং নীল বসন পরতেই তখন তাঁর আনন্দ—

অম্বরে ডমরু ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ।।

. . . .

মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহিঁ পহিরায়হ নীল নিচোল।।

কী যশ উচ কুচ কঞ্চুকভার।
দূরে কর সোতিনী মোতিম হার।।
(গাবিন্দদাস)

(ঘ) দিবাভিসারিকা—সূর্যের খরতাপে পথযাত্রা যখন ক্লেশদায়ক—তখন কুচযুগ রাধার কাছে ভার মনে হয়—

তপনক তাপে কিয়ে চলই না পার।
গুরুয়া নিতম্ব পীন কুচযুগ ভার।।
(রায় শেখর)

ঘর্মাক্ত রাধা কুঞ্জে উপস্থিত হ'লে কৃষ্ণ তাঁর সেবা করেন। রাধার কুচের তাপ এবং মালিন্য তিনি মোচন করেন শীতল চন্দন লেপন ক'রে---

দিনমনি-কিরণে মলিন মুখমণ্ডল
ঘামে তিলক বহি গেলা।
কোমল চরণ তপত পথ-বালুক
আতপ দহন সম ভেলা।।
হেরইতে শ্যামর চন্দ।
কোরে আগরি গোরী মুখ মুছত
বসন ঢুলায়ত মন্দ।।
কর্পূর তাম্বুল অধরহি দেয়ল
চন্দ লেপই অঙ্গে।
শ্যামের অঙ্গ পরশে নব নাগরী
বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গে।। (গোবিন্দদাস)

(ছ) উন্মত্তাভিসারিকা - নায়কের বংশীধ্বনি শ্রবণে উদ্বেলহৃদয় এক উন্মত্তাসারিকাকে দেখা যায় বেশভূষা, পরিচ্ছদাদির প্রতি দৃকপাতের তাঁর সময় নেই---

ধম্মিলোপরি নীলরত্ন খচিতোহারস্তয়ারোপিতো,
বিন্যস্ত কুচকুম্ভয়োঃ কুবলয় শ্রেণী কৃতো গর্ভকঃ।
অঙ্গে চর্চিচত মঞ্জুলং বিনিহিতা কস্তুরিকা নেত্রয়োঃ
কংসারেরভিসার সম্ভ্রম ভরান্মন্যে জগদ্বিস্মৃমতম্।[১]
(শ্রীরূপ)

বংশীস্বর এই অভিসারিকাকে এতই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ক'রে তুলেছে যে, কণ্ঠের নীলমনিরচিত হার তিনি খোঁপায় পরেছেন আর কেশে ধারণোপযোগী নীলপদ্মরচিত মাল্য স্থাপন করেছেন বক্ষে। সর্বাঙ্গে লেপন করেছেন কজ্জ্বল আর নয়নে লেপন করেছেন কস্তুরী।

(২) বাসকসজ্জিকার কুচরূপ---

(চ) চকিতা (নিজাঙ্গছায়ায় কৃষ্ণভ্রমত্রস্তা)---চিত্তচাঞ্চলের কারণে অদ্ভুত আচরণ চকিতার—কিশলয়শয্যা বারবার নতুন করে পাতে, রত্নপ্রদীপ নেভায়

১. [বিদগ্ধমাধব]

জ্বালে, তাম্বুল কর্পূর নিয়ে পুনরায় রাখে, কুচচর্চার জন্য চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুম গ্রহণ আবার পরিত্যাগ করে—

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জবনে ধনী সাজয়ে
পুনঃ পুনঃ উঠয়ে চকিত॥

... ...

মলয়জ চন্দন, মৃগমদ কুঙ্কুম,
লেই পুন তেজই তাই।
সচকিত নয়নে নেহারই দশদিশ
কাতরে সখী মুখ চাই।
(জ্ঞানদাস)

(৩) উৎকণ্ঠিতার কুচরূপ—

(ঘ) উচ্চকিতা (পত্র-পতনে, পক্ষীর পক্ষ-সঞ্চালনে কান্ত আসছেন এই আশায় চকিতা)—কদম্ববনে ঘন ঘন সঙ্কেতধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন ব'লে রাধার ভ্রম হচ্ছে—বামার বাম পয়োধর তাই স্ফুরিত হচ্ছে—

ঘন ঘন নীপ সমীপহিঁ শুনিয়ে
সঙ্কেত মুরলী নিসান।
রহি রহি বাম পয়োধর ফুরই
তেঁই বুঝি মিলব কান॥
(গোবিন্দদাস)

(৫) খণ্ডিতার কুচরূপ—

(ক) নিন্দা (কান্তকে নিন্দাকারিণী)—মাধব কোনো কামিনীর সঙ্গে কেলিকলাকুতূহলে নিশিযাপন করেছেন, অতএব ব্যর্থ হ'য়েছে প্রতীক্ষাকাতরা রাধার ভূষণসজ্জা, কুচে চন্দনচর্চা—রাধা তাই মাধবের নিন্দা করেছেন—

তাড় হার ঘনসার (চন্দন) সকলি হ'ল অসার
মরিতেছি পুড়িয়া পুড়িয়া।

মাধব কামিনী সনে কেলি লাগে মোর মনে
যথা চাঁদ কুমুদিনী সনে।
আছে প্রভু দূরে দূরে, বুঝ নাহি কি অন্তরে
মোর কী আনন্দ দরশনে।
(বিদ্যাপতি)

রাধার নিন্দার উত্তরে কৃষ্ণ বলেন—"তোমার স্তন স্বুবর্ণ ঘট, হার ভুজঙ্গিনী স্বরূপ। আমি উহার উপর হাত রাখিতেছি, যদি তোমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিয়া থাকি, তবে যেন ঐ হার-নাগিনী আমাকে কাটে।"[১] (বিদ্যাপতি)।

(খ) ক্রোধা (অনুনয়রত কান্তকে তিরস্কারকারিণী)—রাত জাগলেন রাধা অথচ কৃষ্ণের চোখ অরুণবর্ণ। অন্য রমনীর নখচিহ্ন কৃষ্ণের বুকে অথচ রাধার মনে হয় তাঁর নিজের বুক যেন নখের ক্ষতে রক্তাক্ত। তাই কৃষ্ণকে তিনি তিরস্কার করেন—

নখর হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি।।
(গোবিন্দদাস)

তিরস্কৃত কৃষ্ণের উক্ত---"আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে যে শাস্তি উচিত বিবেচনা হয় দাও। ভুজপাশে বাঁধিয়া জঘন দ্বারা তাড়ণ কর, বুকের উপর পয়োধর-রূপ পাথর চাপাইয়া দাও, হৃদয়ের কারাগারে দিবারাত্রি বাঁধিয়া রাখ।"[২]

(বিদ্যাপতি)

(ঙ) মধ্যা (অন্যা নায়িকার সম্ভোগ-চিহ্নে লজ্জান্বিতা)—লজ্জিতা রাধা কুচ আবৃত করেছেন ব'লে কৃষ্ণ বলেন—"শরতের চন্দ্রতুল্য বদন বস্ত্র দ্বারা কেন ঢাঁকিতেছ? অল্প হাস্য-স্বুধারস বর্ষণ করিলে নয়নের পিপাসা মিটিবে।... স্বর্ণের স্বুন্দর শ্রীফল কাটিয়া অর্ধেক করিয়া কুচযুগল গঠন করিয়াছ। স্বুন্দরি! আমার পাণিস্পর্শে রস-অনুভব বাসনায় বাধা দিওনা।"[৩]
(বিদ্যাপতি)

১. ৬৪৭
২. ৬৪৭
৩. ১৩৭

(চ) মুগ্ধা (রোষবাষ্পমৌনা)—রোষবাষ্পমৌনা রাধাকে সখী উপদেশ দিচ্ছে—

হরকোপানলে মদন দহন ভেল
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান কানু মুখ হেরহ
(জ্ঞানদাস)

রাধার কুচ-হরের কোপে কামদেব মদন ভস্মীভূত হ'য়ে যাচ্ছে দেখে ব্যাকুল সখী মান পরিত্যাগের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে।

(ছ) কম্পিতা (অমর্ষবশে রোদনপরায়না)—"মাধব বল, কেন রমণীকে রাগাইলে? তাহার গৌরবর্ণ কলেবর (ও) মুখচন্দ্র রোষে অন্যশোভা হইল; কাম যেন রূপ দেখিবার ছলে কনকলতায় (দেহে) নব রক্তোৎপল দিল। নয়নের অশ্রুধারা ছিন্ন হারের ন্যায় কুচপর্বতের উপর আছাড়িয়া পড়িল। কনককলস করিয়া মদন অমৃত পূর্ণ করিল, অধিক কি উথলিয়া পড়িল?[১]
(বিদ্যাপতি)

খণ্ডিতার দেহ রোষকঠিন ব'লে তার পয়োধর ও কাঠিন্য লাভ করেছে। অশ্রুর ছিন্নহার তাই কুচপর্বতের ওপর আছড়ে পড়েছে। নায়িকা বিরহিনী হ'লে এই কঠিনতার চেতনা আসতো না। তখন অশ্রু আছড়ে না প'ড়ে গলে পড়তো। খণ্ডিতার কঠিন উন্নত বুকে আত্মদংশনের নিরুপায় অশ্রু ঝরছে। হঠাৎ মনে হলো, বুকের অমৃতপাত্র উথলে উঠছে। দীর্ঘশ্বাসে নায়িকার হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে ব'লেই এমন হয়েছে।

(জ) সন্তপ্তা (কান্তের অঙ্গে ভোগ-চিহ্ন দর্শনে তাপযুক্তা)—

সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই।
তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন্ ঠাঁই।
কেমন বেনাল চূড়া শ্রবণে দুলিছে
মেলিতে নার দুটি আঁখি।
হবনা মথুরাগতি কি কব চূড়ার ভাতি
শ্যাম অঙ্গে লাগিয়াছে সাখি।

১. ৪১১

কুঙ্কুম কস্তুরী আর স্থগন্ধি তাম্বুল
থুইয়াছিনু শিয়র উপরে।
হা হরি হা হরি করি জাগিয়া পোহানু নিশি
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে।
শেখ ভিখনে ভণে বড় দুঃখ রাইয়ের মনে
পাসরিলে পূরব পিরীতি,
আমার করম দোষে তুমি থাক অন্যপাশে
হোক মনে রাধার মিনতি। (শেখভিখন)

উপরের উদ্ধৃতিতে দেখা গেল তাপথুক্তা রাধা 'হা হরি' 'হা হরি' ক'রে রাত কাটিয়েছেন ব'লে কুচে কুমকুম কস্তুরীপ্রসাধন আর হ'য়ে ওঠেনি।

(৬) কলহান্তরিতার কুচরূপ----

(ঘ) অধীরা (সখী তিরস্কৃতা)---অপরাধক্ষালনের অনেক চেষ্টা ক'রে, অনেক অনুনয় বিনয় স্তুতি ক'রে এমনকি 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' ব'লেও যখন কৃষ্ণ রাধার মানভঞ্জনে ব্যর্থ হলেন—সখীদের সুপারিশ নিষ্ফল হ'লো---তখন ভগ্নহৃদয়ে ফিরে গেলেন কৃষ্ণ। ক্ষুব্ধা সখী তখন কলহান্তরিতা রাধাকে তিরস্কার করছে---"কাম কৃত্রিম কনকাচল আনিয়া দুইটি করিয়া তোমার বক্ষস্থলে বসাইয়া দিয়াছে। বোধ হয় সেই পাপের (কনকাচলকে ভাগ করার পাপের) শাস্তিস্বরূপ তোমার কটিদেশ ক্ষীণ, সেইজন্য হংসের লঘুগতি অপেক্ষা তোমার গতি হীন।"[১] (বিদ্যাপতি)। পাপ করলো মদন আর তার শাস্তিস্বরূপ রাধার বুকে বসানো হলো পাহাড়। আসলে তিরস্কারের ছলে সখী বোঝাতে চাইছে রাধার কুচদ্বয় কত সুন্দর ও উন্নত।

(ঙ) কুপিতা (কান্তের মিথ্যা ভাষণ স্মরণে কোপযুক্তা)—কৃষ্ণ গতরজনীর ভোগচিহ্নগুলো অস্বীকারের উদ্দেশ্যে যখন মিথ্যা কৈফিয়ৎ রচনা ক'রে চলছিলেন, তখন রাধা কোপ প্রকাশ করছিলেন। কুপিতা রাধাকে সখীরা তখন উপদেশ দিচ্ছিলেন---

১. ৩৯৫

"কাঞ্চনকলস সমান কুচযুগল দান কর।"[১] (বিদ্যাপতি)
"বিরহসিন্ধুতে ডুবন্ত কৃষ্ণকে কুচভেলা দান করিয়া রক্ষা কর।"[২]
(বিদ্যাপতি)

(৭) প্রোষিতভর্তৃকার কুচরূপ---

(গ) ভূত (কান্ত মথুরায়)---প্রিয়তমের হাত কুচদুটিকে মিলিত চক্রবাক-যুগলের ন্যায় সংলগ্ন রাখতো। প্রিয়তম এখন প্রবাসে। তাই কুচদ্বয় নিশীথের বিচ্ছিন্ন চক্রবাকদম্পতির মত পরস্পরবিচ্ছিন্ন, বিরহখিন্ন----

ন জানল কতিখন তেজি গেলরে
বিছুরল চকেবা জোর।
(বিদ্যাপতি)

(ঘ) দশদশা ([অ] চিন্তা, [আ] জাগরণ, [ই] উদ্বেগ, [ঈ] কৃশতা, [উ] জড়তা, [ঊ] প্রলাপ, [এ] ব্যাধি, [ঐ] উন্মাদ, [ও] মোহ, [ঔ] মৃত্যু)----

[অ] চিন্তা---চীর চন্দন হার উরে ন দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা।। (বিদ্যাপতি)

[আ] জাগরণ---উঠি বসি নিশি রহোঁ জাগি।
. . . .
মৃগমদ সৌরভ চন্দন পরিমল
পিয়া বিনে সকলি সন্তাপে।।
(ফতে খান)
হামো কূলবিহিণী তুয়া নাম গুণি গুণি
রহলুঁ যামিনী বর জাগি।
এ নব যৌবনভার সহিমু কতেক আর
সতত দহএ মন আগি।।
এ চুয়া চন্দন মোহে গরল সে উগরে
তুয়া বিনে আর নাহি জাগে।
(হীন মনোহর)

---

১. ৪৩৯
২. ৬৬৪

[ই] উদ্বেগ---না জানি কি হৈল কি দিয়া কি কৈল
না জানি নসিবে আছে কি।
... ...
চন্দন আগর শীতল মন্দির
কিছু না লাগাও অঙ্গে।
(আলাওল)

[ঈ] কৃশতা---উচ কুচ উপর রহত মুখ মণ্ডলে
সো এক অপরূপ ভাতি।
কনয়া—শিখরে জনু উয়ল শশধর
প্রাতর ধূসর কাঁতি।।
(বৈষ্ণব কবি)

[উ] জড়তা---"তাহার অঙ্গে মলিন বসন ও করতলে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বাইতেছে। বক্ষে কৃষ্ণবেণী পড়িয়াছে, যেন কমলকোষে কৃষ্ণসর্পিনী রহিয়াছে। কোনো সখী নিঃশ্বাস বহিতেছে কিনা দেখে, কেহ নলিনীদল বাতাস করে। কেহ বলে হরি আসিল; তখনই তোমার নাম স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে।"[১] (বিদ্যাপতি)

[ঐ] উন্মাদ---অলি হে, না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি।।
পুর-রঙ্গিনী কুচ- কুঙ্কুম-রঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বনমাল।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল।।
(জ্ঞানদাস)

[ঔ] মৃত্যু (পদাবলীতে মূর্চ্ছাই মৃত্যু)—
নমিত অলকে বেঢ়লা
মুখ-কমল শোভে।

১. ২৬৫

রাহুক বাহু পরশলা
　　　　শশী মণ্ডল লোভে ॥
মদনশরে মুরছলী
　　　　চির চেতন বালা ।
দেখিল সে ধনীহে
　　　　বাসি মালতী মালা ॥
কলস কুচ লোটাইলী
　　　　ঘন সামরি বেনী ।
কনয়াপর সূতলী
　　　　জনি কারি নাগিনী ॥　　(বিদ্যাপতি)

(ঙ) দূত সংবাদ (উদ্ধবাদি মুখে)—

"নয়নের অশ্রুতে তটিনী নির্মিত, কমলমুখী তাহাতে স্নান করিতেছে। মাধব, তোমার রাই যদি একবার তোমার রূপ নয়ন ভরিয়া পান করে, বাঁচিবে। মুক্তকবরী উল্টাইয়া বক্ষে পড়িতেছে, যেন স্বর্ণ-গিরিতে চামর ধরিয়াছে।"[১]

(বিদ্যাপতি)

"মাধব বিরহিণী বামাকে দেখিলাম। অধরে হাসি নাই, সখীসঙ্গে বিলাস নাই, অহর্নিশ তোমার নাম জপ করিতেছে।... বক্ষের হার ভার হইল... চন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুম মুছিয়া ফেলিল, সমস্ত তোমার জন্য ত্যাগ করিল; যেন জলহীন মীনের মত ফিরিতেছে,"[২]

(বিদ্যাপতি)

—উপরোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ে লক্ষ্য করা গেল, কৃষ্ণসমক্ষে বিরহিনী রাধার দুঃখ-গভীরতা চিত্রে উন্মোচিত ক'রেছে উদ্ধবাদি দূতেরা।

(চ) বিলাপা (বিলাপপরায়ণা)—

কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কতদিনে ঘুচব গরুয় দুখভার॥
..　　...　　...

১. ৭৪৭
২. ২১৬

কতদিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহু পয়োধরে দেয়ব হাত।।

(বিদ্যাপতি)

(ছ) সখ্যুক্তিকা (যার সখী কান্তের নিকট গিয়ে বিরহবেদনা নিবেদন করেন)—

"সোনার পাহাড় যেন পুড়াইয়া গেল। মাধব, সুন্দরীর নয়নজল যেন পীন পয়োধরে নির্ঝর রচনা করিল।"[১] (বিদ্যাপতি)। রাধার বিরহজর্জর হৃদয়ের আগুনে সুবর্ণময় কুচপর্বত যেন অগ্নিদগ্ধ। অবিরল নয়নধারা সেই ভস্মীভূত পর্বতে নির্ঝর রচনা করেছে। বিরহের যন্ত্রনা এবং বেদনা রাধার কুচদ্বয়কে কি বেদনাময় রূপদান করেছে, প্রবাসী কৃষ্ণের নিকট সখী তার যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন।

(জ) ভাবোল্লাসা (ভাব-সম্মিলনে উল্লসিতা)—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে।।
. . . .
আলপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার।।

(বিদ্যাপতি)

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পলটি চলব হম ঈষত হসিয়া।।
আবেসে আঁচরে পিয়া ধরবে।
যাওব হম যতন বহু করবে।।
কঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বাধব কুটিল আধ দিঠিয়া।।

(বিদ্যাপতি)

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।

(বিদ্যাপতি)

---

১. ৫৪১

কৃষ্ণ-মিলন-কল্পনায় মগ্ন বিরহিনী ভাবছেন নিজদেহকে বেদী করবেন প্রিয়-অধিষ্ঠানের জন্য—কুচদ্বয়কে করবেন মঙ্গলকলস। অঙ্গনে যখন প্রিয় আসবেন ঈষৎ হেসে তিনি পলায়নপর হবেন—আবেশে প্রিয় যখন আঁচল ধরবেন—উৎফুল্ল রাধা তখন কটাক্ষক্ষেপন করবেন। পরম মমত্বময় প্রযত্নে প্রত্যাগত প্রিয়কে তিনি কুচবিলেপনের কস্তুরী করবেন, করবেন গ্রীবার মুক্তামালিকা, দেহের এবং গৃহের সর্বস্ব।

৮. স্বাধীনভর্তৃকার কুচরূপ—

(ক) কোপনা (বিলাসে বাহ্য রোষযুক্তা)----

"হরি হার ধরিল, রাধা চমকিয়া উঠিল, অর্ধ হার মাধবের হস্তে, অর্ধ কণ্ঠে, ধনী কপট কোপে দৃষ্টি ফিরাইল।" (বিদ্যাপতি)। হরি কুচে স্থাপিত হার ধরাতেই রাধার এই চমকে ওঠা এবং তার তাৎপর্য অনুধাবন করেই রাধার এই কপট কোপ। কোপনার কুচের প্রতি কবির এখানে তীর্যক অবলোকন।

(গ) মুগ্ধা (নায়ক যাহার বেশবিন্যাসাদি করেন)—

বস্ত্র অপসারণের পর আবার রাধাদেহে মাধব যখন বস্ত্র আরোপ করছেন—সে সময়েও মুগ্ধার কুচের প্রতি কবির গোপন অবলোকন—" সে (কৃষ্ণ) আবার বিধস্তাকে বস্ত্র দিল, লজ্জায় তাহার হৃদয়ে মুখ লুকাইলাম।" (বিদ্যাপতি)

(চ) সোল্লাসা (কান্তের ব্যবহারে উল্লসিতা)—

"তাহার (হরির) করে কুচমণ্ডল লুকাইয়া রহিল। মনে হয় যেন কমল কনকগিরিকে ঝাঁপিয়া রাখিল।"[১] পদ্মফুল কি পাহাড়কে আবৃত করতে পারে? বিদ্যাপতি তা-ই করেছেন। রাধার দুটি সুকঠিন কুচপাহাড়কে হরির পুলকব্যাকুল দুটি করপদ্ম ঢেঁকে রেখেছে—স্বাধীনভর্তৃকার কুচের বড় অপরূপ চিত্রই এঁকেছেন কবি। রাধার সমস্ত শরীর ভাবভরে অস্থির—এই উল্লাস তিনি আর গোপন রাখতে পারেননা।—"একাকিনী আমি হার গাঁথিতেছিলাম, আমার

---

১. ৫৬৬

বুকের কাপড় স্রস্ত হইয়া খসিয়া পড়িল। তখন সহসা কান্ত আসিলেন, কুচ ঢাকিব কি নীবিবন্ধনও খুলিয়া গেল।. . . সমস্ত শরীর ভাবভরে অস্থির হইল, কত যত্ন করিয়া তাহাকে স্থির রাখি বলতো? ব্যস্ত হইয়া আমার কুচ চাপিয়া ধরিল; সকল শরীরে কত শোভা পাইল। তখনকার উল্লাস গোপন করিতে পারিনা। মুদিত কমলে (নয়ন কমলে) হাসি ব্যক্ত হইল।"[১]

(বিদ্যাপতি)

(ছ) অনুকূলা (নায়ক যাহার অনুকূল)—"শ্রীকৃষ্ণ রাধার বাহুযুগলে সংযমিত, পয়োধরভারে পীড়িত, নখে ক্ষতযুক্ত, দংশনে দংশিত, শ্রোণীতটে আহত, হস্তদ্বারা কেশে আকর্ষিত এবং অধর সুধাপানে সম্মোহিত হইয়াও আনন্দিত হইলেন।"

(বিদ্যাপতি)

(জ) অভিষিক্তা (অভিষেকপূর্বক নায়ক যাহাকে চামর ব্যজনাদি করেন)—কেলিক্লান্তা স্বাধীনভর্তৃকার কুচগাত্র থেকে শ্রমজল মুছে তাকে কোলে আগলিয়ে বীজন করেছেন শ্রীকৃষ্ণ—"সেই রসিকবর আমাকে কোলে আগলাইয়া আঁচলে আমার শ্রমজল মুছাইল, তারপর মৃদু বীজন করিতে আমি নিদ্রিত হইলাম।"

(বিদ্যাপতি)।

ব্যক্তিত্ব আরোপের পর:

প্রকৃতি-রমণী—হায় কবি হায়, সে হ'তে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের ওপর আঁচল দিয়েছে টানি।

(রবীন্দ্রনাথ)

ধরিত্রী-রমণী—(১) আমরা সবাই ভাই
ধরণীর কোলে জন্ম নিয়েছি স্তন্য তাহারি খাই;[২]
(কাপলর / অনুবাদ: সত্যেন দত্ত)

---

১. ৪৮৪
২. [কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী]

(২) ধরিত্রী পরম ধৈর্যে কত দীর্ঘ দিবস শর্বরী
রস-স্তন্যে বৃক্ষ বক্ষ সরসিয়া সুশ্যামল করি
যত পুষ্পে দিল উপহার
তুষিতে যাদেরে—তারা রাখিল কি সন্ধান তাহার?[১]
(সুফিয়া কামাল)

দেশ-রমণী— চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযুষস্তন্যবাহিনী।[২]
(রবীন্দ্রনাথ)

ধূলি-রমণী— অয়ি ধূলি, অয়ি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা,
সকলের নিম্নে থাক নীচতম জনে
বক্ষে বাঁধিবার তরে;
. . . .
হে আত্মবিস্মৃতা, বিশ্বচরণবিলীনা,
বিস্মৃতেরে ঢেকে রাখ অঞ্চল-বসনে।
নূতনেরে নির্বিচারে কোলে লহ তুলি,
পুরাতনে ধক্ষে ধর হে জননী ধূলি।[৩]
(রবীন্দ্রনাথ)

অরণ্য-নারী—বনবধূ উচাটন
মদন পীড়ায়
তার কামনার হরষণে ডালিম ডাঁশায়।[৪]
(নজরুল)

সমুদ্র-রমণী—তোমার মাঝারে ঠাঁই নিল কত অজানা সে চোরাবালি,
তা'তে যে, রচিল গিরি

১. 'সে কি কভু জানে'
২. 'ভারতলক্ষ্মী'
৩. 'ধুলি'
৪. 'মানবী প্রলাপ' [সিন্ধু হিন্দোল]

জননীর মতো স্নেহের সলিলে রেখেছো তাহারে ঘিরি।
তোমার বুকের পিযুষ সেঁচিয়া শ্যাম শোভা দিয়ে তারে
করেছো শ্যামল করেছো প্রকাশ, ঢাকিয়াছো আপনারে।[১]
(সুফিয়া কামাল)

হ্রদ-রমণী—রূপোলি জল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে।[২]
(বুদ্ধদেব বসু)

নদী-নারী—জাহ্নবী সাগর সহ কেলি করি অহরহ
করিতেছে সতীত্ব বিনাশ।
কামিনী হৃদয়োপর কুচরূপ ধরি হর
করে তাই প্রকোপ প্রকাশ।।[৩]
(ঈশ্বর গুপ্ত)

সরসী-রমণী— বহু বনগন্ধ বহে
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।[৪]
(রবীন্দ্রনাথ)

শুক্তি-বধূ—কখন আনিবে জয় করি'—কবে সে আসিবে তব প্রিয়া
সেই আশা নিয়া
মুক্তা-বুকে মালা রচি' নীচে
তোমার হেরেম-বাঁদি শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে।[৫]
(নজরুল)

---

১. 'স্বপন সায়র'
২. 'চিল্কায় সকাল' [বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৩. 'শীতের অত্যাচার'
৪. 'বিজয়িনী' (চিত্রা)
৫. 'সিন্ধু'

অন্ধকার-রমণী—অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি।

(জীবনানন্দ দাস)

সন্ধ্যা-বধূ—সন্ধ্যা নামছে ধীরে ভারী তার পয়োধর মেলে;[১]

(মুহম্মদ নূরুল হুদা)

রাত্রি-রমণী—(১) শুভ্র সুকোমল
মোহভরা নিদ্রাভরা করপদ্মদল
আমরা সর্বাঙ্গে মনে দাও বুলাইয়া
বিভাবরী সর্ব ব্যথা দাও ভুলাইয়া।
... ...
বক্ষ হ'তে লহ টানি
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি
শুভ্র ভাল, আঁখি হতে লহ অপসরি
উন্মুক্ত অলক।[২]

(রবীন্দ্রনাথ)

(২) রাত্রি, প্রেয়সী আমার, প্রসন্ন হও, নিদ্রা দিয়ো না।
... ...
... ... দুই হাতে ছেনেছি তোমার অন্ধকার,
উঠেছি তার ধাপে ধাপে বেয়ে, নেমেছি তার আনন্দময়
ঢালু দিয়ে গড়িয়ে, তার নরম রোমশ অফুরন্ত ভাঁজেভাঁজে
জড়িয়ে গিয়েছি,[৩]

(বুদ্ধদেব বসু)

(৩) কিছুই খাবোনা আজ, যে কোনো আহার্যে ভয়ানক অরুচি আমার।
কাল সারারাত আমি তারাস্রোত আর এক একক অন্ধকার
আকণ্ঠ করেছি পান, রাত্রিকে নিয়েছি শুষে;
আজ আমাকে বিরক্ত করবার কোনো মানে নেই, দ্যাখো

---

১. 'প্রত্যাবর্তনের অভিষেক'
২. 'জ্যোৎস্নারাত্রে' [চিত্রা]
৩. 'রাত্রি' [বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা]

স্বস্তিতে কোথাও ব'সে থাকা দায়। একটি রাত্তির
স্মৃতিতে কেবলি দিচ্ছে হানা, যে সৌন্দর্য চেতনাকে
নিমেষে ঝলসে দেয়, তাকে পান করে সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হয়েছিলো
মনে পড়ে। মনে পড়ে কার শরীরের স্মিত অববাহিকায়
চাঁদ উঠেছিলো, আমি কিরণ করেছি পান কাল সারারাত।[১]

(শামসুর রাহমান)

চাঁদ-রমণী—রিরংসায় মেতে আছে গর্ভবতী চাঁদ,
মেঘের চাদর গায়ে দিয়ে,
হাতের আঙ্গুলে জড়ানো তারার বোতাম,
তাই, বিলাসী মুহূর্তে চাঁদ-নটি,
বুকের মাংস ভাসিয়ে দিচ্ছে হাওয়ার
কৃপণ পরীরে, এখন রাত দুপুর।[২]

(মাকিদ হায়দার)

বর্ষা-রমণী—স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী বর্ণা এসো মালবিকা।
অর্জুন মঞ্জরী কর্ণে গলে নীপ-মালিকা
মালবিকা ।।
ক্ষীণা তন্বী জল জল-ভার-নমিতা,[৩]

(নজরুল)

মেঘ-কন্যা—সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে,
অস্তরবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়াল্লে।
মেঘের বুকে কিরণ-নারী পিচকারি হানে,
রামধনুকের রঙীন মায়া ছড়ায় বিমানে;[৪]

(সত্যেন দত্ত)

স্মৃতি-রমণী—সিক্ত করে স্মৃতির স্তনের বৃন্ত—দুধের ফোঁটায়।[৫]

(বুদ্ধদেব বসু)

---

১. 'হাও ওভার' ('উত্তরাধিকার', কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮২)
২. 'মেঘের চাদর'
৩. (নজরুল সংগীত)
৪. 'দার্জিলিঙের চিঠি'
৫. 'দার্জিলিঙের চিঠি'

পরাণ-বধূ—আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলন খেলা
নিশীথবেলা ।।

. . . .

আয়রে ঝঞ্ঝা পরাণ-বধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠণ বসন খোল।
দে দোল দোল
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে ভাবে বিভোল
দে দোল দোল।।[১]

(রবীন্দ্রনাথ)

কাব্য-রমণী— অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
করো রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘেরে।[২]

(রবীন্দ্রনাথ)

কবিতা-রমণী—জীবনানন্দের জন্যে চকিতে করেছো উন্মোচন
করুণ শঙ্খের মতো স্তন[৩]

(শামসুর রাহমান)

ছন্দ-রমনী—গায়ত্রীর মতো নারী শুয়ে আছে, বিশাল জঘন মেলে,
পর্ব ভেঙে ইশারায় আমাকে উপুড় হতে বলে
আমি তার শরীর বিস্তৃত করি, দুই বক্ষোদেশ ছিঁড়ে ক্রমশ পয়ারে
নিয়ে আসি, উরুদ্বয়ে কিছু কথা অশ্লীলতা মিশিয়ে চকিতে
খুলে ফেলি আরবের অলঙ্কার, যদিও নিশ্চিত
কাঙাল কুকুর হয়ে মাঝে মাঝে আমি বড় মিলনপ্রত্যাশী।[৪]

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

---

১. 'ঝুলনলীলা' [সোনার তরী]
২. 'ক্ষতিপূরণ' [ক্ষণিকা]
৩. 'ফিরে যাও'
৪. 'সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

মানুষের মুখে যেমন বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয়, কবিরা কুচে তেমনই বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রতিফলন দেখেছেন। কুচের লজ্জারুণ রূপ দেখেছেন কবি--- (বাল পয়োধর বদন সহোদর / অনুমাপিয় অনুরাগে—বিদ্যাপতি)। বয়ঃসন্ধির নায়িকার লজ্জামেশানো নবীন অনুরাগ যেমন তার মুখকে রক্তিম ক'রে তুলেছে—তেমনি তার কুচযুগকেও। কুচের চরম লজ্জাহীন রূপ দেখেছেন কবি---("উলটাইয়া পড়া কুচযুগের উপর বিলম্বিত হার দুলিতেছে; যেন কনককলস দুগ্ধধারা বমন করিতেছে।"[১] —বিদ্যাপতি)। পদটি বিপরীত বিহারের---রমণী যখন পুরুষের বক্ষারোহী এবং সক্রিয়। কুচ এই সময়ে নির্লজ্জ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পুলকরস উদ্‌গীরণ করছে। কবি যেমন দেখেছেন কুচের পুলকশিহরিত রূপ (পরশসুখে শ্যামার বুকে কদম্ব শিহরে।[২]—নজরুল), তেমনি দেখেছেন তার ম্লান বিষণ্ণ রূপ ("সোনার পাহাড় যেন পুড়াইয়া গেল"।[৩]—বিদ্যাপতি)। কুচের ভয়কুণ্ঠিত রূপ কবি দেখেছেন ("অপূর্ব কমলতুল্য কুচ বিকশিত নহে, কারণ সম্মুখে মুখরূপ চন্দ্র রহিয়াছে"[৪]—বিদ্যাপতি), দেখেছেন তার ভয়হীন রূপ (অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল—বড়ু চণ্ডীদাস), ভয়াল রূপ (নটির মুদ্রার

---

১. ৬৯৮

২. 'ঝড়ঃ পূর্বতরঙ্গ' [পূবের হাওয়া]

৩. ৫৪১

৪. ৫

মত মন আর স্তন,/অশ্লীল আরব্ধ বিষ তুলেছে ফনায়[১]---আল মাহমুদ)। কবি দেখেছেন কুচের অত্যাচারীরূপ (এ সখি তুহু অতি নিকরুণ দেহ/ হিয় চক্রীকুচ ভর দেই মরদলি / শিরীষ-কুসুম তনু এহ। ---বলরাম দাস), ঘাতক রূপ (সফেদ স্তনের পীনোন্নত চূড়ায় বেঁধা/শহীদ প্রেমিক কাৎরে ওঠে.[২] — শহীদ কাদরী), যোদ্ধারূপ. (কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর/ সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে।---বড়ু চণ্ডীদাস), দেখেছেন কুচের ক্রীড়াশীল রূপ (গজমুক্তাহার তার অধত নামিয়া/ চুলনী খেলাএ সুখে গজকুম্ভ দিয়া। ---দোনা গাজী), আশান্বিত রূপ (আধ লুকায়লি আধ উদাস/ কুচকুম্ভ কহি গেল অপনক আস---বিদ্যাপতি), ধ্যানগম্ভীর রূপ ("শম্ভু যেন সমাধিস্থ হইয়া মুখ নীচু করিয়া রহিয়াছে"[৩] ---বিদ্যাপতি), জাগ্রত রূপ (বক্ষের দুইটি বৃন্ত / হৃদয়ের দুটি চোখ যেন-- / একটি আশ্লেষ নিয়ে তরঙ্গিত নীলাম্বরে চেয়ে /[৪] --সৈয়দ আলী আহসান), নিদ্রিত রূপ (হেম কমলন জনি অরুণিত চঞ্চল/মিহির-তর নিন্দ গেলা ।। ---বিদ্যাপতি)।

এবার আমি কুচের ক্ষুদ্রতা-বিশালতা, নীচুতা-উচ্চতা, ওজন, গঠন, বর্ণ, মূল্য, স্থান ইত্যাদি বিষয়ে কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। কুচ যখন 'পহিল বদরী' তখন তার প্রতি যেমন আমরা কবিদের সবিস্ময়

১. 'সাহসে আঘাতে স্পর্শে'
২. 'ছুরি' [তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা]
৩. ৪৯৫
৪. 'ব্যঞ্জনা'

দৃষ্টি মেলে রাখতে দেখেছি, তেমনি কুচ যখন 'কনক গিরি', তখনও তার প্রতি কবিদের সমুগ্ধ পক্ষপাত লক্ষ্য করেছি। নবোদ্‌গত ক্ষুদ্র কুচ পুরুষের করতলে উত্তেজিত চাঞ্চল্য এনে দেয় একথা সত্যি। কিন্তু কুচের বৃহৎ আয়তনেরও একরকম উপকারিতা রয়েছে। বৃহৎ কুচ যেমন পুরুষের বক্ষ জুড়ে থাকতে পারে---ক্ষুদ্র কুচের পক্ষে তেমনটি সম্ভব নয়। কুচের বিশালতা দিয়ে শুধু পুরুষের বক্ষ কেন, পুরুষের চিত্ত ও অধিকার করা সম্ভব। জয়-দেবের কৃষ্ণ তো তাই বলেন। মানিনী রাধাকে তিনি বলেন---"ঘন স্তন জঘনের বিপুলতায় তুমিই আমার চিত্ত অধিকার করিয়া আছ। সেখানে অন্যের অবস্থিতির অবকাশ কোথায়?"[১] ---একথায় রাধাকে একান্ত শরীরী ক'রে গড়া হয়েছে ব'লে সমালোচক কবিকে যতই অভিযুক্ত করুন না কেন--- আমরা কিন্তু কুচের আকার-বিশালতার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত হ'য়ে পুলকিত না হ'য়ে পারছিনা। স্তনের একেবারে কচি অবস্থার চেয়ে পূর্ণগঠন তরুণ অবস্থার প্রতি কবিদের পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট লক্ষিত হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ যখন রাধার 'সূচক রুচক কুচের বাটুলে'র প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেছিলেন, তখন রাধা সেই কাঁচা স্তনকে চম্পামুকুলের সঙ্গে তুলিত ক'রে বলেছিলেন, চাঁপাকলি দেখতে সুন্দর হলেও গন্ধহীন---বিকশিত হলেই তা সুরভিত হয়:

কৃষ্ণ---যে বোল বুলিলোঁ মনে না ধরিলেঁ
উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী।
সূচক রুচক কুচের বাটুল
তাতা পড়ি গেল দিঠী।

রাধা---চাঁপাকুঁটী দেখিতে রূপসে।
তাত নাহি গন্ধের পরশে॥
বিকসিলেঁ মোহে মুনিমনে।
হেন সব নারীর যৌবনে॥

অন্যত্র রাধা বলেছেন ডালিম ভালোমত না পাকলে রসপূর হয়না—

তাবত রস নাহিঁ ডালিম ডাকরে।
ভালমতেঁ যাবত নাহি পাকএ ভিতরে॥

(বড়ু চণ্ডীদাস)

১. [গীতগোবিন্দ]

কাঁচা শ্রীফলে যেমন যথার্থ স্বাদ পাওয়া যায়না—অপরিণত কুচেও তেমনি যথার্থ রসোপলব্ধি হয়না।—

নহলী যৌবন কাঁচ শিরিফল
তাহাক কেহেঁা নাহিঁ খাএ।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

তবে যে ক্ষুধার্ত, তার কাঁচাই বা কি পাকাই বা কি—যা পায়, তাই দু'হাতে খেতে থাকে—

যাত খিধা বসে নাগরি রাধা
কিবা তার কাঁচ পাকাএ।
যেমনে পাএ তেমনে খাএ
যা নাহিঁ খিধা পালাএ ॥
(বড়ু চণ্ডীদাস)

অবশ্য ক্ষুধার্তের এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমরা রসিক কবির বিচার করবোনা। রূপরচনায় মগ্ন কবিদের আমরা দেখেছি তাঁরা স্তনের একেবারে কাঁচা অবস্থার চেয়ে তরুণ অবস্থাকেই বেশী পছন্দ করেন। তাঁদের ধারণা, কুচের সদ্যোত্থিত কাঁচা ছাঁচ প্রিয়ের মনকে ততখানি বেঁধে রাখতে পারেনা—পূর্ণায়ত কুচ যেমন পারে। তাই বিরহবিধুরা লৌকিকা নায়িকা আক্ষেপ ক'রে বলে—"ফল এখন তরুণ হইল, অঞ্চলের তলে ঢাঁকা পড়েনা। হে সজনি, প্রভু কাঁচা ছাঁচ দেখিয়া গেল, কাজেই তাহার মন কুজ্ঝটিকাবৃত।"[১] (বিদ্যাপতি)। ফলের কাঁচা ছাঁচের মধ্যে ফলের আকৃতি, তার মসৃণ নিটোলতা, তার রসময়তা যেমন বোঝা যায়না—সদ্য নূতন কুচও তেমনই। তাই প্রেমিক পরিপূর্ণ কুচেই খুঁজে পান যৌবনের রস।

কুচের উচ্চতা বিষয়ে কবিদের মন্তব্যগুলো এবার পর্যবেক্ষণ করবো। কুচের নীচুতা নয়, উচ্চতাই কবিদের লোভাতুর নয়ন আকর্ষণ করে—এ সম্পর্কে সব কবিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকারোক্তি করেছেন। সুন্দরী মাত্রেরই কুচ হবে দর্শনীয়ভাবে উচ্চ। আমরা জানি বিশ্বসুন্দরীর সৌন্দর্য পরিমাপের সময়

১. ৮৯২

কটির তুলনায় কুচের মোহন উচ্চতা প্রয়োজন হয়। উচ্চ কুচের অহংকৃত উন্নত চূড়া দর্শনে কবিকুল এত বিমোহিত যে তাঁরা কুচরূপ নির্মাণকালে 'উচ্চ' শব্দটি উচ্চারণ করতে ভোলেন না—

পীন কঠিন উচ তনে।

(বড়ু চণ্ডীদাস)

উচ কুচমূলে হেম হার দোলে।

(চণ্ডীদাস)

উচ কুচ মানয়ে ভার।

(বিদ্যাপতি)

কী যশ উচ কুচ কঞ্চুক ভার।

(গোবিন্দদাস)

উচ কুচযুগ কনকগিরি।[১]

(জ্ঞানদাস)

উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস।

(গোপাল দাস)

উপরে পড়িল ভেলা উচ কুচ দ্বন্দ্ব।

(কৃষ্ণরাম)

কটি কৃশতর কঠিন কুচ।
কমলকলিকা কিবা সে উচ।।

(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

উচ্চ কুচ সুধার কলস।

(ভারতচন্দ্র)

নম্র শির: এবে
উচ্চ কুচ।[২]

(মধুসূদন)

---

১. কবিকুল যখন স্তনকে পাহাড় নাম দেন তখন পাহাড়ের গগনস্পর্শী উচ্চতার কথা তাঁদের মনে থাকে। তবু সেই গিরিবর্ণনাকালেও 'উচ্চ' শব্দটি আছেই—জ্ঞানদাসের উপরোক্ত পদে তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২. 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' [বীরাঙ্গনা কাব্য]

ইজের পরা, আঁটো কুর্তা গায়ে।
কী অসম্ভব উঁচু বুক।[১]

(বুদ্ধদেব বসু)

উচুঁ বুক দেখে ভাবি পেশোয়ারী উজ্জ্বল দোকানে
দূর থেকে দেখছি তাজ্জব হয়ে টসটসে ফল।[২]

(শামসুর রাহমান)

আমরা জানি যৌবনপ্রভাবে কুচ দু'টি ক্রমশঃ উচচ হয়ে ওঠে। বিদ্যাপতিও তাই বলেন—'দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীণ/বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ।।' কিন্তু কুচের উচচ হ'য়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে কবি কৃষ্ণরাম ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে একে অন্যের সঙ্গে বিবাদ ক'রেই কুচ দু'টি উচচ হ'য়ে উঠেছে—'উচচ হয় কুচ দুটি বিবাদ করিয়া।'

কুচের ওজন সম্পর্কে কবিদের মতামতটা এবার পর্যালোচনা ক'রে দেখা যাক। ওজনের পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক ক'রে কেউ কিছু বলেননি। তবে পূর্ণগঠিত কুচ যে যথেষ্ট ভারী, সে সম্পর্কে কবিদের মধ্যে দ্বিমত নেই। কালিদাস বলেন স্তনের ভারে যক্ষপ্রিয়া ঈষৎ নত হ'য়ে আছে। ফুলের ভারে লতা যেমন নুয়ে থাকে—ভঙ্গিটি তেমনই অপরূপ। বিধাতার সৃষ্ট প্রথম যুবতীর মত সেই অনিন্দ্যসুন্দরী তন্বী শ্যামা রমণী 'স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং'।[৩] এই নিম্ননাভি, ক্ষীণমধ্যা রমণী, যার 'ওষ্ঠে রক্তিমা পক্কবিম্বের'—সে 'স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং' ব'লেই তাকে আরও দারুণ সুন্দর এবং কোমল মনে হয়। বিহারীলাল বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন—'সুঠাম শরীর পেলব লতিকা/আনত সুষমা কুসুমভরে।' ব্যাখ্যা করেন কায়কোবাদ ও। তিনি বলেন, গোলাপ-গুচ্ছের ভারে নত শাখার মত যৌবনবতী বালার দেহ নুয়ে পড়ে—

'হেঁটে যেতে দেহ তোমার লতিয়ে পড়ে ঐ উঠানে,
গোলাপ ফুলের গুচ্ছ যেমন নুয়ে পড়ে ফুলবাগানে।'

অন্যত্র বিহারীলাল স্তবকভারাবনত লতিকাকে শুধু নুয়ে পড়তে নয়, লীলাভরে বারবার ঢলে পড়তে দেখেন—

১. 'অলস সকাল' [নতুন পাতা]
২. [রৌদ্র করোটিতে]
৩. [মেঘদূতম্]

হেলিয়ে স্তবক-ভরে
মরি কত লীলা করে
পয়োধর ভার-ভরে
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে[১]

স্বাধীনভর্তৃকার যৌবনগঠিত কুচদ্বয় অনতিস্ফুট পদ্মের মত সুউন্নত এবং সুদৃঢ় থাকে। প্রিয়তমের করস্পর্শে, আদরে এবং যত্নে পদ্মদুটি সতেজ, উজ্জ্বল এবং ভারী হ'য়ে উঠতে থাকে। কিন্তু প্রিয়তম প্রবাসে গেলে কুচ দু'টি বিরহী হৃদয়ের উত্তাপে প্রায় ঝ'রে পড়া ফোটা পদ্মের মত হাল্কা এবং ম্লান হ'য়ে যায়—"কমলের ন্যায় উচচ কুচযুগ বক্ষে ভার হইয়াছিল, এখন তাহা ফুটিয়া ম্লান হইল।"[২] (বিদ্যাপতি)। অভিসারের দুর্গম পথযাত্রাকালে অলংকার যেমন ভার মনে হয়, তেমনি ভার মনে হয় উচচ কুচদ্বয়। কঙ্কন, মুদরি রাধা পথেই পরিত্যাগ করেন—কিন্তু কুচদ্বয় তো পরিত্যাগ করা যায়না – 'উচ কুচ মানয়ে ভার।' (বিদ্যাপতি)। মেঘযামিনিতে পঙ্কিল পথ অতিক্রমকালে কুচভার সত্যি বড়ই অসুবিধাজনক—গুরুয়া কুচভরে চলে উলটপদ

পীণ জঘনক ভার রে।

(গোবিন্দদাস)

পীণ পয়োধর ভারই তো নারীকে যৌবনপীড়িত ক'রে তোলে, তার গতি-ভঙ্গিকে ক'রে দেয় মন্থর—

(১) আজি বিদ্যা কমল নয়ানী অদ্ভুতা।
পীণ পয়োধর ভরে বড়ই পীড়িতা।।

(কৃষ্ণরামদাস)

(২) পীন পয়োধর ভর তনু মন্থর।

(কৃষ্ণরাম দাস)

সৈয়দ হামজা বলেন, রূপের ভরেই রূপবতী চলতে পারেনা, তার ওপর ভার হয়েছে নবীন যৌবন (স্থূল নিতম্ব এবং স্তন)---

১. [সঙ্গীত শতক]
২. ৮৭১

সহজে রূপের ভরে আপনি চলিতে নারে
নবীন যৌবন তাহে ভার।

সুলতান নসির সাহা বলেন, রাধার কুচ-শ্রীফলদ্বয় এমন ভারী যে তার ভারে যৌবন যেন ভেঙে পড়তে চায়—'কুচ শ্রীফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি।' কুচের নিটোল মাংসস্ফীতির ভারে ফেটে পড়া যৌবনকে একটিমাত্র চরণে বড় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন কবি। বিদ্যাপতিও আশংকা করেন কুচ-শ্রীফলের ভরে রাধার ক্ষীণ কটিদেশ বুঝি বা ভেঙেই যায়—

"ধনীর ক্ষীণ মধ্যদেশ কুচরূপ শ্রীফলের ভরে যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে।"[১]

রাধা যখন কৃষ্ণের বক্ষে আরোহী—সেই বিপরীত রতিকালে রাধার কুচের ভারীত্বের কথা ভেবে কৃষ্ণ রীতিমত শংকিত হয়ে পড়েছিলেন-"প্রভু কুচ-যুগলে পর্বত মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়ে পাছে প্রবেশ করে এই ভয়ে তাহাতে হাত দিলেন।"[২] (বিদ্যাপতি)।

কুচের গঠন-বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত করেছেন কবি কালিদাস। রমণীদের কণ্ঠের যে স্থানে মুক্তাহার ছড়িয়ে থাকে, সেখান থেকেই আরম্ভ হচ্ছে স্তনমূল। রমণীর কণ্ঠও তাই পীনস্তনোন্নত কণ্ঠ—"কণ্ঠস্য তস্যাঃ স্তনবন্ধুরস্য।"[৩] শ্যাম-মুখ স্তনদ্বয় পরস্পরকে পীড়িত করে এমনি পুষ্ট হয় যে, তাদের মধ্যে এতটুকুও স্থান থাকে না যাতে মধ্যে এক সূক্ষ্ম মৃণালসূত্র প্রবেশ করতে পারে—"অন্যোন্যমুৎপীড়য়দুৎপলাক্ষ্যাঃ স্তন-দ্বয়ং পাণ্ডু তথা প্রবৃদ্ধম্। মধ্যে যথা শ্যামমুখস্য তস্য মৃণাল সূত্রান্তরমপ্য লভ্যম।।"[৪] স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্তী পথটি সংকীর্ণ ব'লে স্তন দু'টি প্রায় পরস্পর-সংলগ্ন। কিন্তু প্রায়-সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও দু'টির সুন্দর গড়ন স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কেননা দু'টিরই পার্শ্বদেশ যেন কোন নিপুণ ভাস্কর মেজে মেজে সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছে—"সংক্ষিপ্ত নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।"[৫] ("বক্ষস্থল মাংসল এবং উন্নত পার্শ্বদ্বয় কেহ যেন মাজিয়া সমান করিয়া দিয়াছে।")

১. ৯৩২
২. ৬৯৯
৩. [কুমারসম্ভবম্]
৪. [কুমারসম্ভবম্]
৫. [মালবিকাগ্নিমিত্রম্]

কুচের গঠন-বিষয়ে আমরা পূর্বে নৃতাত্ত্বিক-প্রদত্ত ব্যাখ্যা লক্ষ্য করেছি। দেশীয় লৌকিক নৃতত্ত্ব অনুযায়ী গঠন-প্রকৃতি বিচার ক'রে বঙ্গদেশীয় রমণীর কুচকে (১) ঝোলা মাই, (২) থলে মাই, (৩) চ্যারাকে মাই ও (৪) খাড়া মাই—এই যে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—তার মধ্যে প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর প্রতি কবিদের অনাগ্রহ এবং শেষোক্ত দুই শ্রেণীর প্রতি কবিদের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। প্রদীপাকৃতি স্তন ও তুঙ্গ স্তনের মধ্যে যে গোলত্ব—কবিদের পক্ষপাতিত্ব এবং মুগ্ধতা সেই গোলত্বের প্রতি। 'ঝোলা' ও 'থলে' স্তনের লম্বত্বের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট নন। কুচের লম্বত্বের প্রতি কবির বিরাগ বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি চয়ন করা যাক—"লম্বথনীএ বিঅ একাবলী, তুন্দিলাএ বিঅ কঞ্চুকিআ, টেরাএ বিঅ কড়ক্খ বিকখেবো, কট্টিদকেশাএ বিঅ মালদী কুসুমমালা, কানাএ বিঅ কজ্জল সলাআ ণ সুট্‌ঠুদরং ভাদি রমনিজ্জা।" (রাজশেখর)। অর্থাৎ কবি বলতে চান কানাচোখে যেমন কাজল মানায়না, কর্তিতকেশে যেমন মালতীমালা মানায়না, টেরা চোখে যেমন কটাক্ষ মানায় না, উদরসর্বস্বাকে যেমন কাঁচুলি মানায়না, লম্বস্তনীকে তেমন একনরী হার মানায় না। একনরী হার তাহলে মানায় বোঝা গেল ঘন পীন সুবর্তুল পয়োধরে। কুচের বর্তুলত্ব যে কত প্রিয় সে বিষয়ে সকল কবিই কলরবমুখর ঘোষণা দেন—

১. শঙ্কিত সঙ্কেত সম দুটি তার বুকের বর্তুলে
(মোহিতলাল মজুমদার)

২. বুকের দুটি মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মত বিদগ্ধ ও বর্তুল,[১]
(বুদ্ধদেব বসু)

৩. এগিয়ে আসে তোর নিটোল স্তনভার তুঙ্গ, উদ্দাম,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
সুগোল, রেখায়িত আলোক রশ্মির দ্যোতনা।[২]
(বুদ্ধদেব বসু)

৪. সুগোল স্পন্দিত বুক[৩]
(শামসুর রাহমান)

---

১. 'মরচে পড়া পেরেকের গান'
২. 'সুন্দর জাহাজ' [বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা] বুদ্ধদেব বসু
৩. 'স্পর্শ'

৫. পাশাপাশি শীতল রমণী—তার একদা সুগোল বুক[১]

(আবু হেনা মোস্তফা কামাল)

৬. চাঁদ দিল গোল দুধের বাটিটি
দু'দুবার উপুড় করে তোমার বুকে।[২]

(দিনেশ দাশ)

'চ্যারাকে' অর্থাৎ প্রদীপাকৃতি ও 'খাড়া' অর্থাৎ তুঙ্গ—এই দুই শ্রেণীর স্তনের মধ্যে আবার কবিদের আকর্ষণ শেষোক্তটির প্রতিই অত্যধিক। কুচের তুঙ্গত্বের প্রতি কবিকুলের মুগ্ধতা বহুস্থলেই ব্যগ্র ব্যাকুলতায় উদঘাটিত। বিজয়গুপ্ত যথার্থই বলেছেন—খাড়া দেখি দুই স্তন।
পুরুষের যায় মন।।

কবিরা কুচের বিভিন্ন বর্ণ দেখেছেন—কৃষ্ণ, শ্যাম, গৌর, রক্তিম, স্বর্ণালী, সবুজাভ, নীলাভ, গোলাপি, কমলাই, শ্বেত, হরিদ্রাভ। চণ্ডী যত বিচিত্র কাঁচুলিই পরুন না কেন—তাঁর কুচদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ। রাধার স্তন-উদ্‌গম-স্থল প্রথমে রক্তিম হয়েছিল। তারপর কৈশোরে তার কুচ হয় বদরীফলের মত সবুজাভ—এবং শেষ পর্যন্ত স্বর্ণালী। হেমকমল, হেমগিরি, কনককটোরি, স্বর্ণকুম্ভ ইত্যাদি উপমান ব্যবহার ক'রে কবিরা রাধার কুচের স্বর্ণবর্ণ সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। পদ্মাবতীর রঙ কমলা। কমলার রঙের মত পদ্মাবতীর কুচের রঙ ব'লে কমলালেবু লজ্জায় ফেটে যায়নি ববং সুরঙ্গী হ'য়ে নারঙ্গী নাম ধরেছে—ডালিম সেই রঙের নয় ব'লেই লজ্জায় বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে। ময়মনসিংহ গীতিকার গ্রামবধূ কমলার কুচের রঙ কিন্তু কমলা নয়, গোলাপি—"আশ্বিন মাসেতে যেমন পদুমের কলি।"[৩] চন্দ্রাণীর কুচ কাঞ্চন বর্ণের—"কাঞ্চন কটোরা কুচ করিয়া চন্দনে/নিজ হিয়া তথা যেন সম্বরে বামনে।"[৪] লায়লীর নবীন কুচ নবীন শ্রীফল কিংবা নবীন নারাঙ্গের মত সবুজাভ—"কুচ যুগ মনোরম নবীন শ্রীফল সম/কি বা নব নারাঙ্গ যুগল।"[৫] খুল্লনার কুচ কদম্বকোরকের মত হরিদ্রাভ—"কদম্বকোরক জিনী খুল্লনার

১. [আপন যৌবন বৈরী]
২. 'তোমাকে যদি হারাই' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]
৩. দ্বিজ ঈশান
৪ দৌলৎ কাজী [সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী]
৫. দৌলত ওজীর বাহরাম খান [লায়লী মজনু]

স্তন।"[১] বিদ্যার কুচবর্ণ রামপ্রসাদের চোখে আগুনের মত লালাভ, আর ভারতচন্দ্রের চোখে পদ্মকলির মত গোলাপি। তিলোত্তমার ও প্রমীলার কুচের রং তুষারশুভ্র পর্বতশৃঙ্গের মত শ্বেত—মধুসূদন সে পর্বতকে হেমগিরি ব'লে উল্লেখ করলে সোনালি বলা যেত—কিন্তু তা করেননি ব'লে তুষারধবল পর্বতই কল্পনায় আসে। জীবনানন্দ-বর্ণিত কোনো এক শঙ্খিনীমালার কুচবর্ণ ও শঙ্খের মত শ্বেত। উর্বশীর কুচবর্ণ নক্ষত্রের মত নীলাভ—"তব স্তনহার হ'তে নভস্থলে খসি পড়ে তারা।"[২]

স্তনের মূল্য সম্বন্ধে কবিদের কি বক্তব্য সে বিষয়ে এবার আলোচনা ক'রে দেখবো। এই প্রসঙ্গে আরও দেখে নেবো, কবিরা সম্ভোগসময়ে স্তনের কি মূল্য নিরূপন করেছেন এবং কোথায়ই বা তার স্থান নির্ধারণ করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস স্তনের দাম ধার্য করেছেন তের লক্ষ টাকা-

শ্রীফল যুগল তোহোর তনে।
এহার দান তের লক্ষ ধনে॥

অন্যান্য কবিরা স্তনের এমন নির্দিষ্ট অংকের দাম বেঁধে দেন নি বটে—তবে স্তন যে মহামূল্যবান সম্পদ, সে সম্পর্কে কবিরা বিভিন্ন চরণে বহুবার আলোকপাত করেছেন। স্তনকে কেউ বলেন, হীরক (হীরকের মুখ যেন করে ঝলমল), কেউ বলেন, রত্ন ("কাঞ্চনে গড়া সুন্দর পয়োধর নাগরের জীবনের আধার স্বরূপ। উহা রত্নের মতন"[৩]), কেউ বলেন, সুবর্ণ (সুবর্ণের স্তনে জিনি বালার্ক চারু[৪]), কেউ বলেন, কাঞ্চন, (কাঞ্চন কটোরা কুচ চর্চিয়া চন্দনে[৫]), কেউ বলেন, মনি (দুর্লভ মনির মতো স্তন[৬]), কেউ বলেন, মানিক (হিয়ার মাঝারে মানিক ছিরি[৭])। হীরক, রত্ন, স্বর্ণ, মানিক্য—এই সব মহামূল্যবান এবং পরমকাম্য সম্পদকে স্তনের উপমান হিসেবে নির্বাচন ক'রে কবিরা তার মূল্য নিরূপনের ভার পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

১. মুকুন্দরাম [চণ্ডীমঙ্গল]
২. 'উর্বশী' [চিত্রা]
৩. বিদ্যাপতি
৪. নওয়াজিস খান খোন্দকার
৫. দৌলৎ কাজী
৬. শামসুর রাহমান
৭. জ্ঞানদাস

উপমান-নির্বাচনকালে কবিদের স্বর্ণপ্রীতি এ প্রসঙ্গে বেশ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কবিরা যখন স্তনকে পাহাড়, কটোরা, কলস, কুম্ভ, শ্রীফল অথবা শম্ভু বলেন—তখন সে পাহাড় হয় হেমগিরি, কটোরা হয় কনককটোরা, কলস হয় কাঞ্চনকলস, কুম্ভ হয় 'কনয়াকুম্ভ', কমল হয় হেমকমল, শ্রীফল হয় স্বর্ণবিল্ব—এমন কি শম্ভুকেও হ'তে হয় সুবর্ণশম্ভু। এত কিছুকে স্বর্ণে পরিণত ক'রেও কবি তৃপ্ত নন। তাই রাধার স্তনদ্বয়কে স্বর্ণপিণ্ড হিসাবে আর একবার দেখে নিতে হ'লো কৃষ্ণের চোখ দিয়ে—

গোরি কলেবর নুনা।
জনু আঁচরে উজোর সোনা ॥[১]

গোধুলিবেলায় পুষ্পমালার মত একটি অল্পবয়সী বালিকা আঁচলে উজ্জ্বল স্বর্ণখণ্ড ঢেঁকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো পথে। সেই লাবণ্য-জ্বলজ্বল স্বর্ণখণ্ড পীড়ন-কামনায় শ্রীকৃষ্ণ জ্বলতে থাকলেন অসহ্য জ্বালায়। রাধার কুচদ্বয়কে বারবার সুবর্ণ ব'লে অভিহিত করার কারণ আছে। কবিদের বিশ্বাস—রাধার মুখ সৃষ্ট হ'য়েছিল পূর্ণিমার চাঁদে সোনা ক'ষে। চাঁদের উদ্বৃত্ত অংশ থেকে তারার এবং সোনার উদ্বৃত্ত অংশ থেকে পয়োধরের সৃষ্টি।[২]

রাধার স্তনদ্বয় যেন ঘটভরা স্বর্ণ। কবি তো এই ধনকে মহামূল্যবান জ্ঞান করেনই, নায়ক কৃষ্ণও 'আঁচরে উজোর সোনা' দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যান, সখীরাও জানে রাধার কুচকলস হচ্ছে কাঞ্চনকলস, অপরিসীম তার মূল্য ("কাঞ্চন কলস সমান কুচ যুগল দান কর"[৩]) -এমনকি রাধিকা নিজেও তাঁর বক্ষসম্পদের উচচমূল্য সম্পর্কে সচেতন এবং সেজন্য দারুণ গর্বিত। এই সম্পদ আছে ব'লে নিজেকে তিনি সম্পদশালী মনে করেন এবং কৃষ্ণকে দরিদ্র ও কৃপাপাত্র মনে করেন

(১) "হাতে হাত দিয়া ধরিতে প্রেম জাগিল, দরিদ্র যেন ঘটভরা স্বর্ণ পাইল।"[৪]

(২) "বার বার বিহ্বল হইয়া আমার কুচ স্পর্শ করিল, যেন নির্ধন সোনার বাটি পাইল।"[৫]

---

১. শ্রীকবিরঞ্জন

২. "পূর্ণিমার চাঁদ আনিয়া তাহাতে সোনা কষিয়া তোমার মুখশ্রেষ্ঠ সৃজন করিয়াছে। চাঁদের যাহা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা (মুখ হইতে) কাটিয়া ফেলিল, তাহাতেই যেন সকল তারার সৃষ্টি। আর সোনার যাহা উদ্বৃত্ত রহিল, তাহাতে হইল দুই পয়োধর।" (৩২০)

৩. ৪৩৯ ৪. ৬৭৮ ৫. ৭৬

এই 'পয়োধর নাগরের জীবনের আধার স্বরূপ'--ব'লে রাধা বিত্তবতীর ধনগর্ব প্রকাশ করতে থাকেন। বলাবাহুল্য রাধার এই অনুভূতি সব যৌবনবতী বালারই। রাধার যখন এই সম্পদ ছিলনা, তখন রাধাও ছিলেন নির্ধন। এই ধনলাভের পর তিনি বার বার তা দর্শন করেন এবং ঢেঁকে রাখেন। নির্ধন ধনলাভের পর যেমন আচবণ করে, রাধার আচরণও তেমনই--"যেমন জীবন সদৃশ নিধি পাইয়া নির্ধন ক্ষনে ক্ষনে ঢাঁকিয়া রাখে (তেমনি নায়িকা) কুচ দেখে ও ঢাঁকিয়া রাখে।"[১] রাধার এই গুপ্তধনের স্বর্ণকলস দুটিকে নাগিনীরা (হারনাগিনী এবং বেণীসাপিনী) পাহারা দেয়। মানিনী রাধার সেই সর্পযুক্ত সুবর্ণঘটে হাত দিয়ে কেমন ক'রে শ্রীকৃষ্ণ নিজের দোষক্ষালন করেন, সে কথা আমরা জানি। ধনলাভ করতে গেলে একটু সর্পদংশন সহ্য করতেই হয়। শুধু নাগিনী কেন! মদনের এই অপূর্ব রূপ-রসভাণ্ডার রক্ষা করার জন্য মদনদেব নিজেও কি কম সচেষ্ট? কাঁচুলিরূপ প্রহরী হ'য়ে কুচকে জড়িয়ে রাখেন মদনদেব—

একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাচলা উপাম।[২]

রাধার কুচ যে মদনদেবের ভাণ্ডার, এ কথা কে না জানে-((১) "গৌর-বর্ণ স্তন মদনের ভাণ্ডার।[৩] (২) "পীন পয়োধর ভার মদনরাজার ভাণ্ডার।"[৪]) এই স্বর্ণকলস "কামদেবের ভাণ্ডারের (ন্যায়) রসে পরিপূর্ণ।"[৫] অতএব মদনরাজা আপনার এই রসভাণ্ডারকে রক্ষা করতে চাইবেন—এটাই স্বাভাবিক। ধনভাণ্ডার হিসেবে স্তনের মূল্য যে কত, সে কথা সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু স্তন যখন দেবতার অধিষ্ঠানভূমি হিসেবে সীমাতিক্রমী মূল্য অর্জন করে—তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই মূল্যের পরিমাণ নির্ণয় করা সত্যিই দুষ্কর হ'য়ে ওঠে। তাও একজন দেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র নয়—দুইজনের; প্রেমের অধিপতি মদনদেবের এবং দেবাদিদেব শিবের। আর একজন দেবীও আছেন—তিনি লক্ষ্মী (হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর।[৬] ধনসম্পদের ব্যাপার যখন, তখন সেখানে ধনদেবী লক্ষ্মীর উপস্থিতি তো একটা অনিবার্য ঘটনা।

১. ২৯৭, বিদ্যাপতি ২. বিদ্যাপতি ৩. ৩০৩, বিদ্যাপতি ৪. ৪৮, বিদ্যাপতি ৫. ৩০৩, বিদ্যাপতি ৬. 'স্তন', রবীন্দ্রনাথ

কুচমূল্য নির্ধারণ-ব্যাপারে আমরা এতক্ষন বিশেষভাবে মধ্যযুগীয় কবিদের মনোভঙ্গি লক্ষ্য করেছি। এবার মূল্যধার্যবিষয়ে অতি-আধুনিককালের একজন কবির মনোভঙ্গি লক্ষ্য করা যাক। এই কবি বলেন, ঘর-বাড়ী, জমি-জিরাত, সন্তান—এই এতকিছু মূল্যের বিনিময়ে কেনা যেতে পারে সেই অপরূপ সম্পদ—

স্পর্ধিত রোমশ বুকে একেকটি চুম্বনের দাগ
কাঁপা ঠোঁটে এঁকে দাও। ভাবুক সে—ডাইনী, মায়াবী
স্তন ঠোঁট নখ হ'তে ঢেলে দাও নিজের পরাগ
বলো তারে, ওরে পশু বল্ আর কতটুকু পাবি,
সবি তো দিলাম তুলে যা ছিলো এ দেহের ভূভাগ
তার বিনিময়ে করি মাঠ ঘর সন্তানের দাবী।[১]
(আল মাহমুদ)

এখন সম্ভোগ সময়ে স্তনের মূল্য সম্পর্কে কবিদের কি অভিমত, তা পর্যালোচনা ক'রে দেখা যাক। নারীর অনাঘ্রাত স্তন খুবই মূল্যবান এবং প্রথম বিক্রয়ের সময় তা ধারে বিক্রয় করা যায় না ((১) "সংসারের সার রসের প্রথম পসরা, তোমায় দিয়াই কি প্রথম বউনি হইবে।"[২] (২) "প্রথম বিক্রয় ধারে দিব না।"[৩])। অতএব 'দেবতা-বিহারভূমি' সোনার পাহাড় ক্রয়ের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, নাগররা তার হিসাব কষুন। হিসাব কষতে গিয়ে নাগরদের মূর্ছা যেতে হবে, এ কথা বলতে পারি। তবে নাগরদের পক্ষে এটা আশার কথা যে, কোনোমতে একবার ছুঁয়ে ফেলতে পারলে স্তনের দাম কমে যায় স্পর্শিত রত্নের মতন (স্তন "রত্নের মতন, ছুঁইলে আর অধিক মূল্য থাকে না।"[৪]) স্পর্শহীন স্তন কবির চোখে অ-স্পর্শিত রত্নের মতই মহামূল্যবান—কিন্তু চিহ্নাঙ্কিত হ'লেই তা হ'য়ে পড়ে সুলভ ("অমূল্য রত্ন বেচিতে গিয়েছিলাম। বনিক (কানাই) চিহ্ন (রতিচিহ্ন) করিয়া মূল্য কমাইল। হে সখী সুলভ হইলাম।"[৫]) নায়িকা যদি স্পর্শ বাঁচিয়ে বেশীক্ষণ রত্ন ধ'রে রাখতে পারেন, নায়ক যদি জোরজবরদস্তিপূর্বক

---

১. 'এমন তৃপ্তির' ২. ৩৪৩, বিদ্যাপতি ৩. ৩৪১, বিদ্যাপতি ৪. ৩৪৩, বিদ্যাপতি
৫. ৩০১, বিদ্যাপতি

চিহ্নাঙ্কিত না ক'রে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগ্রহই প্রকাশ করতে থাকেন, তাহলে কিন্তু রত্নের আকাশছোঁয়া দাম আরও বাড়তেই থাকবে–

ধএলে রতন অধিক মূল হোএ।।
আরতি গাহক মহগ বেসাহ।[১]

("রতন ধ'রে রাখলে মূল্য বৃদ্ধি পায়। গ্রাহকের আগ্রহেই বেসাতি মহার্ঘ হয়।")

কবি বিক্রেতাকে শিখিয়ে দিয়েছেন ক্রেতার আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেমন ক'রে ঢাকবার ছলে এই রত্ন দেখাতে হয়--"ঝাঁপব কুচ দরসাওবি কন্ত"[২], আবার ক্রেতাকে শিখিয়ে দিয়েছেন সরাসরি এই রত্ন স্পর্শ না ক'রে ছলনা দ্বারা কেমন ক'রে স্পর্শ করতে হয়। হারের মোতি গুনবার ছলে কুচস্পর্শ করা একটি চমৎকার ছলনা—গনইতে মোতিমহারা

ছলে পরশিবি কুচভারা।
(বিদ্যাপতি)

আর কৃষ্ণের মত যদি কারো বাঁশী চুরি যায়—তাহলে তো কোনো কথাই নেই। চুরি করা বাঁশী লুকিয়ে রাখার সর্বোত্তম স্থানই হচ্ছে কাঁচুলি। অতএব কাঁচুলি তছনছ ক'রেই বাঁশী খুঁজতে হয় যেমন খুঁজেছিলেন কৃষ্ণ—

জলেতে নাম্বিলা কৃষ্ণ গোপী সব মাঝে।
কাঁচুলি ঘুচায়্যা বংশী একে একে খোঁজে
(অভিরাম দাস)

সে যাই হোক, স্তন যদিও মহামূল্যবান সম্পদ, তবুও তার মূল্য অধরের চেয়ে কিছু কম ব'লে মনে করেন কবি বিদ্যাপতি—"অধর আছে আর অঞ্চলে শ্রীফল আছে। অধরের দামই বেশী।"[৩] এমন মনে করার কারণ চুম্বনের মধ্যে বৈদগ্ধ্য বেশী আর কুচ শুধুই কামনার সম্পদ।

সম্ভোগকালে কুচের স্থান কোথায়---কবিরা তাও নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের মতে অধরের পরেই কুচের স্থান। চুম্বনের পরেই কুচপীড়ন।

১. বিদ্যাপতি
২. বিদ্যাপতি
৩. ২২২

ভোজনের শুরুতেই লবণভক্ষণ যেমন নিয়ম, তেমনি দেহভোগের শুরুতে অধরভক্ষণ নিয়ম---

অধরে মাধুরী পান করে ঘনে ঘন।
ভোজনের আদ্যে লোকে ভৈক্ষএ লবণ॥
(দোনা গাজী)

দেহভোগক্রিয়া নিম্নগামী। অধরপানের পরেই শুরু হয় কুচমর্দন, তারপর জঙ্ঘাপ্রদেশে তৈরী করা হয় শৃঙ্গার-আসন। মধ্যযুগীয় কবিদের ইন্দ্রিয়পরিবেশনের প্রথা নিরীক্ষণ ক'রেই আমি এ উক্তি করছি। তাঁদের বর্ণনা অনুযায়ী সম্ভোগসময়ে কুচ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

নারীর কুচশোভাকে অন্য অনেক চোখে দর্শন করেছেন কবিরা। কখনো জনক-জননীর চোখে দেখেছেন, কখনো সন্তানের চোখে দেখেছেন। স্বামীর চোখে কখনো, কখনো বা স্ত্রীর চোখে দেখেছেন। ভ্রাতার চোখে, ভাগিনার চোখে দেখেছেন। দূত, দূতী, দাসী, কুটনী, মালিনী এবং সখীর চোখে দেখেছেন। ননদিনী, ভ্রাতৃবধূ, সপত্নীর চোখে দেখেছেন। বিপত্নীকের চোখে দেখেছেন। সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর চোখে দেখেছেন কখনো। দেবতার চোখে, ভক্তের চোখে দেখেছেন। দেখেছেন তাঁর প্রিয় নায়িকার চোখে, নায়কের চোখে। আর যেখানে নায়ক তিনি স্বয়ং—সেখানে, বলা বাহুল্য নিজের চোখেই দেখেছেন তিনি। কখনো আবার মধুকরের চোখে, পাখির চোখে, সাপের চোখে, মাছের চোখেও দেখেছেন।

জনকের চোখে দর্শন—

শিশুটি না প্রথমে জন্মিলে একবার।
মাই খেত কখন পেত না সংস্কার॥
আগে আগে দুগ্ধপান করিয়াছে যাই।
সংস্কারে এক্ষণে খেতেছে তাই মাই॥[১]

(ঈশ্বরগুপ্ত)

জননীর চোখে দর্শন— "সেই প্রথম যখন কিশোরী উমার স্তনকুট্মলের ঈষদুদ্গম লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তদবধি মার মনে মনের মত পাত্রের হাতে উমাকে সমর্পণ করিবার যে বাসনা জাগিয়াছিল, এবং স্তনকুসুমের দিন দিন পরিবৃদ্ধির সহিত মার যে বাসনা বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই অভিলাষ আজ পূর্ণ হইতেছে।"[২]

(কালিদাস/অনুবাদ: রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ)

সন্তানের চোখে দর্শন—

(১) বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।[৩]

(মধুসূদন)

(২) যন্ত্রণার একটি বিমুগ্ধ তন্ময়তায়
তুমি আমাকে জন্ম দিলে,
রোরুদ্যমান অসহায় মানব শিশু
তোমার স্তনের ছায়ায় নিদ্রিত হলো[৪]

(সৈয়দ আলী আহসান)

স্বামীর চোখে—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং[৫]

(কালিদাস)

---

১. 'পিতা ও পুত্র: তত্ত্বচিন্তা' ২. [কুমারসম্ভবম্]
৩. 'কপোতাক্ষ নদ' [চতুর্দশপদী কবিতাবলী]
৪. '৫৭' [উচ্চারণ] ৫. [মেঘদূতম্]

স্ত্রীর চোখে— সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব! নম্র শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ।[১]

(মধুসূদন)

ভ্রাতার চোখে—বোন তার বেণী খুলছে, যৌবনের অসহায় রোদে মুখ নত ক'রে
বুকের ভ্রমর হাতে রাখছে লুকিয়ে[২] —

(আবুল হাসান)

ভাগিনার চোখে—ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে।
তাহাত মজিল মন আহ্মারে।।

(বড়ু চণ্ডীদাস)

দূতের চোখে— সিহনা সুয়ন খলা ইব থড্ঢা নিচচুন্নয়া য মুহরহিয়া।
সংগমি সুয়নসরিচ্ছা আসাসহি বেবি অংগাই।[৩]

(আব্দুর রহমান)

("স্তন দুটি সুজন ও খলের মত। খলের মত তারা স্তব্ধ, নিত্যোন্নত ও ছিদ্রবিহীন এবং সঙ্গমে সুজনের মত তারা অঙ্গকে আশ্বাস দেয়।"— অনুবাদঃ মমতাজুর রহমান তরফদার)

দূতীর চোখে—'বিরহ সিন্ধুতে ডুবন্ত কৃষ্ণকে কুচভেলা দান করিয়া রক্ষা কর।"[৪]

(বিদ্যাপতি)

দাসীর চোখে---কদম্ব কোরক জিনী খুল্লনার স্তন।
গলিত তোমার কুচ হেলয়ে পবন।।[৫]

(মুকুন্দরাম)

---

১. 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' [বীরাঙ্গনা কাব্য]
২. 'অসভ্য দর্শন'
৩. [সন্দেশ-রাসক]
৪. ৬৬৪। (মানভঙ্গের জন্য মানিনী রাধাকে দূতীর অনুরোধ)
৫. মনির-পত্নী লহনার কুচদ্বয় যে বয়সের কারণে তাঁর সপত্নী খুল্লনার তুলনায় শ্রীহীন— দাসী সে কথা বোঝাচ্ছে।

কুটনীর চোখে---(১) আইল শ্রাবণ মাস দেখলো বিদিত।।

... ...

মেহুজলে স্নান করে বধু জন সঙ্গে।
ললিত মদনে মত্ত পতি পত্নী রঙ্গে।।
তিতির সকল দেহ কুচে ধারা বহে।
উর্ধ্ব কুম্ভ মুক্ত করি যেন বৃষ্টি সহে।।
তিতিল অঙ্গেত যদি পাটম্বর শাড়ী।
অঙ্গে বস্ত্র লাগে যেন বস্ত্রহীন নারী।।
তাতে নারী পুরুষের জর্মায় বিগার।
দোহ মধ্যে না রহয় বসন লজ্জার।।[১]

(দৌলৎ কাজী)

(২) বিকসিত বনে যেন কুসুম্ব ললিত।
তেন মতে হৃদে তোর যৌবন ফুটিত।[২]

(দৌলৎ কাজী)

মালিনীর চোখে---অবনি উপর যুগ রকত কমল।
সরোজ উপরে শোভে কদলী যুগল।।
শুন গুনমনি তথি অতি সুশোভন।
কুসুমকেতন অর্চনের সিংহাসন।।
কিছুমাত্র নাহি ভার তাহার উপর।
তারপর শোভিত যুগল গিরিবর।।

(দ্বিজ রাধাকান্ত)

সখীর চোখে---সহি নহিঁ সকহু হিয়ে পর হারূ।
কৈসে সহিউ কন্ত কর ভারূ।।

(জায়সী)

---

১. সরোবরে বৃষ্টিস্নাত পতি-পত্নীর জললীলা বর্ণনা ক'রে সতী ময়নাকে বিপথগামিনী করার চেষ্টা করছে কুটনী।

২. ময়নার এমন যৌবন বৃথা যাচ্ছে ব'লে তাকে প্ররোচিত করছে কুটনী।

("তুমি তোমার হৃদয়ের উপর হারের ভার সহ্য করতে পার না, কি ক'রে কান্তের কর-ভার সহ্য করলে?"[১]--অনুবাদঃ সৈয়দ আলী আহসান)

ননদিনীর চোখে---ননদিনী ওরে রসবিনোদিনী

আমি কুবোল সহিতে নারি।

... ...

চন্দন আগুর শিষের সিন্দুর
সব ভাসাইলুঁ জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জর জর
দারুনি পদ্মের নালে।।[২]

(আলাওল)

ভ্রাতৃবধূর চোখে-- "যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, এমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াগণ পরিহাসপূর্বক বলিলেন, সখি! তোমার ধূলিকেলিতেই অতিশয় শ্রদ্ধা দেখিতেছি---এ পর্যন্ত বক্ষঃস্থল অসম্বিত আছে, অতএব তুমি অতি বালা, এই কারণেই তোমার পিতা জামাতার অন্বেষণ করিতেছেন না।"[৩] (রূপ গোস্বামী)

সপত্নীর চোখে--- কঁবল-পত্র তব্ দারিউঁ চোলী।
দেখে সূর দেসি হৈ খোলী।।
উপর রাতা ভিতর পিয়রা।।
জারৌঁ ওহিঁ হরদি অস হিয়রা।।[৪]

(জায়সী)

("পদ্মপত্রের অন্তরালে যে দাড়িম্ব (স্তন) আছে সূর্যকে দেখে তা খুলে দেখাস। উপরিভাগ লাল কিন্তু ভেতরটা পীত.(পদ্মের ন্যায়) তোর অমন হলুদ বুকে আমি আগুন জ্বালিয়ে দি'।—অনুবাদঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

---

১. [পদ্মাবতী] সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত

২. রায়বাঘিনী ননদিনী ভ্রাতৃবধূর ভুক্ত কুচ দেখে সন্দেহ প্রকাশ করলে ভ্রাতৃবধূ ছদ্ম-কৈফিয়ৎ দিচ্ছে।

৩. [উজ্জ্বলনীলমনি]

৪. [পদ্মাবতী (নাগমতি-পদ্মাবতী বিবাদ খণ্ড)]

বিপত্নীকের চোখে---(১) চলে গেছে প্রিয়া বরষ কেটেছে চোখের বরষা লয়ে

... ...

বাক্সটি তার কাছেতে আনিয়া খুলিয়া দেখিনু আজ।

... ...

হার একছড়া গুরুবক্ষের গুমর মাখানো যাতে[১]

(কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

(২) যদিও সেই কবে তুমি মৃত্যুর ডাকে ফিরে গেছো কোথায়!
তবুও আজও ফিরে আসো অনুভবে আমার
স্বপ্নময় মধুর প্রেম বেঁচে ওঠে আমার সত্ত্বায়।

পিপাসায় নরম বুকে বুক রাখি,
সুডৌল তোমার কোমল বাহুবন্ধনে
আমি আগুনের তেজে জ্বলে উঠি,
উষ্ণ শিহরণ, চুম্বনের ছোবল . . .
অশান্ত, অশান্ত . . . শান্ত করে আমায়।[২]

(কার্লো দ্রুমন্দ্ দ্য আন্দ্রে* অনুবাদ: দেবব্রত মণ্ডল)

সন্ন্যাসীর চোখে--"নারীর মুখে মধু, বুকে গরল। তাই যুবতীর মুখপান করি এবং বুকে করি আঘাত।[৩]

(ভর্তৃহরি)

দেবতার চোখে---কিবা কুচহর কাম করিতে বিনাশ।
আড়ধনু ধরে লোমাবলী নাগপাশ॥[৪]

(আলাওল)

ভক্তের চোখে---দেবতা বিহারভূমি কনক অচল।[৫]

(রবীন্দ্রনাথ)

---

১. 'শেষদান'। [অজয়]
২. 'বিপত্নীকের বেদনা'
*. ব্রাজিলের কবি
৩. [মোহমুদগর]
৪. মদনদেবের চোখে স্তন শিবরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।
৫. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]

নায়িকার চোখে—কৌন দেব্ কহঁ জাই কৈ পর সৌঁ।
জেহি সুমেরু হিয় লাইয় কর সৌঁ॥
(জায়সী)

("কোন দেবতার কাছে গিয়ে স্পর্শ ক'রে প্রার্থনা করব, যাতে সুমেরুতুল্য বুকে প্রিয়তমের হাত গ্রহণ করতে পারি।"[১]
—অনুবাদ: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

নায়কের চোখে—গোরি কলেবর নূনা।
জনু আঁচরে উজোর সোনা॥ (বিদ্যাপতি)

রাণীর চোখে—হিয়া থার কুচ কঞ্চন লাড়ু।
আগমন ভেঁট দীহ্ন কৈ চাঁড়ূ॥
(জায়সী)

("হৃদয়ের পাত্রে কাঞ্চন-নাড়ুর মতো স্তনযুগল আমি প্রিয়তমকে সানন্দে আগমন-ভেট দিয়েছি।"[২]-অনুবাদ: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)
রাজার চোখে—উহাঁ তো কুঁভ স্থল গজ নারৌ।
ইহাঁ তো কুচ-কলসহি কর লারৌ॥
(জায়সী)

("ওখানে (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমি গজকুম্ভকে নত করি, আর এখানে আমি তোমার কুচকলস ধারণ করি।"[৩]—অনুবাদ: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)
কবির চোখে—

ক) কবি: 'ছোট্ট শিশুটি হ'য়ে'---

...হঠাৎ মনে হল আমিই যেন সেই ছোট্ট শিশুটি হ'য়ে
শুদ্ধ নগ্নতায় শুয়ে আছি তোমার কোলে অবাক বিস্ময়ে
কৌতূহলী দু'টি চোখ মেলে ধ'রে পবিত্র প্রশান্ত তোমার মুখের দিকে
আর উজ্জ্বল শুভ্রতায় রূপমন্থর দৃপ্তমহান তোমার ডান স্তনটি

১.—৩. [পদ্মাবতী (প্রথম খণ্ড)] দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

সযত্নে তুমি তুলে ধ'রে আছ কত মমতায়
অর্ধস্ফুট আরক্ত কোমল আমার ওষ্ঠাধর-পুটে।

. . . .

আর পরিতৃপ্ত আনন্দে আবেগে উল্লাসে আমি পান করছি যেন
উদার উচ্ছ্বসিত তোমার স্তনধারা,[১]
(নচিকেতা ভরদ্বাজ)

খ) কবি: কৈশোরের প্রত্যূষবেলায়—
তোমাকে প্রথম যখন অবিষ্কার করি
তখন তুমি ছিলে কিশোরী
মলমলের ওড়নার মধ্যে উদগ্রীব তোমার নার্গিস—
তোমার অংকুরোদগম
তুমি সবে ঢাকতে শিখেছ তোমার শরমিন পাপড়ি
তোমার মখমল
আর আমি তোমার সেই টলমল সম্মোহনের সামনে বিহ্বল
আবিষ্কারের আনন্দে ছুটে গিয়েছি তোমার দিকে
দ্রুত অতিক্রম করে গিয়েছি আমার মাসুম কৈশোর
আমার নাবালক জাগরণ
আমার পা জড়িয়ে ধরেছে কিশোর প্রত্যূষ
আমার পা জড়িয়ে ধরেছে স্বেদার্ত শবনম
আমি ভিজে গিয়েছি শীতকাতর আনন্দে
আমার মৌসুম ভরে গিয়েছে বয়ঃসন্ধিতে
অপ্রাপ্তবয়স্ক আবহাওয়ায়[২]
(ফরহাদ মজহার)

গ) কবি: যৌবনের বাসন্তী দিনে---
উত্তর-তিরিশ তুমি, তবু বউ বউ গন্ধ ঝ'রে পড়ে দেখি
তোমার বিশদ দেহে, শরীরের ভাঁজে ভাঁজে রাধিকা-কল্লোল,

---

১. 'অন্য রূপকল্পে উপাসনা' [কালের কবিতা]
২. 'আমাদের ভালোবাসা, মেহেরজান' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]

অতৃপ্তির স্পষ্ট ছাপ শুকনো ঠোঁটে, আর তুঙ্গ স্তনদ্বয় দেখে
মনে হয় তেমন শিক্ষিত নন গৃহস্বামী—
(রফিক আজাদ)

ঘ) কবি: প্রৌঢ়ত্বের ধূসরবেলায়—
কিন্তু নয়ন চিত্তের সাথে
পুরোনো দেখায় স্মৃতি কুড়ায়
যে দেখায় ছিলো সর্বশরীর
পুষ্পপত্র কত শাখায়।
স্বর্ণকুম্ভ বিভাসিত বুকে
মসৃণ তাপে বহু কৌতুকে
কত না নিবিড় প্রেমের আবহে
একদা কখন সময় শেষ,[১]
(সৈয়দ আলী আহসান)

(লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, গোধুলি-দিনেও কবির চোখে কুচদ্বয়—স্বর্ণকলস, এবং তার ঔজ্জল্যও কবির ফাগুনচোখে দেখা স্বর্ণকলসের মতই অম্লান।)
মহিলা কবির চোখে:

কনক শ্রীফল যেন কুচ বক্ষোপর।
যেই হেরে সেই মরে খেয়ে পঞ্চশর।।
(নওয়াব ফয়জুন্নিসা)

মধুকরের চোখে—কুচ-নারঁগ মধুকর রস লেহীঁ।।[২]
(জায়সী)

বিহঙ্গের চোখে—কুচ ছিরিফল পর বিহগ কিয়ে বৈঠল তাহে অরুণ রেখ ভেল।।[৩]
(বৈষ্ণব কবি)

---

১. '২৩' [সহসা সচকিত]
২. রসলুব্ধ মধুকরের চোখে কুচ রসপূর কমলালেবুর মত।
৩. রাধার কুচদ্বয়কে শ্রীফল ভেবে বিহঙ্গ তাতে ঠোঁকর মেরেছে। আসলে এটি জিজ্ঞাসিত রাধার ছদ্ম-কৈফিয়ৎ।

কাকের চোখে-- জয়ন্ত নামেতে কাক ছিল যে আকাশে।
দেখিয়া সীতার রূপ আসে সীতা পাশে।।
সহসা সীতার গায়ে পড়িল উড়িয়া।
সুতীক্ষ্ণ নখরে বক্ষ দিল আঁচড়িয়া।।[১]
(কৃত্তিবাস)

সাপের চোখে--রোমাবলী নাগিনী বৈসয়ে কুচান্তরে।
পর্বতে উঠিতে চাহে আহারের তরে।।
(আলাওল)

মাছের চোখে--. . . . . একবার ডুব দিয়ে মীনচোখে দেখা
নারীর উরুর জোড়, খোলা স্তন কী-রকম আশ্চর্য সরল
জলেরই মতন সেও সজল, নীলের কালো, সংখ্যাতীত জিভে
জল তার সর্ব অঙ্গ লেহন করেছে, ঠিক যে-রকম
মানুষের হাত[২]
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

কুচসৌন্দর্যকে দেখার কতকগুলো ভঙ্গি আছে কবিদের। তাঁরা শুধু চোখ দিয়েই দেখেন না।—তাঁদের পঞ্চেন্দ্রিয়ই অংশগ্রহণ করে দর্শনক্রিয়ায়।

১. প্রান্তরে গমনরতা সীতার রূপদর্শনে এক কাক অকস্মাৎ কামাসক্ত হ'য়ে সীতার বক্ষোদেশে নখাঘাত করে। এই অপরাধের জন্য ঐষিক বাণে রাম তার এক চোখ বিদ্ধ করেন। কৃত্তিবাস-অনূদিত রামায়ণে এই কাহিনী উল্লিখিত।

২. 'জলের সামনে' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদন—এগুলো হচ্ছে সৌন্দর্য অবলোকনের প্রক্রিয়া। কখনো তাঁরা অভিভূত অপলক চোখে শুধু দেখতেই থাকেন রমণীর অপরূপ বক্ষগঠনকে। কখনো দেখেন কোমল স্পর্শ বুলিয়ে অথবা কুচবৃন্তে বৈদ্যুতিক ঘর্ষণ জাগিয়ে। কখনো দেখেন নাসিকায় ঘ্রাণ নিয়ে, কখনো দেখেন নখক্ষতে বিক্ষত করে, কখনো চুম্বনসিক্ত করে, কখনো দশনাঘাতে জর্জরিত ক'রে। শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়েও চলতে থাকে রূপদর্শন—শুনে থাকেন অনেক অশ্রুত বাণী। তাঁদের ধারণা, স্পর্শ ক'রে না দেখলে, নাসিকায় আঘ্রাণ না নিলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ে তার অশ্রুত পুলকধ্বনি না শুনলে, চর্বন ক'রে আস্বাদ গ্রহণ না করলে, দাঁত নখে কুটিকুটি না করলে নারীর এই আশ্চর্য অঙ্গ সত্যিই কি রকম আশ্চর্য, তা পুরোপুরি দেখা হয় না। তাই এই কুচরূপকে নানা প্রক্রিয়ায় অবলোকন করা হয়।

কখনো কবি বিহ্বল ভালোলাগায় 'স্বর্গের স্বপ্নের মতো'[১] 'দুই বুক'[২] দুলতে দেখেন, কখনো বা 'তাজ্জব হ'য়ে টসটসে ফল'[৩] দু'টো দেখতে থাকেন, রমণীর বক্ষপদ্মে কখনো কখনো বা উড়িয়ে দেন 'দৃষ্টির ভ্রমর'[৪]। নয়নের বিদ্যুতে কুচকুম্ভে কখনো জাগিয়ে তোলেন রোমাঞ্চ-শিহরণ, কখনো বা দৃষ্টিতে কাব্যের আরতি জ্বালিয়ে প্রেয়সীর বুকে 'সদ্য-জাগা বিহ্বলিতা রতি'[৫]কে করেন কম্পমান।

কখনো কৃষ্ণসর্পিনীকে আলতো ক'রে ছুঁয়ে দেখেন,[৬] কনকগিরিকে করকমলে আবৃত করেন কখনো,[৭] কখনো স্বর্ণবিল্ব অর্ঘ্য নেন,[৮] কখনো বা মেজে মেজে উজ্জ্বল করেন কনককটোরি।[৯] স্পর্শনক্রিয়া ক্রমশঃ যখন

১—২. 'এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে' / বুদ্ধদেব বসু
৩. শামসুর রাহমান
৪. 'অসুখে একজন'/আল মাহমুদ
৫. 'আসঙ্গ'/আবদুল কাদির
৬. "তোমার স্তন সুবর্ণঘট, হার ভুজঙ্গিনী স্বরূপ। আমি উহার উপর হাত রাখিতেছি," —(৬৪৭, বিদ্যাপতি)
৭. "তাঁহার (হরির) করে কুচমণ্ডল লুকাইয়া রহিল, মনে হয় যেন কমল কনকগিরিকে ঝাঁপিয়া রাখিল।" (৫৬৬, বিদ্যাপতি)
৮. "স্বর্ণের সুন্দর শ্রীফল কাটিয়া অর্ধেক করিয়া কুচযুগল গঠন করিয়াছ। সুন্দরি! আমার পাণিস্পর্শে রস-অনুভব বাসনায় বাধা দিওনা।" (১৩৩, বিদ্যাপতি)।
৯. "তোমার গৌরবর্ণ পয়োধর অতিশয় রঞ্জিত হইল, যেন সোনার বাটি মাজিয়া রাখিল।" (৬৯, বিদ্যাপতি)

সুতীগ্র হ'য়ে ওঠে তখন নখগুলো ক্রিয়াশীল হয়। 'বুকের ওপর মৃদু কম্পমান নখ বিলেখনে'[১] কবি নিজের নাম লিখে লিখে 'ক্লান্তিহীব সজল চুম্বনে'[২] মুছে দেন নামের অক্ষর। নখরেখার মৃদুতা ক্রমশঃ প্রবল হ'য়ে ওঠে। তখন বিরামহীন নখরেখায় জর্জরিত ক'রে কুচরূপ দেখতে থাকেন কবি। রক্তিম নখরেখাকে কবির মনে হয় শুকপক্ষীর নখবিদ্ধ শ্রীফল[৩] কিংবা ভ্রমরদষ্ট নারঙ্গ[৪]। মনে হয় শিবশিরে রক্তকিংশুক[৫] অথবা চন্দ্রকলা।[৬] পর্বতশিখরে চন্দ্রোদয়[৭] ব'লেও মনে হয় কখনো, কখনো মনে হয় "দুইটি পদ্মের উপর যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ"[৮]। কাঁচা শ্রীফল গাত্রে কিংশুককুড়ি[৯] ব'লেও মনে হয় কখনো। হেমঘটে রক্তপ্রবাল[১০] ব'লেও মনে হয় কখনো। কখনো মনে হয় অঙ্কুশবিদ্ধ হস্তীমস্তক[১১]। নখরেখাকে 'নব শশিতুল্য অনুরাগের অঙ্কুর'[১২] ব'লে আখ্যাত করেন কবি বিদ্যাপতি। কবিরা কখনো সিংহের মত নখ দিয়ে গজকুম্ভ বিদীর্ণ[১৩] করেন। কখনো চোরের মত সোনার বাটি চুরি করতে গিয়ে নখের আঘাতে ভেঙে[১৪] ফেলেন। কখনো কাঁচা বদরীকে নখে পিষে রক্তবর্ণ[১৫] করেন,

---

১-২. 'সোনালি কাবিন' [সোনালি কাবিন] আল মাহমুদ

৩. কুচ ছিরিফল পর বিহগ কিয়ে বৈঠয় তাহে অরুণ রেখ ভেল। (বৈষ্ণব কবি)

৪. বৈঠ ভেঁৗর কুঁচ নারঁগ বারী।
লাগে নখ উছঁরী রঙ্গধারী।। (জায়সী)

৫. "তোমার পীন পয়োধরে সুন্দর নখচিহ্ন, সোনার শিবকে কেহ কিংশুক ফুলে পূজা করিয়াছে।" (বিদ্যাপতি)

৬. কুচ শম্ভূশিরে নখ চন্দ্রকলা। (ভারতচন্দ্র)

৭. "পীন পয়োধরে মনোহর নখরেখা হাত দিয়া ঢাঁকিতেছ কেন; মেরুশিখরে নব শশধর উদিত হইলে চুরি গোপন থাকেনা।" (বিদ্যাপতি)

৮. ২৬, বিদ্যাপতি

৯. "সে কাঁচা শ্রীফলে নখমূর্তি দিল, যেন কিংশুক ফুলের কুঁড়ি হইল।" (৭৭, বিদ্যাপতি)

১০. কুচ হেমঘটে নখরক্তছটা / বলিহারি সুরঙ্গ প্রবাল ঘটা।। (ভরতচন্দ্র)

১১. "কুচযুগ কুম্ভস্বরূপ (হস্তীর মস্তক) হইল, তাহাতে বাঁকা নখক্ষত যেন অ ঙ্কুশের মত দেখাইতেছে।" (১৯, বিদ্যাপতি) ১২. '৭৭'

১৩. "সুন্দর কুচযুগল নখের ক্ষতে ভরিয়া গেল---সিংহ যেন গজকুম্ভ বিদীর্ণ করিল।" (৪১১, বিদ্যাপতি)

১৪. ৬৯০, বিদ্যাপতি

১৫. কুচ কোরী ফর নখ খত রেহ। (বিদ্যাপতি)

কখনো বা শ্রীফলের ন্যায় কুচদ্বয়কে 'আবরণশূন্য নারঙ্গফলের ন্যায়'[১] করেন। কামনার এই প্রবলতায় যে নিষ্ঠুরতা আছে, তাকেও কবি রূপের আবরণে আবৃত করেছেন "প্রিয়তম যাহা কিছু দিল, সে কাঁচুলিতে ঢাঁকিয়া লইল এবং হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিল।"[২] (বিদ্যাপতি)।

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, শিশুর দেহে একরকম মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ থাকে। সেই রকম রমণীদেহেরও সৌরভ আছে। এক একজনের অঙ্গসৌরভ এক এক রকম। কারও দেহে থাকে দুগ্ধ-গন্ধ, কারও দেহে থাকে দধি-বাস, কারও অঙ্গে থাকে স্বর্ণচাঁপার সৌরভ, কারও অঙ্গে থাকে যূথিপরিমল, কারও দেহে থাকে পদ্মগন্ধ। বিদ্যাপতি রাধাকে কমলগন্ধা বলেছিলেন। তাহলে রাধার স্তনে নিশ্চয়ই কমলের সুবাস। রাধার অঙ্গে বিদ্যাপতি কখনো ধূপের সৌরভ লক্ষ্য করেছেন। দেহবেদীতে প্রিয়পূজার সময় অঙ্গসৌরভকে ধূপ করার ইচ্ছা তাঁর রাধা প্রকাশ করেছেন। রমণী যৌবনপ্রাপ্তা হ'লে তার দেহ ফুলগন্ধময় হয়, বিদ্যাপতি তা লক্ষ্য করেছেন—"(যৌবনাগমে) শয্যা পরিমলযুক্ত হইল—ফুলের গন্ধের মত।"[৩] কালিদাস তাঁর 'মেঘদূতম্' কাব্যে বারাঙ্গনাদের অঙ্গপরিমলের কথা উল্লেখ করেছেন—"যঃ পণ্যস্ত্রীরতি পরিমলোদ্গারিভির্ণাগরাণা—মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলা-বেশ্মভির্যৌবনানি।"[৪] তিনি বলেন, যুবতীদেহের সৌরভে নদীজলও সুরভিত হ'য়ে যায়—

> "ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা—
> স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ।।[৫]

প্রাচীন, আধুনিক, বিদেশী, দেশী বহু কবিই রমণীদেহের এই সুগন্ধানুভূতি সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছেন, যেমন—

(১) চিত্রিণী জৈস কুমুদ-রঙ্গ সোই বাসনা অঙ্গ।
পদমিনি সব চন্দন অসি ভঁবর ফিরাহিঁ তেহি সঙ্গ।।
(জায়সী)

---

১. অছল জোর সিরীফল ভাঁতি।
কএলহ ছোলঙ্গ নারঙ্গ কাঁতি।। (বিদ্যাপতি)

২. ৬৪

৩. ৫২৫

৪. [মেঘদূতম্] ৫. [মেঘদূতম্]

(২) পদমিনি জাতি পদুম রঁগ ওহী।
পদুম-বাস মধুকর সঁগ হোহঁী॥

(ঐ)

(৩) ভউঁর কেস ব্হ মালতী রাণী।
বিসহর লুরে লেহিঁ অরধানী॥

(ঐ)

(৪) কোঈ পরা ভেঁৗর হোই বাস লীহ্ন জনু চাঁপ।

(ঐ)

(৫) সসিমুখ অঙ্গ মলয়গিরি রাণী।
কনক সুগন্ধ দুআদস বাণী॥ (ঐ)

(৬) লাস্যময়ী গমন তাদের ছড়িয়ে দিত কস্তুরীবাস
লবঙ্গবাস আনতো বয়ে যেমন ধারা ভোরের বাতাস।[১]
(ইমরাউল কয়স্ / অনুবাদঃ নূরুদ্দীন আহমদ)

(৭) তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ;[২]
(সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য)

(৮) প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী;
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
বেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,[৩]

(মধুসূদন)

(৯) কৃষ্ণাসুন্দরীদের কুঁদ-কাটা নিটোল শরীরের মহুয়া গন্ধে[৪]
(শান্তি সিংহ)

---

১. 'সবুআ-মুয়াল্লাকা' [বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৬]

২. 'নীলিমাকে' [কবিতা] মীনাক্ষী দত্ত সংকলিত ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

৩. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য]

৪. 'লাল মাটি নীল অরণ্য' [কালের কবিতা]

(১০) ফাগুন দিনের বাতাবিলেবুর গন্ধমাখা যে গায়,
তাহাতে মিশান আমমুকুলের সুবাস জড়ান বায়;[১]
(জসীমউদদীন)

(১১) তোমার শরীরে যদি থেকে থাকে শস্যের সুবাস[২]
(আল মাহমুদ)

লক্ষ্য করা গেল, এক এক রমণীদেহে কবিকুল এক এক রকমের সুগন্ধ পান—ধূপের, চন্দনের, পদ্মের, মালতীর, চাঁপার, মকরন্দের, মহুয়ার, আমমুকুলের, বাতাবির, শস্যের, মলয়গিরির, জ্যোৎস্নার। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, পৃথিবীতে যত ফুল আছে---প্রত্যেক ফুলের সুগন্ধযুক্ত রমণীও আছে--(জেহি জেহি বরণ ফুল ফুলবারী/তেহি তেহি বরণ সুগন্ধ সো নারী।।---জায়সী)। কবিকুল রমণীর কেশে সুবাস পান (প্রথম সীস কস্তুরী কেসা।---জায়সী), নিশ্বাসে সুবাস পান (তিলকে পুহুপ অস নাসিক তাসূ/ঔ সুগন্ধ দীহ্নী বিধি বাসূ।।--জায়সী), এমনকি প্রাণেও সুবাস পান (ফূল বাস তন জীব তুমহারা।।--জায়সী)। আর তাই নারীকে তাঁরা আর এক নতুন বিশেষণ দেন--'গন্ধবতী' (শুরু হোক স্তোত্রপাঠ গন্ধবতী তোমার সুনামে[৩]---আল মাহমুদ)। কোনো কবি বলেন, নারীর নগ্ন শরীরের মত ঘ্রাণময় ফুলের সন্ধান এই পৃথিবীর কোনো ফুলেই তিনি পাননা—'নারীর নগ্ন শরীরের মতো/ঘ্রাণময় ফুল আমি এ-জীবনে কখনো শুঁকিনি।/যে সৌগন্ধ্য রয়েছে নারীর--সে-রকম গন্ধবহ/ফুলের সাক্ষাৎ আমি এখনো পাইনি কোনো ফুলে।'[৪]--(রফিক আজাদ)। এই কবি যিনি নারীর দেহটিকে অপার্থিব ফুল বললেন, তাঁর কাছেও সকল রমণীর দেহগন্ধ একরকম নয়—ভিন্নতা আছেই। যে নারীর দেহগন্ধ যেমন, স্বভাবতঃ তার কুচসুবাসও তেমন। কুচের যে সুবাস আছে, সে বিষয়ে কবির পরিষ্কার স্বীকারোক্তি—

"হ্যাঁ ভেসে আসে নারীর ভেজা চুল আর স্তনের ঘ্রাণ।"[৫]
(শামসুর রাহমান)

---

১. 'বিমানবালা'
২. 'সোনালি কাবিন' [সোনালি কাবিন]
৩. 'সিম্ফনি' [লোক লোকান্তর]
৪. 'আমার অভিধান' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]
৫. 'হ্যাঁ' [বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে]

যৌবনসুরভিভরপুর রমণীদের কার স্তনের সৌরভ কেমন—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা অর্জন বড়ই সুখপ্রদ ব্যাপার। কুচের মাদক ঘ্রাণ কবিকে গন্ধোন্মত্ত ক'রে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা ধারণ করে। গন্ধঅধীর কবি মাতালের মত বলতে থাকেন—'সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল।'[১] কুচরূপ দর্শনকালে তাই আমরা নাসিকাকে বড়ই সক্রিয় এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাই। জায়সী যখন বলেন পদ্মাবতীর কুচ-চন্দনস্তম্ভগন্ধে গন্ধোন্মত্ত হ'য়ে বক্ষস্থিত রোমাবলী ভ্রমরপংক্তির মতো নিবিষ্ট হ'য়ে আছে (মনহুঁ চঢ়ী ভউঁ রহ কৈ পাঁতী/চন্দন-খাঁভ বাস কৈ মাতী।।)—তখন আমরা বুঝতে পারি ভ্রমরের সঙ্গে কবির নাসিকাও গন্ধাবিষ্ট। নাসিকাকে জামীর কবিতায় দেখি কর্পূরগন্ধোমত্ত ("পয়োধর যুগল যেন... কর্পূরের প্রস্রবণে উত্থিত দুই বুদ্বুদ।"[২]), নজরুলের কবিতায় দেখি বকুল-গন্ধোমত্ত (বিকচ বুকের বকুল গন্ধ[৩]), এবং আবদুল কাদিরের কবিতায় দেখি কস্তুরীগন্ধোমত্ত (বুকের কস্তুরী-বাসে ফুলশয্যা দিল সে যে ভরি[৪])।

অনেক রূপসীর ভিড়ে একজনকে নির্বাচনের দুরূহ পরীক্ষাকালে দর্শনেন্দ্রিয় যখন ব্যর্থ হয়—ঘ্রাণেন্দ্রিয় তখন আশ্চর্য সফলতার পরিচয় দেয়। সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে নির্বাচনের সর্বোত্তম উপায়ই হচ্ছে কুচগাত্রে নাসিকা-সংযোজন। 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' কাব্যের 'চক্রবর্তী রাজার অট্টহাসি' কবিতায় কবি আল মাহমুদ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সেই সক্রিয় ভূমিকার কথা এভাবে ব্যক্ত করেন—

প্রতিটি নারীকে আঘ্রাণ করার নিমিত্ত আমি প্রথমার কাছে ফিরে এলাম
আমি তার বুকের কাছে মুখ নামাতেই
সে তার প্রথম বোতাম খুলে দিল। বহুদূরাগত নেবুফুলের গন্ধে
আমার মস্তিষ্ক ভরে যাচ্ছে।

... ...

আমি দ্বিতীয়ার কাছে পৌঁছুবার আগেই, সে তার পোশাকের

১. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. [ইউসুফ যোলাইখা] অনুবাদঃ সৈয়দ আলী আহসান
৩. 'ভীরু'
৪. 'পৃথিবীর প্রেম' [উত্তর বসন্ত]

২৬

২৪

দু'টি বোতাম খুললো। মৃগনাভির ঝাঁঝালো গন্ধে
আমার শরীর যদিও রোমাঞ্চিত...

... ...

আমি তৃতীয়ার বুকে তিনটি বোতামই খোলা দেখলাম।

দু'টি বর্তুল শঙ্খের মাঝে নাক ডুবিয়ে আমি প্রাণপন শুঁকতে লাগলাম।

ধূপের গন্ধে চিরকাল আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসে,
যেন আমি কোনো পূজামণ্ডপের অসংখ্য ধূপদানীর ধোঁয়ার আঁধারে
দেবীর মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তারপর উন্মত্তের মত আমি চতুর্থ, অর্থাৎ প্রান্তবর্তিনীর কাছে এসে
নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়লাম।...

নতমুখী রাজকন্যা দু'হাতে তার বুক চেপে ধরলো। আমি
দ্রুত তার কম্পিত হাত সরিয়ে দিলে, সে লজ্জায়
গ্রীবা বাঁকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরালো।

... ...

তার দু'টি মাংসের গোলাপ থেকে নুনের হালকা গন্ধ আমার
কামনার ওপর দিয়ে বাতাসের মত বইতে লাগলো। যেন আমি
লবণ পর্বতের পাদদেশে ঘুমিয়ে পড়বো।

স্তনগাত্রে শ্রবণেন্দ্রিয় সংযোজন ক'রে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের সংগীত শুনতে পান---'প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়।'[১] কখনো তিনি শুনতে পান রহস্যমধুরা প্রেয়সীর না বলা অনেক রহস্যকথা--

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা।
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর, কী কথা বুঝাতে চাও।
কিছু বলে কাজ নাই--শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,

১. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]

সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে
আমার আমারে; নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত,
সংগীততরঙ্গ ধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপি থরথর করি।[১]

অন্যান্য কবিরাও যদি শ্রবণেন্দ্রিয়ের এই সজাগ ব্যবহার ক'রে দেখেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যেমন পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুকে দেখেছি প্রিয়ার বুকে কান পেতে হৃদয়ের উদ্দাম গান, গোপন কথা শুনতে—

(১) তব বক্ষে রাখি' কান শুনিবো উদ্দাম গান
মুহ্যমান তব হৃদয়ের,
সমুদ্র কল্লোল-সম মিলাইবে বক্ষে মম
গীতোচ্ছ্বাস তোমার বক্ষের[২]

(২) ফুটফুট নরম বুকে টেনে নাও বাহুর টানে।
টেনে নাও আমায় তুমি ফুটফুট নরম বুকে,
হৃদয়ের গোপন কথা টিপটিপ নরম বুকে,
শোনো ঐ কইছে কথা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়।[৩]

আবার সঙ্গীতও নয়, কথাও নয়, কুচগাত্রে কর্ণযোজনা ক'রে কেউ কেউ শোনেন প্রিয়াবক্ষের হৃদ্‌স্পন্দন—

বুকে মুখ রাখি, হৃদ্‌স্পন্দন শুনি...[৪]
(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

কুচদর্শনে দাঁত, জিভের ভূমিকা খুবই তীব্র। কবিরা কখনো কামরাঙায় দাঁত বসানোর মত কুচে দাঁত বসিয়ে দেন,[৫] কখনো ডাঁসা পেয়ারার মত

১. 'মানসসুন্দরী' [সোনার তরী]।
২. 'বৈশাখী পূর্ণিমা' [পৃথিবীর পথে (কবিতা সংগ্রহ)]
৩. 'গান' [একটি কথা]
৪. [এই ভাই]
৫. কিশোরীর কামরাঙা কেড়ে নিয়ে দাঁত বসিয়েছি—(সেইসুখ/আবুল হাসান)

কচকচিয়ে চিবোতে থাকেন,[১] কখনো বা বিল্বফলের মত বৃহৎ কুচের চর্মকে ছিঁড়ে আবরণহীন কমলার মত ক্ষুদ্র ক'রে দেন।[২] এভাবে আস্বাদন-ক্রিয়ার সাহায্যেও চলতে থাকে অভিভূত রূপদর্শন।

আমি স্পর্শন, আঘ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদনের সঙ্গে দর্শনক্রিয়াকে মিলিয়ে ফেললাম ব'লে পাঠক আমাকে দোষারোপ করবেন না। ইন্দ্রিয়ের সীমা যখন কবিরাই ভেঙে ফেলেছেন, তখন আমি অনন্যোপায়। তিনটি উদাহরণ উপস্থাপিত করবো—প্রথমটিতে দর্শন-স্পর্শন একাকার, দ্বিতীয়টিতে দর্শন-আস্বাদন একাকার এবং তৃতীয়টিতে আস্বাদন-আঘ্রাণ একাকার।

চোখ দিয়ে প্রিয়তমের অঙ্গকে কি অপরূপভাবে স্পর্শ করা যায়। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করলেও বোধ হয় এমন হয় না। বিদ্যাপতি তেমন একটি চিত্র এঁকেছেন—"রাধা কৃষ্ণের সুন্দর অঙ্গ লক্ষ্য"[৩] করলেন "যেন পদ্মপত্র স্পর্শ"[৪] করলেন। সরোবরে শিহরিত চিকন শ্যামল পদ্মপত্রের মত কৃষ্ণের দেহ—রাধার নয়ন জলবিন্দু হ'য়ে সেই দেহপত্রে লাবণ্যনিটোল মুক্তার মত সরে বেড়াচ্ছে! কি চমৎকার কবিকল্পনা! নয়ন দিয়ে রাধা এখানে কৃষ্ণদেহ স্পর্শ করেছেন। এবার দেখা যাক দর্শন—আস্বাদন একাকার হয়েছে কিভাবে—

ঘূর্ণমাননয়নং স্খলংকথং স্বেদবিন্দু মদকারণস্মিতম।
আননেন ন তু তাবদীশ্বরশ্চক্ষুষা চিরমুমামুখং পপৌ ॥[৫]

(কালিদাস)

("উমার নয়ন ঈষৎ আঘূর্ণিত, কথা জড়িয়ে আসছে, দেহে দেখা দিয়েছে স্বেদবিন্দু, মুখে ফুটে উঠেছে অকারণ মৃদু হাসি! উমার মুখের সেই সৌন্দর্য-সুধা শঙ্কর অনেকক্ষণ ধ'রে নয়ন দিয়েই পান করলেন, মুখ দিয়ে নয়।"[৬] —অনুবাদঃ ডঃ মুরারিমোহন সেন)। মুখের বদলে চোখ যে এখানে

---

১. পেয়ারার মত তুলে/নিই পরীর পেয়ারা স্তন ('ব্যাধি'/হুমায়ুন আজাদ)

২. অছল জোর সিরীফল ভাঁতি।
কএলহ ছোলঙ্গ নারঙ্গ কাঁতি ॥ (বিদ্যাপতি)

৩-৪. ২৩৯, বিদ্যাপতি

৫. [কুমারসম্ভবম্]

৬. [কুমারসম্ভবম্ (সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার)] নির্বাহী সম্পাদক ঃ প্রসূণ বসু

পানক্রিয়া সম্পাদন করেছে কালিদাস সেকথা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। বোদ্‌লেয়ারের কবিতায় দেখি মুখ দিয়ে কবি গন্ধ পান করেন—

> যখন দু'চোখ বুঁজে, হেমন্তের আতপ্ত সন্ধ্যায়,
> পান করি তোমার আকুতিময় স্তনপরিমল,[১]
>
> (অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

এখানে বুদ্ধদেব বসু 'গন্ধ'র কথা কখন বললেন?

তাই বলছিলাম, ইন্দ্রিয়ের সীমা যখন কবিরাই অতিক্রম করেছেন, সমালোচক তখন অনন্যোপায়।

স্তন বর্ণনায় প্রাচীন ও আধুনিক কবির তুলনা-আলোচনা

রমণীবক্ষের যৌবনমথিত, আশ্চর্য ভঙ্গিতে উত্থিত যুগল মাংসখন্ড যুগে যুগে কবিদের কি মুগ্ধ মনোযোগই না আকর্ষণ করেছে—জন্ম দিয়েছে কত না অনুপম চরণের। এখন আমরা স্তনবর্ণনায় প্রাচীন এবং আধুনিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের প্রয়াস পাবো। মধ্যযুগের কবিরা স্তন-প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে আদিরসের উত্তেজনা অনুভব করতেন—উত্তেজনাটা ছড়িয়ে দিতেন নায়কের মনে এবং পাঠকের মনেও। স্তন-ডালিমের লালিমা শ্রীকৃষ্ণের দেহপিপাসাকে কি সুতীব্র ক'রে তুলেছে—বড়ু চণ্ডীদাস দুটি চরণে তা প্রকাশ করেছেন—'ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে/তাহাত মজিল মন আহ্মারে॥' অস্থির রতি-আবেগে তাই কাঁচুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে রাধার কুচস্পর্শের লোলুপ বাসনা প্রকাশ করেন শ্রীকৃষ্ণ—'কাঁচুলী করিবোঁ চীর/হাথ দিবোঁ তাহার তনে॥' এতক্ষণ বিভিন্ন প্রসঙ্গে চয়িত বিদ্যাপতির

---

১. 'দূরাগত সুবাস' [বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা]

উদ্ধৃতিগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা একথা বুঝতে পারছি, রূপবাদী বিদ্যাপতি কুচরূপচিত্রণের সময় কি রকম শৃঙ্গার-উন্মাদনা অনুভব করতেন। কৃষ্ণ যখন রাধার স্তন লুণ্ঠনোদ্যত—বেচারী রাধা যখন হাত দিয়ে বিদ্যুৎশিহরিত কুচের অসহ্য পুলকাবেগ ঢাঁকতে পারছেনা ("বিদ্যুৎ পড়িবার সময় ঢাঁকা যায়না"[১])—সেই দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকালে লুণ্ঠনকারী তো আসলে বিদ্যাপতি নিজেই। ক্ষুধিত দাঁত নখে কুচশ্রীফলকে ছিঁড়ে কমলাকৃতি ক'রে দেবার সময় কৃষ্ণের যে সুতীব্র শারীর-উন্মাদনা—সে উন্মাদনা তো ব'য়ে যাচ্ছে কবিরই শিরায় শিরায়। উন্মত্ত কামনার উচ্ছৃংখল উল্লাসের ছবি সেজন্যই তো এমন বাস্তবরসাশ্রিত হ'তে পেরেছে। গোবিন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণের কামী-হৃদয় যখন রাধার কুচকলসে স্বেচ্ছাবন্দীত্ব লাভ ক'রে পুলকিত হয় ('জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি / মুহরি রাখল কত বেরি।।')—তখন সে বন্দীত্ববরণের পুলকানুভব আসলে তো গোবিন্দদাসেরই। 'হিয়ার মাঝারে মানিক ছিরি'র দিকে লোভাতুর নয়নে তাকিয়ে থাকেন কবি জ্ঞানদাস। শ্রীফল-পীড়ণ-কামনা চমকাতে থাকে দৌলৎ কাজীর চোখেও, যখন তিনি বলেন—'মন্মথ-মথিত যে সম্পূর্ণ শ্রীফল/নিবিড় নির্মল কুচ মুকুল কোমল।।' 'স্বইচ্ছায় কর দিতে সবার আরতি'—এ আরতি তো স্বয়ং কবি আলাও-লেরও। কামাবেগে আঃলাড়িত হ'তে হ'তেই তিনি রত্নসেনের পদ্মাবতী-আলিঙ্গনের সুখকথা লিখেছিলেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় পদ্মাবতীর কঠিন শ্রীফল দুটির পীন কঠিন চূড়া দু'টি যেন কবিরই বক্ষ স্পর্শ করেছিল—তাই এমন বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট পংক্তিদ্বয় সৃষ্টি হয়েছিল—'কঠিন হিয়ার দুই শ্রীফল কঠিন / গাঢ় আলিঙ্গনে রহে পীন উরে চিন।।' আলাওলের মত বিদ্যুতায়িত হ'তে হ'তে দোনা গাজীও মিশররাজের বাসরবর্ণনা ক'রে-ছিলেন—'ক্ষেনেকে হিয়ার ভিতে ক্ষেপে দুই কর/কুচযুগ মর্দন করএ নিরন্তর।।' দীর্ঘক্ষণ কুচমর্দনের বিলম্বিত তৃপ্তি এই কবির কাম্য। তাই সয়ফুল-বদিউজ্জামালের রসকেলিচিত্রণকালেও তিনি বলেন—'বুকে বুকে লাগাইয়া কাঞ্চুলি করি দূর / করযুগে কুচযুগে মর্দএ প্রচুর।' কলাবতী সখীরা পর-স্পরের কুচমন্থন করছে দেখে লুব্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকেন আবদুল হাকিম—শিহরিত হ'য়ে ওঠে তাঁর করতল—'কেহ কারো তুলে আসি উরের বসন/ কেহ কারো যুগ কুচ চাপে ঘন ঘন।।' শিহরিত হয় মানিকরাম গাঙ্গুলির

১. ৪৮৮

করতলও, যখন তিনি লেখেন—'কার করে কর কার কুচে করার্পণ।' বিদ্যার কুচপদ্ম যখন সুন্দরের করতলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, তখন ভারতচন্দ্রের করতলই আসলে স্বস্তিসুখ অনুভব করছিল, 'কুচপদ্মকলি কবিরাজ করে / ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে।।'

উদ্ধৃতি আর না বাড়িয়ে একথা বলতে পারি যে, মধ্যযুগের প্রায় সব কবিই কুচরূপ চিত্রণের সময় ইন্দ্রিয়াবেগের আত্মহারা সুখোল্লাস অনুভব করতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মধ্যযুগের লোককবিরা কুচপ্রসঙ্গে প্রায় নীরব। সর্বসমক্ষে সজোরে আবৃত্তি করতে হতো ব'লেই বোধ হয় এই অবস্থা। লোকসাহিত্যগুলো নিরিবিলি একাকী পড়ার অবকাশ ছিল না। যে পারিবারিক পরিবেশে লোককবি তাঁর রচনা শোনাতেন, সেখানে 'কন্যার গাওয়ে ফুট্যা রৈছে য়ে কনকচাম্পার ফুল'[১] অথবা 'আশ্বিন মাসেতে যেমন পদুমের কলি / বসনে ঢাঁকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি'[২]—এইটুকু বলাই সম্ভব ছিল—তার বেশি কিছু নয়। তাছাড়া সংকোচ কাটিয়ে এরকম বর্ণনাও করেছেন দু'একজন—সকলে নয়। অপরপক্ষে রাজা শিবসিংহ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং আরাকানরাজেরা ইন্দ্রিয়বিলাসী ছিলেন ব'লে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট কবিদের অনিবার্যভাবেই ইন্দ্রিয়রসসুখলিপ্সার পদ রচনা করতে হয়েছে। তাই কবিতায় ইন্দ্রিয়ের বর্ণরশ্মিপাত করার সময় কবিরাও স্বভাবতঃই মাদক পরিরম্ভনপুলক অনুভব করেছেন। ভারতচন্দ্রের পর এই প্রবণতা আর দেখা যায় না। যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরগুপ্ত কবিতায় 'মাগী', 'রাঁড়ী', 'ছোঁড়া', 'ছুঁড়ী' ইত্যাদি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তিনিও কুচপ্রসঙ্গে রতাতুর হননি। আসলে মধ্যযুগের সীমান্তসীমায় এসে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র উন্মুক্ত শৃঙ্গারলীলার ওপর ঐ যে পর্দাপতন হলো—সঙ্গে সঙ্গে যুগরুচি গেলো পালটিয়ে—সমস্ত রবীন্দ্র-যুগে ঐ পর্দা আর উত্তোলিত হলোনা। তাই কবিতায় আধুনিককালের সূচক মধুসূদনকে দেখছি এ প্রসঙ্গে সংযতবাক। তিনি যখন কুচপ্রসঙ্গ তোলেনও, তখন শুধু আকৃতিক সাদৃশ্যই তোলেন এবং বিশেষ শৃঙ্গার-উন্মাদনা বোধ করেন না। নিছক সৌন্দর্যরসিকের দৃষ্টিতেই তিনি রতির

---

১. বাদ্যানীর গান, [বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড অপরার্ধ)] শ্রীসুকুমার সেন
২. [মৈমনসিংহগীতিকা (কমলা)] দ্বিজ ঈশান

কদম্বগঠন স্তনের দিকে, তিলোত্তমার পর্বতাকৃতি স্তনের দিকে দৃক্‌পাত করেন। মধুসূদনের উন্মাদনা অন্যত্র—সেই উন্মাদনা নব ছন্দের আন্দোলনে, শব্দের বিলাসলীলায়, উপমাদির নতুন বৈভবে। হেমচন্দ্র, নবীন সেন, কায়কোবাদের সময় কেটেছে মধুসূদনের অন্ধ অনুকরণমোহে, মহাকবি হবার বিহ্বল বাসনায়। কুচবিষয়ক অলংকার তাঁদের রচনায় সীমিত এবং গতানুগতিক। 'ভোরের পাখি'র মতো একান্ত নিভৃতে নিজের গান নিজে শোনাতেই বিহারীলালের আনন্দ। কুচবিষয়ে তিনিও তেমন উচ্চবাচ্য করেন না।

রবীন্দ্রনাথ স্তনকে উপলক্ষ্য ক'রে আস্ত একটা কবিতা লেখেন, তার নামও দেন 'স্তন'। কিন্তু সে কবিতা পড়লে মনে কামভাব তো জাগেইনা, বরং এক নির্মল রসে মনটা পবিত্র হ'য়ে যায়। স্তনের গড়ন সম্পর্কে তাতে আভাস থাকলেও, তার রঙ, তার বৃন্ত, তার চুম্বক-আকর্ষণ সম্পর্কে সে কবিতায় কিছু বলা হয়নি। দৃষ্টিগ্রাহ্য কিছু উপমার সাথে কিছু শ্রুতিগ্রাহ্য উপমাও ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে; যেমন, পর্বত—দৃষ্টিগ্রাহ্য, সঙ্গীত—শ্রুতিগ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা হচ্ছে, ইন্দ্রিয় নিয়ে লিখলেও তিনি ইন্দ্রিয়াতীত লোকে চলে যাবেন—ইন্দ্রিয়ঘনতাকে জাগিয়ে তুলবেন না। পরম ভক্তিতে নারীর স্তনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে তাই তিনি বলেন, 'দেবতা বিহারভূমি কনক অচল।' নারীবক্ষকে বিদ্যাপতিও দেবাদিদেব শিবের অধিষ্ঠানভূমি করেছিলেন—উগ্র কামকেন্দ্রে টেনে নিয়ে এসেছিলেন আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু বিদ্যাপতি আসলে দেহবাদী। তাঁর দেবপূজা এবং দেহপূজা একত্রে। বিদ্যাপতি যে সারাজীবন কলারসরসিত উজ্জ্বল মদনগীতি গেয়েছেন—একথা কে না জানে? 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'[১]—এ গান গাওয়ার চেয়ে বরং 'পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ' এ গান গাওয়াতেই বিদ্যাপতির বেশী সুখ। মধ্যযুগের আরও অনেক কবি স্তনকে 'হর' নাম দেন—'কুচযুগ হেমগিরি হর মনোহর'[২], 'দেখ হে নাগর কুচ কনক মহেশে',[৩] 'ক্ষীরধর গিরি কুচ হর নাম ধরে'[৪], ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁদের

১. [গীতাঞ্জলি]
২. ঘনরাম চক্রবর্ত্তী
৩. মানিকরাম গাঙ্গুলি
৪. নওয়াজিস খান খোন্দকার

হরপূজাটা যে তান্ত্রিক পর্যায়ের, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই পূজাক্রিয়ায় আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বাসনাঘনতা এত বেশী, যে বলা যায় দেবতাকে রমণী-বক্ষে আত্মসাৎ করার এক অভিনব পন্থা কবিরা আবিষ্কার করেছিলেন। স্তনকে হর কল্পনা করার মধ্যে মধ্যযুগীয় কবিদের একটি সুতীব্র ইচ্ছা কাজ করে। নায়িকাকে মদনাক্রান্ত করাই হচ্ছে সেই ইচ্ছা। হরকে দেখা-মাত্র মদনদেব যে প্রতিশোধস্পৃহ হ'য়ে উঠবে—এ তো জানা কথা।

আবার ফিরে যাওয়া যাক রবীন্দ্রযুগে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিদের স্তনপ্রসঙ্গে উচ্চকণ্ঠ হ'তে সংকোচ ছিল মনে হয়। নজরুলের যেন এ ব্যাপারে খুবই কুণ্ঠা ছিল। তাঁর প্রেমকোমল কবিতারাজি খুঁজে খুঁজে এ ব্যাপারে তেমন কোনো স্পষ্ট উচ্চারণ পাওয়া যায়না। সত্যেন দত্ত ছন্দ-নিরীক্ষা নিয়েই দারুণ মেতে ছিলেন—এ ব্যাপারে তাঁর অত মাথাব্যাথা নেই। জসীমউদদীন পল্লীর কিশোর-কিশোরীর অকপট হৃদয় এবং অকৃত্রিম প্রেমের ব্যাখ্যায় বিভোর ছিলেন। দুলীর 'লাল মোরগের পাখার মত'[১] শাড়ীর আঁচল-ওড়া তিনি দেখেছেন—কিন্তু আঁচলের তলার রাজ্যে প্রবেশে তাঁরও সংকোচ। 'হলদে পাখির ছা'[২] ব'লে এককথায় তিনি নায়িকাকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরলেন। তার প্রতি প্রত্যঙ্গ তন্ন তন্ন ক'রে ব্যাখ্যা করেননি। সমগ্র জসীম-কাব্য পরিক্রমা করলে বসনাবৃত কুচের দু'চারটি গতানুগতিক উপমা পরিদৃষ্ট হয়। আসলে রবীন্দ্রযুগের কবিরা নারীর উন্মুক্ত রূপের চেয়ে তার আবৃত রূপেই বেশী মাধুর্য খুঁজে পেতেন। পুরাতন কবিদের মানসগঠন এবং রচনাভঙ্গির সঙ্গে এ যুগের কবিদের মানসগঠন এবং রচনাভঙ্গির বিস্তর অমিল। অনাবৃত শরীর এবং শরীরের নগ্নতার কথা অসংকোচে বলা পুরাতন কবিদের পক্ষে যতখানি সহজ ছিল—রবীন্দ্রযুগের কবিদের পক্ষে ততখানি সহজ হয় না। জয়দেব 'বিরহ' মানে বুঝতেন 'রতি-বিরতি'—সেই ধারণা রবীন্দ্রযুগে পালটে গিয়েছিল। কল্লোলযুগে আবার ফিরে এসেছিল দেহবাদ। নারীদেহের প্রতি বিলোকন-কামী নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি বুদ্ধদেব বসুকে--'কূল ছাপিয়ে ওঠে তোমার দুই বুক, আমার হাতের স্পর্শে'[৩]—ব'লে অধীর হ'তে দেখেছি

১—২. [সোজন বাদিয়ার ঘাট]
৩. 'এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে' [নতুন পাতা]

তাঁকে। তবে জীবনানন্দ এই প্রসঙ্গে সরব নন। তাঁর সমস্ত কাব্যজগত পরিভ্রমণ ক'রে এলে কুচসম্পর্কিত তিনটে কি চারটে উপমা খুঁজে পাওয়া যায়—কিন্তু সেই উপমা কেমন যেন করুণ, কেমন যেন আর্দ্র, কেমন যেন হিম হিম—তাতে কামনার উষ্ণতা নেই (১. সে কতো শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শঙ্খের মতো স্তন,[1] ২. বুকে তার লাল-পেড়ে ভিজে শাড়ি করুণ শঙ্খের মতো ছবি / ফুটাতেছে;[2], ৩. শাদা স্তন ঝরে / করবীর; কোন্ এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে গেছে ফুল, / তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে: নরম ব্যাকুল।[3] ৪. হাড়পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে হিম হয়ে গেছে তার স্তন'[4], ৫. ভেঙেছে নাকের ডাঁশা,—হিমস্তন,—হিম রোমকূপ[5]!)। ফররুখকে এ ব্যাপারে বড় নিরাসক্ত মনে হয়। এই দলের আর একজন হচ্ছেন আহসান হাবীব। অতি-আধুনিক যুগের কবিদের দেখেছি স্তনপ্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় কবিদের মতই সোচ্চার হ'য়ে উঠতে। শরীরকে কেন্দ্র ক'রেই এঁদের কবিতা তৈরী হয়। এবং এই অত্যাধুনিক কবিরা স্তনপ্রসঙ্গে লজ্জাশূন্য ইন্দ্রিয়োত্তেজনা অনুভব করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা মধ্যযুগীয় কবিদের সগোত্র।

কুচচর্চাকালে অতি-আধুনিক কবি কি রকম কামাতুর হ'য়ে পড়েন, তার দু'চারটি দৃষ্টান্ত—

১. সুমেরু পর্বতে আমি মাথা রাখি
সমুদ্রের ঢেউ লাগে হাতের আঙুলে
উরুর ভিতরে অগ্নি...এত মোহময়...
অরণ্যের গন্ধমাখা...
নিঃশ্বাসে পলাশ ঝড়,[6]
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

---

১. 'এ-সব কবিতা আমি' [রূপসী বাংলা]
২. 'এই পৃথিবীতে আমি' [ঐ]
৩. 'জীবন অথবা মৃত্যু' [ঐ]
৪. 'সোনার খাঁচার বুকে' [ঐ]
৫. 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' [বেলা অবেলা কালবেলা]
৬. 'সুন্দরের পাশে' [মন ভালো নেই]

২. অসিত শিখার মতো চুল আর স্তনাভা তোমার,
দাও, দাও, আমাকে দেখতে দাও। সব দ্বিধা হোক
দূর, হও উন্মীলিত, আমাকে বলতে দাও কথা—
যে-কথা বলেনি কেউ কোনোদিন রমণীকে তার।[১]
(শামসুর রাহমান)

৩. বুকের ওপর মৃদু কম্পমান নখবিলেখনে
লিখতে কি দেবে নাম অনুজ্জ্বল উপাধিবিহীন?
শরমিন্দা হ'লে তুমি, ক্ষান্তিহীন সজল চুম্বনে
মুছে দেবো আদ্যাক্ষর, রক্তবর্ণ, অনার্য প্রাচীন।
... ...
চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ
উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়,
ঠোঁটের এ লাক্ষারসে সিক্ত ক'রে নর্ম কারুকাজ
দ্রুত ডুবে যাই এসো, ঘূর্ণমান রক্তের ধাঁধায়[২]
(আল মাহমুদ)

৪. প্রিয়তম পুরুষটি এক পা একটুখানি উঁচু করে
বিছানায় ভেসে আছে দেবদূত
সুকুমার ডৌলভরা মাংসল ব্রোঞ্জের উরু
অবিশ্বাস্য নিখুঁত সহজ গ্রীক ভাস্করতা
হঠাৎ সচল হয়ে ডাকে তরুণীকে।
দু হাতে জড়ানো নারী
তার উর্ধ্বশরীরের গভীর সৌকর্য ফেলে রেখে
গা শিরশিরে লোভে
দু পায়ের ফাঁকে এসে মুখ গুঁজে দেয়—
গ্রীষ্মের ঠিক আগে মাইল মাইল ব্যাপী সরলবর্গীয় বনে ঝড়
একটানা আতশবাজীর তীব্র রঙচঙে চক্কর
স্তনান্তরে ঢেউ লাগে,[৩]
(দেবারতি মিত্র)

---

১. 'যে কথা বলেনি কেউ' [মাতাল ঋত্বিক] ২. 'সোনালি কাবিন' [সোনালি কাবিন]
৩. 'পৃথিবীর সৌন্দর্য, একাকী তারা দুজন [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]

৫. রান্নাঘর থেকে টেনে এনে স্তনগুচ্ছে চুমু খাও তাকে
বাথরুমে ভেজানো দরজা ঠেলে অনায়াসে ঢুকে যাও
সে যেখানে নগ্ন হ'য়ে স্নানার্থেই তৈরী হ'য়ে আছে[১]
(নির্মলেন্দু গুণ)

৬. নিচু হয়ে তার স্তনের বোঁটায় বুলিয়ে দিলাম তৃষ্ণাতুর জিভ
চুরি করে গন্ধ নিলাম উরুতে রাখলাম হাত
পাপ টাপের কথা আমার একবারও মনে পড়েনি[২]
(বেলাল চৌধুরী)

আমরা লক্ষ্য করলাম বড়ু চণ্ডীদাসের সেই শারীর-উন্মাদনা— 'কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর / হাথ দিবোঁ তাহার তনে' কিংবা দোনা গাজীর সেই কামাতুরতা 'কুচযুগ মর্দন করএ নিরন্তর'—শুধু অন্য ছন্দে, অন্য আঙ্গিকে।

আমরা মধ্যযুগীয় কবিদের দেখেছি উগ্র কামকেন্দ্রে আধ্যাত্মিকতা আরোপ ক'রে কিভাবে তাঁরা ছলনাজাল বিস্তার করেন—দেখেছি পূজাক্রিয়ার কথা ব'লে কিভাবে তাঁরা শৃঙ্গার-উন্মাদনাকেই উৎসাহিত করেন। কুচহরকে করকমলে[৩] অথবা নখের রক্তকিংশুকে[৪] পূজা করতে গিয়ে, কুচঘটকে সজ্জিত[৫] করতে গিয়ে অথবা কুচমন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে[৬] কিভাবে তাঁরা কামাবেগে তীব্র আন্দোলিত হতেন, আমরা জানি। রবীন্দ্রযুগে কিন্তু কুচচিত্রণকালে কবিরা দেবতা, মঙ্গলঘট, বেদী বা মন্দিরপ্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন যখন, তখন কামনার স্থূলত্ব থেকে উত্তরণ চেয়েছেন নির্মলতায়, পবিত্রতায়, যেমন—

১. পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা-বিহারভূমি কনক-অচল।

---

১. 'স্ত্রী'
২. 'অবিরল সূর্য, জল আর কবিতার' [আত্মপ্রতিকৃতি, স্থিরজীবন ও নিসর্গ]
৩. উৎপলে পূজত হেমক শিব। (জ্ঞানদাস)
৪. "তোমার পীন পয়োধরে সুন্দর নখচিহ্ন, সোনার শিবকে কেহ কিংশুক ফুলে পূজা করিয়াছে।" (বিদ্যাপতি)।
৫. কুচ হেম-ঘটে নখরক্তছটা / বলিহারি স্বরঙ্গ প্রবাল ঘটা॥ (ভারতচন্দ্র)।
৬. তুয়া কুচমন্দির য়েন কনকের গুর/প্রবেশ করিতে মুঞি চাহো। (দ্বিজ মাধব)

উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
... ...
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে,
বিমল পবিত্র দুটি বিজন শিখরে।[১]
(রবীন্দ্রনাথ)

২. স্বর্গ হতে মূর্ত্তি ধরে মর্ত্তে আসে মা।
সাত সাগরের রত্ন আনে, যত্নে হৃদিতল,
সাত সাগরের পীযুষ আনে স্নিগ্ধ ঢল ঢল।
চক্ষে আসে সূর্য্য শশী, বক্ষে বরুণা
ইন্দিরা বর স্বর্ণঘটে শুভ্র করুণা।[২]
(কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

৩. আমি যে দেখেছি
কামনার কুঁড়িভরা তোমার অধরোষ্ঠ ;
আমি যে দেখেছি
কিশোরী পূজারিণীর নিপুণ হাতে গড়া
শিবপূজার যুগল বেদী তোমার বক্ষে।
(প্রমথনাথ বিশী)

৪. মন্দির চূড়া অবনত হ'য়ে চুমিছে কি দেবতারে?[৩]
(যতীন্দ্রমোহন বাগচী)

(নত হ'য়ে মাতা তার নবজাতককে অবলোকন করছে--এমন অবস্থার বর্ণনা।)
কিন্তু অতি-আধুনিক কবিকুল মধ্যযুগীয় কবিদের মতই আদিমতায় আক্রান্ত হয়েছেন সম্ভোগপ্রসঙ্গকে পূজাপ্রসঙ্গে রূপান্তরকালে, যেমন—

১. বাহুতে হিল্লোল তুলে এগিয়ে এলো জলের স্রোতে জ্যোৎস্নার মতো চঞ্চল
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে যেমন রৌদ্রকনা, তেমনি তার কঙ্কনের রশ্মি
শঙ্খের মতো গ্রীবা, দুটি কান যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু,
বুকের দুটি মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মতো বিদগ্ধ ও বর্তুল,

১. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]
২. 'মা' [বনমল্লিকা (কুমুদ কাব্যমঞ্জুষা)] ৩. [কাব্যমালঞ্চ]

শরতের বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ ও আর্দ্র তার দৃষ্টি.
তার আননে চৈত্রপূর্ণিমার আকাশের আনন্দ.
মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দ তার জানুতে ও জঙ্ঘায়—
এমনি ক'রে এগিয়ে এলো, তার নিশ্বাস স্পর্শ করলো আমাকে

পুষ্প, ধূপ, চন্দন ও ঘৃতভুক অগ্নির চেয়েও সে সুগন্ধি,
তার স্পর্শে আমার চোখে নামলো ধ্যানমগ্ন তিমির,
স্তব্ধ হ'লো হৃৎপিণ্ড, সব ইন্দ্রিয় রুদ্ধ,
ডুবলো এই দেহ-মন গভীর থেকে আরো গভীরে, শূন্য থেকে
গাঢ়তর শূন্যে ;[১]

(বুদ্ধদেব বসু)

২. শিথিল করেছি সুনীল আঁচল,
মধুতে ভরেছি মোর মুঠিতল ;
টুটি' যাবে বুঝি কনক কাঁচল
উরস রসের ভারে ;
দেহ-ধূপে করি রূপের আরতি
অরূপ-অন্ধকারে ॥[২]

(আবদুল কাদির)

৩. ভেবেছি তো অন্ধকারে আমি হবো রাতের পুরুত
আদিম মন্দিরে একা তুমি এসো নগ্নতার দেবী
. . .   .
শুরু হোক স্তোত্রপাঠ গন্ধবতী তোমার সুনামে,
পীতাভ ধোঁয়ার তলে ডুবে যাক মন্দির, দেহলি,
শঙ্খমাজা স্তনদুটি মনে হবে শ্বেত পদ্মকলি,[৩]
(আল মাহমুদ)

১. 'মরচে পড়া পেরেকের গান'
২. [সফল বসন্ত]
৩. 'সিম্ফনি' [লোক লোকান্তর]

অতি-আধুনিককালের কবি যখন 'আদিম মন্দিরে' একলা হন 'রাতের পুরুত', 'দেহধূপে' 'রূপের আরতি' করেন 'অরূপ-অন্ধকারে' আর 'নগ্নতার দেবী' যখন 'জানুতে ও জঙ্ঘায়' তোলেন 'মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দ'—তখন বুঝতে পারি কামনার সেই সম্মোহন কত তীব্র। পূজাক্রিয়ায় যৌনতার এই তীব্র উদ্গীরন আমাদের নিয়ে যায় সেই মধ্যযুগীয় কবির কাছে, নখক্ষতে ক্ষতাক্ত কুচদ্বয় দর্শনে যিনি উল্লসিত—("তোমার পীন পয়োধরে সুন্দর নখচিহ্ন, সোনার শিবকে কেহ কিংশুক ফুলে পূজা করিয়াছে"---বিদ্যাপতি) অথবা উল্লসিত বিপরীত রতিতে পূজাদৃশ্য দর্শনে ("মুক্ত কবরী ও অবনত আনন অনাবৃত স্তন স্পর্শ করিতেছে। যেন কাম কমল (বদন) লইয়া চামর (কেশ) চালিয়া স্বর্ণশম্ভু (পয়োধর) পূজা করিল"[১]---বিদ্যাপতি)।

মধ্যযুগীয় কবিদের কাব্যে নায়িকার 'রূপবর্ণনা' নামক আলাদা অধ্যায় থাকতো। সেই 'নখশিখ' অধ্যায়ে নায়িকার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিমুগ্ধ রূপপ্রেক্ষণ থাকতো। প্রত্যেক অঙ্গের জন্য সৃষ্ট হ'ত উপযুক্ত উপমা। কিন্তু আধুনিক যুগের কবিরা নারীকে সামগ্রিকভাবে দেখেন। একটি কি দু'টি চরণে হয়তো একজন রমণীর আপাদমস্তক আমরা লক্ষ্য করি—যেখানে মধ্যযুগের কবিদের ব্যয় করতে হ'ত অনেক সমুগ্ধ চরণ। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন---'ঘরেতে এলনা সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া/পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।।'[২] —তখন সেই অনামিকা মেয়েটির অনেকখানি দেহরূপ এবং আন্তররূপ এই দুই চরণে উদ্ঘাটিত হ'য়ে যায়---মধ্যযুগীয় কবিদের অনেক ব্যয়িত চরণেও হয়তো এতখানি রূপ ধরা পড়তোনা। কিংবা 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে/দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে'[৩]—এই রমণীর জন্য কোন তুলনা উপমার প্রয়োজন হয় না—কোন উপমান ছাড়াই সে তুলনাহীনা। উপমানের প্রতি কোনো তোয়াক্কা না রেখে শুধু উপমেয়ের প্রতিই বিশেষ ভঙ্গিমায় মমত্ব আরোপ ক'রে রমণীকে যে কি অপরূপতা দেয়া যায়, তার একটি দৃষ্টান্ত—

১. ৪৯২
২. 'বাঁশি' [পুনশ্চ]
৩. [স্বরবিতান]

ঐ কণ্ঠ, ঐ কপোত কাঁদানো রাগিনী,
ঐ আঁখি, ঐ মুখ,
ঐ ভুরু, ললাট, চিবুক,
ঐ তব অপরূপ রূপ,
ঐ তব দোলো-দোলো গতি-নৃত্য দুষ্টদুল রাজহংসী জিনি'—
চিনি সব চিনি।[১]

(নজরুল)

—এখানে প্রত্যেক উপমেয়ের শুরুতে 'ঐ' শব্দ প্রিয়ার প্রতি কবির নিবিড় পরিচয়, গভীর ভালোবাসা এবং সমুগ্ধ রূপাসক্তির পরিচায়ক। উপমান ছাড়া শুধু উপমেয়কে ভর ক'রে মধ্যযুগে এমন অপরূপ রূপসৃষ্টি আশা করা যেতো-না (উদ্ধৃতিটিতে যে একটিমাত্র উপমান রয়েছে, সেটি রমণীর কর্ণাভরণের—অঙ্গ-উপাঙ্গের নয়)। উপমান বর্জন ক'রে সৌন্দর্যসৃষ্টি তো দূরের কথা—মধ্যযুগে বরং একটি উপমেয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হ'তো অনেক উপমানকে। রবীন্দ্র-নজরুল-সৃষ্ট এই সুন্দরীদের পাশে মধ্যযুগীয় কবি সালবেগ-সৃষ্ট এক সুন্দরীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটি সত্য উপলব্ধি করা যাক—

কনক-কেতকি-চম্পা-তড়িত-বরণী।
ইন্দিবর-নিলমনি-জলদ-বসনী ।।
মৃগজ-পঙ্কজ-মিন-খঞ্জন-নয়নী।
কাম-ধনু ভ্রমর-পংক্তি ভুরু-ভুজঙ্গিনী ।।
নাসা তিলফুল-খগ-চম্পা-কলি জিতা।[২]

—দেখা গেলো, মধ্যযুগীয় এই কবি কেতকী, চাঁপা, তিলফুল, মৃগ, মীন, খঞ্জন, ভুজঙ্গ সব স্তূপীকৃত ক'রে রাধাদেহে যেভাবে চাপিয়েছেন, তাতে উপমান-গুলো হ'য়ে পড়েছে লাবণ্যপ্রবাহহীন—ব্যঞ্জনাশূন্য। কেবল একটা তাৎক্ষনিক সাদৃশ্য স্থাপন ক'রেই এদের আয়ু অবসিত। রাধার এক একটি অঙ্গ-উপাঙ্গের জন্য উপমানের শ্রেণী সজ্জিত করার মধ্যে কবিহৃদয়ের ব্যাকুলতা ধরা পড়েছে বটে। রূপময়ী রাধার প্রতি প্রত্যঙ্গের উপমান চয়ন করতে গিয়ে কবি একটিতে তৃপ্ত নন। এই অতৃপ্তির জন্যই রাধার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গের

১. 'পূজারিণী' [দোলন-চাঁপা]
২. [শ্রী শ্রী পদকল্পতরু (চতুর্থ খণ্ড)]

জন্য প্রতিক্ষেত্রেই একাধিক উপমান চয়ন করেছেন। কিন্তু তাঁর চয়িত উপমানগুলো সবই সনাতন এবং সনাতন তার প্রয়োগভঙ্গিমা---যেজন্য সুন্দরীর দেহে সজীব, সচল দ্যুতি সঞ্চারিত হওয়ার পরিবর্তে লেগেছে আড়ষ্টতা। মধ্যযুগের আর এক কবি বিদ্যাপতি যখন 'নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরী কি বেলি'---ব'লে এক চরণে রাধার কুচের চারটি উপমান অন্বেষণ করেন---তখন স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কোন্ উপমানটি ছেড়ে কোনটি তিনি গ্রহণ করবেন বুঝতে পারছেন না। এতে কুচের সঠিক রূপচিত্রণের জন্য তাঁর হৃদয়াবেগ ধরা পড়ে বটে কিন্তু অভিনব উপমান নির্মাণের আনন্দাবেগ ধরা পড়েনা। অপরপক্ষে আধুনিককালের কবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে/বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়'[১]—তখন সেই পংক্তি-মালায় উপমানের সংখাধিক্যের জন্য উল্লাস বা উপমান-নির্ধারণে সিদ্ধান্ত-হীনতার জন্য অধীরতা ধরা পড়ে না—যা ধরা পড়ে, সেটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নূতন একটি উপমান নির্মাণের অভিভূত আনন্দ।

বোধগম্য হলো, নারীর এক একটি অঙ্গের জন্য অনেক উপমান সৃজন করতেন মধ্যযুগের কবিকুল—আধুনিক কবি একটি উপমানেই সন্তুষ্ট। নয়ন সম্পর্কে আধুনিক কবি যখন বলেন—

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম
ওই নয়নের

নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য শিখা।[২]

—তখন তাতে যে অনির্বচনীয়তা সৃষ্টি হয়—হাজার হাজার খঞ্জন, ভ্রমর এবং নীলোৎপলকে জড় করলেও সে অনির্বচনীয়তা সৃষ্টি মধ্যযুগের কবির পক্ষে সম্ভব হ'তনা। এই একই কথা বলা চলে স্তন সম্পর্কেও। কুচপ্রসঙ্গে আধুনিক কবি যখন বলেন, 'আমার চোখের সামনে

১. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]
২. 'নিষ্ফল কামনা' [মানসী] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বর্গের স্বপ্নের মতো দোলে/তোমার দুই বুক';[১] তখন তাতে যে অনির্বচনীয়তা সৃষ্টি হয়—সেই অনির্বচনীয়তা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে যায় মধ্যযুগীয় কবিকুলের অজস্র নারঙ্গ, শ্রীফল এবং স্বর্ণকটোরা। নারীরূপবর্ণনা অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় কবির নয়নযুগল নারীর কম্বুকণ্ঠ থেকে নেমে বক্ষপ্রদেশে লুটিয়ে পড়ে—সেখান থেকে রূপাবিষ্ট নয়নকে তুলে নিতে কবির যথেষ্ট বিলম্ব হয়। অপরপক্ষে, আধুনিক কবিদের লেখায় কুচরূপ একটি বা দু'টি চরণে সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

মধ্যযুগীয় কবি রমণীর 'নখশিখ' বর্ণনাকালে বক্ষপ্রদেশে কিভাবে দীর্ঘক্ষণ কাটাতেন তার একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক—

ষন্ন থাল জিনিয়া হৃদয় পরিপাটী।
কনক কোটরা দুই রাখীছে উলটী।।
ফলের উপামা কিবা কহে কবিকুল।
বিচারি বুজিলু সেহ নহে সমতুল।।
দেখীয়া ষুন্দর অতি কুচযুগভঙ্গি।
ষুরঙ্গে হইয়া নাম ধরিল নারেঙ্গি।।
বরহি কটীন অতি উরজ অবলা।
কমল সরির নাম ধরিল কমলা।।
সমতারা নাম ধরি সম তারা নএ।
তেকারণে ডালেত পিঙ্গলবর্ণ হএ।।
দারিমে দেখীয়া স্তন অতি ষুরচির।
লয্যাএ বিদার পাএ আপনা শরির।।
কটীনথা ভাবিয়া শরির করি কষ্ট।
তথাপীহ তুলনা নহে শ্রীফল শ্রীভষ্ট।।
জামির ছোলঙ্গ পুনি অম্র রস হৈয়া।
ডালেত পিয়ল হএ অতি লাজ পাইয়া।।
কুচ দরসনে অঙ্গ না দেখীয়া ভাল।
উলট সঞ্জোগে পুনি লতা নহে তাল।।
কনক কলসে কিবা ভরিয়া রতন।
স্যাম চাপ সিরে দিয়া রাখীছে মদন।।

১. 'এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে' / বুদ্ধদেব বসু

১৩—

করিবর কুম্ভ জিনি কুচ মনুহর।
নিশ্চএ রহিছে কিবা হেম ধরাধর।।
চক্রবাকযুগ নিসি বিচ্ছেদের ডরে।
অখণ্ড মিলনে কিবা রহিছে সবরে।।
শ্বগর্ভ আদরে কটীলথা অতিসএ।
রাজচক্রবত্তি সির নম্র না করএ।।
শ্যামছত্র সিরেত বেকথ ছত্রপতি।
স্বঈশচাএ কর দিতে সভান আরতি।।
উরু সিংহাসনে বৈসে অবলার বল।
এক পাটে দুই রাজা বর কুতুহল।।
কথেক কহিতে পারি কুচ সুলক্ষন।
জৈবকের হৃদানন্দ বালক জিবন।।
সথ্যাঞ্চল অন্তঃপটে থাকে সর্ব্বক্ষন।
পরসিতে নারে কার মান নয়ন।।
নৃপকূলে বহু জত্নে দেব আরাদন্ত।
কর দিতে নারি সবে কর কচালন্ত।।[১]

(আলাওল)

কিন্তু আধুনিক কবি এত কালক্ষেপ করেন না। পুরাতন যুগে মহাকাব্য ছিল, আখ্যায়িকাকাব্য ছিল—নারীর তনুরচনার দীর্ঘ অবকাশ ছিল সেখানে। কিন্তু রবীন্দ্রযুগ, অত্যাধুনিক যুগ গীতিকবিতার। গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ত পরিসরে অত বিলম্বিত রূপরচনার অবকাশই বা কই? তবে কাহিনীকাব্যে, নাট্যকাব্যে অবকাশ পেলেও আধুনিক কবি 'নখশিখ' বর্ণনা করতে বসেন না। কেননা 'নখশিখ' বর্ণনার পদ্ধতিটি হচ্ছে মধ্যযুগীয়—আধুনিক কবি অতএব পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করেন না। গ্রহণ করেন না ব'লেই জসীম-উদ্‌দীন কাহিনীকাব্য লেখা সত্ত্বেও সাজুর বা দুলীর আপাদমস্তক বর্ণনা করেননি। রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাব্যের অমন উপযোগী পরিসর পাওয়া সত্ত্বেও চিত্রাঙ্গদার 'নখশিখ' রচনা করতে বসেননি। চিত্রাঙ্গদার রূপ তিনি এভাবে বর্ণনা করেন—মধ্যযুগীয় কবি যা ধারনাও করতে পারেন না—

১. 'নখশিখ খণ্ড' [পদ্মাবতী] আলাওল : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

···নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া ;
উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদু হাসি
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ ; মুক্ত কেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা।
নিরখিলা নত করি শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস ; সরোবরে
পা-দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা। বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়স
যাপিল নয়ন মুদি—যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন,
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন,
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।...[১]

নারীর আপাদমস্তক সৌন্দর্যবর্ণনার মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যটি আমরা সর্বশেষ দেখেছি মধুসূদনে; দেখেছি নতুন ভঙ্গিমায়, নতুন গরিমায়। তবে আখ্যায়িকাকাব্যের প্রশস্ত পরিসরে নারীর আপাদমস্তক রূপের লীলায়িত বর্ণনার দীর্ঘ অবকাশ ছিল বলেই যে মধুসূদন এই আমুণ্ড রূপবর্ণনা করতে বসেছেন তা নয়, তিলোত্তমাকে তিল তিল ক'রে গড়তে হয়েছে কাহিনীর প্রয়োজনেই। প্রথাপায়বশ্যতা একে বলা যাবেনা। প্রথানুস্মৃতিই যদি মধুসূদন

১. [চিত্রাঙ্গদা]

করতেন, তাহলে 'মেঘনাদবধকাব্যে' অবশ্যই তিনি প্রমীলার, সীতার 'নখশিখ' বর্ণনা করতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পুঙ্খানুপুঙ্খ তিলোত্তমানির্মাণ নেহাতই কাহিনীর প্রয়োজনে। তবে এই সৃষ্টিকর্মের পেছনে মধু-মানসে আর একটি আকাঙ্ক্ষাও ক্রিয়াশীল ছিল---সেটি হচ্ছে ঐতিহ্যের লালন। সকল মহৎ কবির মতো মধুসূদনও ঐতিহ্যকে পুনর্জাগরিত করেছেন নতুন আঙ্গিকে, নতুন শৈলীতে—

. . . . পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙ্গা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা
খগোল নিতম্ব-বিম্ব; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা!
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে; সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন ঊষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,
মাখিয়া অমৃতরসে; গজ-মুক্তাবলী

শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া।
আপনি রতিরঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভূরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুলশর, নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী।.....[১]

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পদ্মের ন্যায় চরণ, রম্ভার ন্যায় উরু, সিংহের কটির ন্যায় কটিদেশ, পর্বতের ন্যায় কুচ, বিম্বফলের ন্যায় অধর, মুক্তার ন্যায় দন্ত, মদনের ধনুর ন্যায় ভুরু—উপমানে সেই পুরাতনেরই চয়ন--কিন্তু উপস্থাপনায় আধুনিকতার সংক্রমন। ছন্দের বলিষ্ঠ হিল্লোলে, শব্দের সাবলীল চয়নে মধ্যযুগীয় প্রথানুস্মৃতির একঘেঁয়েমি অন্তর্হিত। মধুসূদন তিলোত্তমার রূপবর্ণনাকালে যখন মাথা থেকে পা-য়ে না নেমে, পা থেকে মাথার দিকে গেলেন—তখন মধ্যধুগীয় প্রথাও গেলো উল্টে।

তবে রমণীর তনুরচনাকালে শিখর থেকে নখে ক্রমান্বয়ে অবতরণের সেই পুরাতন প্রয়াসটি আধুনিক কবির কবিতায় একেবারেই বিলুপ্ত—এমন সরল মন্তব্য করা ঠিক হবে না। বরং বলা যেতে পারে, আধুনিক কবির ওপর 'নখশিখ' রচনার জন্য সেই মধ্যযুগীয় বাধ্যবাধকতার ব্যাপারটি নেই। আধুনিক কবি 'নখশিখ' রচনার প্রয়াস করেন পুরোনো প্রথার আদেশে নয়, বরং আপন আনন্দিত হৃদয়ের আদেশে, রূপারতি করতে করতে রমণীর শিরোদেশ থেকে পদতলে ক্রমাবতরণ করেন আপন খুশী-উচ্ছলিত মনের অনুমতিতে। কিন্তু যত আনন্দাবেগই থাক তাঁর—উপস্থাপনায় যে তাঁকে হতে হবে আধুনিক, বিষয়টি তিনি কখনোই ভোলেন না। এবার একটি দৃষ্টান্ত চয়ন ক'রে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা যাক—

১. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য]

যেখানেই তুমি

যেখানেই তুমি সেখানে শ্রাবণ
অথবা প্লাবন আগ্রহের,
যেখানে একদা বিরহ-ব্যাকুল
অথবা আকুল সমারোহের;
অনেক কথার দ্বিধায় অচল
অথবা সজল সব শেষের,
আনন্দে দীপ তোমার নয়ন
যেনবা স্মরণ উৎসবের।

যেখানে তোমার চোখের সাগর
স্বপ্ন-বাসর সকল কাল,
সেখানে আমার প্রহর হারায়
দু'হাত বাড়ায় অনাদি কাল;
যেখানে রাজ্য শুভ সংবাদ
অবিসংবাদ কামনালীন,
সেখানে ঘটনা পলাশের ফুলে
অথবা মুকুলে সব বিলীন।

যেখানে তোমার অধরের শিখা
যেন প্রহেলিকা দীপ্ত গান,
সেখানে কথারা কৌতুক সহ
আনে দুঃসহ অনভিমান;
যেখানে শব্দ ওষ্ঠের তাপে
বিগলিত কাঁপে মদিরা যেন,
সেখানে বাতাসে সচকিত কাল
আকাশ পাতাল তরল যেন।
যেখানে তোমার ভুজবন্ধন
যেন অঙ্গন মহাদেশের,
সেখানে সকলে সীমানা হারায়
আকাশ নীলায় মহাকালের;

মধ্যযুগের লতার মতন
গম্যভুবন অনির্দেশ:
এখানে হয়তো আমলকী শাখা
অথবা প্রশাখা ভগ্ন-শেষ।

বুকের প্রসাদ লীলার কমল
লঘু চঞ্চল কম্পমান,
আলো-মস্থণ একটি লেখার
যেনবা রেখার সব প্রমাণ;
হৃদয়-আকাশে দুইটি নয়ন
তিলকাঞ্জন উজ্জীবন,
করাঙ্গুলীর রেখা-বিন্যাসে
তরঙ্গাকাশে সঞ্চরণ।

ক্ষীণ কটি-দেশ একমুঠো ফুল
যেনবা অতুল অলৌকিক,
দুটি কুবলয় মৃণাল শোভায়
আশায় আশায় সকল দিক;
গুরুভার নিয়ে কটির পরিধি
নিয়ম বা বিধি অতিক্রম,
পলাতক রাতে প্রবল শাসন
যেন বা আসন-ব্যতিক্রম।

প্রাচীন কাব্যে উরু-সংযোগ
যেনবা অমোঘ দ্বিদল ফুল,
অরণ্যে যেন একাকী মৃগের
পদচিহ্নের রূপ অতুল;
সেখানে পুরুষ সূর্য সমান
রূপ অম্লান অসংশয়,
সেখানে রাজ্য মধুর প্লাবনে
সর্ব-স্মরণে অদেয় নয়।

পরিত্যক্ত দুর্গে যেমন
হঠাৎ কখন সন্ধ্যাতারা,
লেবুর শাখায় পাখীরা হঠাৎ
যেন দৈবাৎ কাকলীহারা;
যেনবা বাতাসে হাঁসের পালক
যেন দর্শক অনবধান,
ঘন নিকুঞ্জে অনভিব্যক্ত
যেন অনুক্ত সমপ্রদান।

নিগূঢ় শ্রোণির গুরুভারে যার
যেন উৎসার অশান্তির,
হংস-গমনে দ্বৈত আলাপ
কামনা যেনবা দীপাবলীর;
সমুদ্রতল প্রবাল বাসর
অথবা পাথর যেন উপল,
অধোগতি ঢেউ সেখানে কুমারী
শ্রীময়ী সে নারী প্রাণোচ্ছল।

যেখানে রমণী শ্রাবণ-বন্যা
যেন অনন্যা আগ্রহের,
সেখানে হৃদয় বিগলিত গান
যেন অম্লান সঞ্চয়ের;
যেন প্রদীপের সব সংলাপ
সূর্যের তাপ অসংশয়,
সেখানে রাজ্য মধুর প্লাবনে
সর্ব-স্মরণে অদেয় নয়।।[১]

(সৈয়দ আলী আহসান)

এই অত্যাধুনিক 'নখশিখ' বর্ণনায় আমরা দেখলাম উপমানে নতুনের সঞ্চয়ন, উপস্থাপনায় আধুনিকতার উৎসারণ। আর দেখলাম পুরাতনের সঙ্গে নাড়ীর যোগটিকে কবি ছেদন করেন না। তাই দেখি কবিতাটিতে 'মধ্যযুগের'

১. [সহসা সচকিত]

'প্রাচীন কাব্যে' ইত্যাদি শব্দের সযত্ন আরোপ এবং লীলাপদ্মের সঙ্গে কুচের, মৃগপদচিহ্নের সঙ্গে ত্রিবলীর সেই মধ্যযুগীয় উপমাদির সাদর প্রয়োগ। 'বুকের প্রসাদ লীলার কমল/লঘু চঞ্চল কম্পমান' আবার 'হৃদয়-আকাশে দুইটি নয়ন/তিলকাঞ্চন উজ্জীবন,' পুরাতন-নবীনের এই যে সম্মিলন--এই তো আধুনিকতা।

মধ্যযুগের কবিরা নায়িকার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কণ্ঠ, কুচ ইত্যাদির বিভিন্ন উপমান অন্বেষণের পর উপমানগুলোর মধ্যে সঙ্গতি আবিষ্কার করতে থাকেন—উপমানগুলোর ভঙ্গি সম্পর্কে ব্যাখ্যাপ্রবণ হ'য়ে ওঠেন। একটি দু'টি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝিয়ে বলি। যেমন—মধ্যযুগের কবিদের ধারণা, বেণী হচ্ছে সাপ, স্তন হচ্ছে কমল। অতএব স্তনে বেণী এসে পড়লে তাঁরা ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেন—"কমলকোষে কৃষ্ণসর্পিনী রহিয়াছে।"[১] তাঁদের ধারণায় লোমাবলী হচ্ছে নাগিনী, স্তন হচ্ছে পর্বত, গ্রীবা হচ্ছে ময়ূর। অতএব লোমাবলী-নাগিনী স্তনপর্বতে আহার অন্বেষণে আরোহণ করতে গিয়ে গ্রীবাময়ূরকে দেখে শৈলসন্ধি-সংযোগে লুকিয়ে থাকলো—

রোমাবলী নাগিনী বৈসয়ে কুণ্ডান্তরে।
পর্বতে উঠিতে চাহে আহারের তরে।।
গিম নীলকণ্ঠ বৈরী সম্মুখে দেখিয়া।
শৈলসন্ধিসংযোগে রহিল লুকাইয়া।।

(আলাওল)

কুচসৌন্দর্য চিত্রণকালে আধুনিক কবিদের মধ্যে এই ব্যাখ্যাপ্রথা লক্ষ্য করা যায় না। ভঙ্গিটি একান্তই মধ্যযুগীয়।

উপমানগুলোর আচরণে যখন কোন অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষিত হয়--তখন মধ্যযুগীয় কবিরা তার হেতুসন্ধানের জন্য গবেষণা করেন। পর্বতের শিরোদেশে মৃণালহীন পদ্ম কি ক'রে ফুটলো কবি তার কারণ অন্বেষণের জন্য ব্যগ্র। জল বিনা পদ্ম দুটো সতেজ ও সদাপ্রফুল্ল আছে কি ক'রে? বিস্মিত কবি অন্বেষণ ক'রে দেখেন যে, নিকটেই হার-গঙ্গা প্রবাহিত।

---

১. ২৬৫, বিদ্যাপতি

মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।
মনিময় হার ধার কহু সুরসরি
তেঁ নহি কমল সুখাঈ॥
(বিদ্যাপতি)

ভারতীয় কাব্যকল্পনা অনুযায়ী পয়োধর গুরুভাব পাহাড়ের মত এবং কটি ক্ষীণ হওয়া চাই। কিন্তু এই অবস্থায় দেহ খাড়া থাকে কিভাবে? কবি শঙ্কিত ও চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েন। অনেক ভেবে এই অস্বাভাবিকত্বের সুনিপুণ সমর্থন তিনি পেয়েছেন—"কটি ক্ষীণ, দেহের ভারে উহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে—(দেহ) সাজাইয়া বিধাতার এই অনুতাপ হইল; তাই নীল রেশমের সূতা অতিশয় দৃঢ় জানিয়া উহা দিয়া রোমরাজি সৃষ্টি করিলেন।... নীল রেশমের সূতারূপ রোমরাজি দিয়া কটি ও কুচ একসঙ্গে বাঁধা বলিয়া ঊর্ধ্বাঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায় না।"[১]

মধ্যযুগীয় কবিরা সর্বত্র দুর্জ্ঞেয়র কারণ নির্দেশ ক'রে চমকরস নষ্ট করেন না। কখনো কখনো নিজে অবাক হ'য়ে এবং পাঠককে অবাক করিয়ে দিয়ে আনন্দ অনুভব করেন, যেমন—

১) "এক আশ্চর্য বস্তু দেখিলাম, জল নাই অথচ কমল (পয়োধর) ফুটিয়াছে। দুইটি পদ্মের উপর যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ (নখরেখা)।"[২]

২) সহজ সুন্দর গৌর কলেবর
পীন পওধর সিরী।
কনঅলতা অতি বিপরীত
ফলল জুগল গিরী॥
(বিদ্যাপতি)

উপমায় অদ্ভুত ব্যাপার সৃষ্টি ও তার হেতু অন্বেষণের এই যে আগ্রহ—নিজে অবাক হওয়ায়, পাঠককে অবাক করানোয় এই যে আনন্দ—আধুনিক কবিদের লেখায় এসব ভঙ্গি আর দেখা যায় না।

---

১. ২৪, বিদ্যাপতি
২ ২৬, বিদ্যাপতি

কখনও কখনও মধ্যযুগীয় কবির এই অবাক হবার ভাণটি থাকেনা; এমনভাবে বলতে থাকেন, মনে হয় তিনি ধাঁধাঁ বলছেন, যেমন—

১) সত জো ধরৈ সো খেলনহারা।
চারি ইগারহ জাই ন মারা।।
তূঁ লীহে আছসি মন দুব্।।
ঔ জুগ সারি চহসি পুনি ছুব্।।[১] (জায়সী)

২) কেশরী উপরে এ দুই সায়র
সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে এ দুই তমাল
চারি শাখা আছে ধরি।।
(জ্ঞানদাস)

এ ভঙ্গিটিও আধুনিক কালে বিলুপ্ত।

পুরাতন কবিদের আর একটি নেশা আছে, আধুনিক কবিদের মধ্যে যেটি আর পরিলক্ষিত হয় না। সেই নেশাটি এমন। পুরাতন কবি যখন নায়িকাকে 'ফুলময়ী' রূপে গড়েন, তখন নায়িকার প্রতি অঙ্গই নানা জাতের ফুল—যখন তাঁরা নায়িকাকে 'সর্পময়ী' রূপে গড়েন, তখন নায়িকার প্রতি অঙ্গই নানা জাতের সর্প—যখন তাঁরা নায়িকাকে 'নানা প্রাণীযুক্তা'রূপে গড়েন, তখন তার প্রতি অঙ্গই নানা জাতের প্রাণী—যখন তাঁরা নায়িকাকে 'দ্বীপময়ী' রূপে গড়েন তখন তার প্রতি অঙ্গই নানা নামের দ্বীপ— যখন তাঁরা নায়িকাকে 'সরোবরময়ী' রূপে গড়েন, তখন সরোবরের নানা দৃশ্যচিত্র নায়িকাদেহের উপমান হয়, যখন তাঁরা নায়িকাকে 'যুদ্ধক্ষেত্ররূপা' গড়েন, তখন যুদ্ধক্ষেত্রের নানা দৃশ্যচিত্র নায়িকাদেহের উপমান হয়। নিম্নে দৃষ্টান্তগুলো চয়িত হচ্ছে।

(ক) ফুলময়ী রাধিকা—তমাল কুসুম চিকুরগণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে।।
সুপুট নাসা তিল ফুলে।

১. ("যে সাতের দান চালবে বা সত্যকে রাখবে সেই পাকা খেলোয়াড়। যে (দশেন্দ্রিয় সহ মন) এগারোর দান চালবে তাকে কেউ হারাতে পারবেনা। তুমি মনে মনে পাশার চাল দিয়ে তারপর আমার গুটিযুগলকে (বক্ষ যুগল) স্পর্শ করতে চাইছ।"
—অনুবাদ : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কন্নযুগ তোর এ বগ হুলে॥

. . . .

মুফুলিত থলকমল তনে।
রোমরাজী তাত আতয়ীগণে॥

(বড়ু চণ্ডীদাস)

(খ) সর্পময়ী মনসা—অলকাবলি চিত্র-নাগ হইল শোভন।
জেন নীল মেঘেতে উদয় তারাগণ॥
সিন্দুরিয়া নাগ হৈলা সীমন্তে সিন্দুর।
উদয়গিরি সূর্য্য যেন করিছে মেদুর॥
সর্বনামে নাগেতে মাথার সিথি-পাতি।
নীলমেঘ-তটে জেন বিজুলি-দিপতি॥
কালচিতি নাগে দেবীর ভুরু-যুগ সাজে।
কালিন্দীর হস্তী জেন স্বর্ণগিরি মাঝে॥
কালি-নাগিনী হৈল নয়নে কজ্জল।
কুবলয়দলে জেন খঞ্জন যুগল॥
সুরঙ্গ সিন্দুর নাগে অধরের কান্তি।
ধবলিয়া চিতি হৈল দশনের পাঁতি॥
শ্বেতকর্ণ নাগেতে গলার কেয়াপাতি।
পীতগিরি বেড়ি জেন বহে ভাগীরথী॥
কণ্ঠে ভূষিত মনিনাগের দিপতি।
উদয়শিখরে জেন স্বর্ণময় জুতি॥
হালিয়া নাগ দেবীর হৃদয়ে শোভে হার।
সুমেরু শিখরে জেন বিজুলি-ঝঙ্কার॥
(বিপ্রদাস পিপিলাই)

(গ) নানা প্রাণীযুক্তা পদ্মাবতী—অতি বিচিত্র দেখা সো ঠাঢ়ী।
চিত কৈ চিত্র লীহ্ন জিউ কাঢ়ী॥

সিংঘ-লঙ্ক কুম্ভস্থল জোরু।
আঁকুস নাগ মহাউত মোরু ॥
. . . .
দুই খঞ্জন বিচ বৈঠেউ সূআ। (জায়সী)

("অতি বিচিত্র রূপ নিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমার জীবন কেড়ে নিয়ে তার মুর্তি আমার চিত্তে প্রবেশ করল। সিংহের (কটিদেশের) উপর একজোড়া হস্তীকুম্ভ (স্তনযুগল), তার উপর সর্পের অঙ্কুশ (বেণী) এবং ময়ূররূপী মাহুত (কণ্ঠ)।...দুই খঞ্জন পাখীর (চোখ) মাঝখানে বসেছিল এক শুকপাখী (নাক)।"[১]— অনুবাদঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

(ঘ) দ্বীপময়ী সুন্দরী—দিয়া-দীপ নহিঁ তস উঁজিআরা।
সরণ-দীপ সরি হোই ন পারা ॥
জম্বু-দীপ কহউঁ তস নাঁহী।
লংক-দীপ পূজ ন পরিছাঁহী ॥
দীপ-কুঁভসথল আরনপরা
দীপ মহুসথল মানুস হরা ॥ (জায়সী)

("দিয়া দ্বীপ অর্থাৎ সুন্দরী যুবতীর নেত্র তার মতো উজ্জ্বল নয়। সরণদ্বীপ (শ্রবণ দ্বীপ) অর্থাৎ সুন্দরীর কর্ণ তার তুল্য হ'তে সমর্থ হয়নি। জম্বু দ্বীপ অর্থাৎ সুন্দরীর কেশপাশ তার মত নয়। লংকা দ্বীপ অর্থাৎ সুন্দরীর কটি তার ছায়ার সমতাকে পূজা করেনা অর্থাৎ ছায়া পায়না। কুম্ভস্থল দ্বীপ অর্থাৎ সুন্দরীর পয়োধর অরণ্যে গোপন রয়েছে (অরণ্য অর্থাৎ মুক্তাহার, বস্ত্রাঞ্চল ইত্যাদি।) এবং মধুস্থল দ্বীপ অর্থাৎ সুন্দরীর গুপ্ত দেহভাগ মানুষকে ধ্বংস করে।"[২]

—অনুবাদঃ সৈয়দ আলী আহসান)

(ঙ) সরোবরময়ী রাধিকা—লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভষল ॥
নেত্র উতপল তোর নাসা নালদণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড ॥

---

১. [পদ্মাবতী (জায়সী)] সম্পাদনা ঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২. [পদ্মাবতী)] সম্পাদনা ঃ সৈয়দ আলী আহসান

সুন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ী।
দুসহ বিরহজ্বরে জরিলা কাহ্নাঞি।।
হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার।।
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।
অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল।।
ঈষৎ ফুটিত পদ্ম তোর নাভিথানে।
কনক রচিত তোর ত্রিবলী সোপানে।।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

(চ) যুদ্ধক্ষেত্ররূপা পদ্মাবতী— ভএউ জুঝ জস রাবণ রামা।
সেজ বিধাঁসি বিরহ সংগ্রামা।।
লীহি লঙ্ক কঞ্চন গঢ় টুটা।
কীহ সিঙ্গার অহা সব লূটা।।
ঔ জোবন মৈমন্ত বিধাঁসা।
(জায়সী)

("মনে হল যেন রাম রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে। শৃঙ্গার-সংগ্রামে শয্যা বিধ্বস্ত হল। নায়ক লঙ্কা (নায়িকার কটিদেশ) যখন অধিকার করলেন তখন সোনার কেল্লা (স্তনযুগল) ভেঙে পড়ল। নায়িকার সাজসজ্জা তিনি লুণ্ঠন করলেন। যৌবনের মত্তহস্তী ধ্বংস হল।"[১]--অনুবাদ: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

নায়িকাকে 'ফুলময়ী', 'সরোবরময়ী'-রূপে ঐ যে গড়া হ'লো, তখনকার কালে ওটি ছিল প্রথা। তাইতো আমরা অন্যত্রও 'ফুলময়ী', 'সরোবরময়ী' নায়িকার দর্শন পাই—

১) বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোহয়মধর: স্নিগ্ধ মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূণ-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্তুন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধ:।।[২]
(জয়দেব)

১. [পদ্মাবতী (জায়সী)] সম্পাদনা: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২. [গীতগোবিন্দম্]

২) বাহু দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্য-লীলাজলং, শ্রোণীতীর্থশিলা চ নেত্র-শফরং ধম্মিল্ল শৈবালকম্।
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাক-যুগলং কন্দর্পবাণানলৈর্দ্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্মিতম্।[১]
(কালিদাস)

কিন্তু বর্তমানে অনুরূপ রূপচিত্রণ অবিকল অনুসৃত হয়না—এই রূপাঙ্কন-প্রথাটি আছে অন্য কোনো চিত্রকল্পে, যেমন---

১. আমার বুকের কালোপাখী, যার স্তন যুগল কমলানেবু,
বেগুন দোলমার চেয়ে সুস্বাদু, গোলমরিচ গুঁড়োর স্বাদাধিক্য
তুমি আমাকে খুশি করো এবং লাল লংকার ঝাল,
গরম খিচুড়ি কি সুগন্ধী কফি তোমার থেকে উষ্ণতর নয়,
আমার হৃদয় দোকানে তুমি ঝুলন্ত গোস্তের টুকরো
আমার কণ্ঠে তুমি সুমিস্টি সিরাপ, শব্জীসুপের ধুমেল সান্নিধ্য
চানাচুরের চেয়ে মুড়মুড়ে ভাজা মাছের চেয়ে বাদামী
আমার ক্ষুধা, তোমাকে অনুসরণ করছে—অমার্জিত মাফ করো-
একান্ত তোমাকে, যার নিতম্বরা এত খাদ্যময়।[২]
(সানাউল হক)

২. তার সে বুকের নাক্ষত্রিক অলিন্দে আর
চোখের বাগানে হাতের মহলে অবক্ষয়ের
দারুণ বেলায় কার অধিকার![৩]
(শামসুর রাহমান)

৩. যেন সুভদ্রার তরঙ্গিত শরীরের নারীত্বের বিভা
মুখের নিটোল, কটির ভাঙন, বক্ষের পাহাড়
বাহুর নক্ষত্রবৃত্ত,[৪] (বিষ্ণু দে)

১. [শৃঙ্গারতিলকম্]
২. 'হাইতি মেজাজ : ত্রিতয়' (এমিল রোমেয়ের অনুসরণে) [একটি ইচ্ছা সহস্রপালে]
৩. 'কতোবার ভাবি'
৪. 'ভাদ্রসন্ধ্যা' [সংবাদমূলত কাব্য]

এক নম্বর উদ্ধৃতিতে রমণীকে খাদ্যরূপিনী অঙ্কন করা হয়েছে; এখানে তার স্তন, নিতম্ব এবং সর্বাঙ্গই খাদ্যময়।

দুই নম্বর উদ্ধৃতিতে রমণীকে বসতবাটীরূপিনী অঙ্কন করা হয়েছে; তার বাহুদ্বয়—কক্ষ, নয়নদ্বয়—বাগান, কুচদ্বয়--ঝুলবারান্দা।

এবং তিন নম্বর উদ্ধৃতিতে রমণীকে প্রকৃতিরূপিনী অঙ্কন করা হয়েছে। তার শরীর যেন নদীবিধৌত কোনো পার্বত্যপ্রদেশ---যেখানে মুখের নিটোল সবুজ ভূখণ্ড, কটির নদীভাঙন, বক্ষের উত্তুঙ্গ পাহাড়, বাহুর নক্ষত্রমণ্ডল বিরাজমান।

প্রাগুক্ত (খ) (সর্পময়ী মনসা) ও (ঙ) (সরোবরময়ী রাধিকা) চিহ্নিত উদ্ধৃতিদ্বয়ে আমরা আর একটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি---একই উপমান নারীর বিভিন্ন প্রতঙ্গের জন্য বারবার ব্যবহৃত হচ্ছে—যা আধুনিক কবিদের লেখায় দেখা যায় না। চয়িত উদ্ধৃতিদ্বয়ে দেখছি এক পাহাড়ই মনসার নানা অঙ্গের উপমান এবং এক কমলই রাধার নানা অঙ্গের উপমান। বিষহরির ভয়ংকর মূর্তি সৃজনের জন্য পর্বতের বিরাটত্ব এবং দুর্জ্ঞেয়তার রহস্য কবির পছন্দ হয়েছে---তাই মনসার সীমন্তকে উদয়গিরি, ললাটকে স্বর্ণগিরি, কণ্ঠকে পীতগিরি ও উদয়শিখর, এবং কুচদ্বয়কে সুমেরুশিখর নাম দিয়েছেন। ওদিকে বড়ু চণ্ডীদাসকে দেখা যাচ্ছে সরোবরময়ী রাধার অনেক অঙ্গকেই পদ্মরূপে প্রস্ফুটিত করতে। পদ্মগুলো হচ্ছে বদনপদ্ম, নয়নপদ্ম, করপদ্ম এবং নাভিপদ্ম।

একই উপমান নারীদেহের বিভিন্ন অংশের রূপপ্রকাশক হ'য়ে বারবার ব্যবহৃত হচ্ছে---এই ব্যাপারটি আমরা পুরাতন কবিদের রচনায় হরহামেশাই লক্ষ্য করি। নারীর প্রায় সকল অঙ্গই পদ্মের সঙ্গে তুলিত হয়েছে, এক কবির লেখা থেকেই আমরা তা আবিষ্কার ক'রে দেখাতে পারি। যেমন—বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে 'কমল' উপমানের বারংবার প্রয়োগ--'পদ হেম কমল'; 'কনক কমল রুচি বিমল বদনে'; 'ঈষৎ ফুটিত পদ্ম তোর নাভিথানে'; 'গন্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা'; 'নেত্র উতপল তোর'; 'কমল কলিকা সম তার পয়োভারে'; 'কর কমল বাহু মৃণাল'। এক 'চন্দ্র'ই নায়িকার বিভিন্ন অঙ্গ উপাঙ্গের উপমান হয়েছে, জায়সীর 'পদ্মাবৎ' থেকে এমন উদাহরণ চয়ন করা যাক---

ললাট—দুইজ ললাট অধিক মনোয়ারা।

("দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় তাঁর অপ্রশস্ত ললাট অধিক মনোহর।"[১])

নাসিকা—হীর-ফুল পহিরে উজিয়ারা।
জনহুঁ সরদ সসি সোহিল তারা।।

("নাকে তিনি উজ্জ্বল হীরের ফুল পরেন, তা যেন শারদ শশীতে শোভিত তারকা।"[২])

বদন—ঔ সসি-বদন দেখি সব মোহা।
("এর চন্দ্রবদন দেখে সকলে মোহিত হয়।"[৩])

হাসি—বিহঁসি সসি তরঈ জনু পরী।
("তার হাসিতে যেন চাঁদ এবং তারারা খসে পড়ল।"[৪])

দশনজ্যোতি—জেহি দিন দসন জোতি নিরমঈ।
বহুতৈ জোতি জোতি ওহি ভঈ।।
রবি সসি নখত দিপহিঁ ওহি জোতী।

("যেদিন ঐ দশনজ্যোতি নির্মিত হল, সেদিন তা থেকে আরও অনেক জ্যোতির উদ্ভব হল। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ঐ জ্যোতিতেই দীপ্ত।"[৫])

সম্পূর্ণ দেহ—নিহকলংক সসি বিধি নিরমঈ।
("বিধাতা নিষ্কলংক চন্দ্র নির্মাণ করেছেন"[৬])

কবি বিদ্যাপতি তো চন্দ্রঘরে বন্দী ছিলেন, বলতে হয়। এক চন্দ্র লক্ষ চন্দ্র হ'য়ে তাঁর কাব্যে উদ্ভাসিত। শুধু বদনবর্ণনায়ই বিদ্যাপতি যেভাবে চন্দ্রে মেতেছিলেন, দেখে বিস্ময় মানতে হয়। শরতের চন্দ্র, শীতের চন্দ্র, প্রতিপদের চন্দ্র, পূর্ণিমার চন্দ্র, অমাবস্যার চন্দ্র, দিবসের চন্দ্র, গ্রহণের চন্দ্র, ক্ষীণ চন্দ্র, অর্ধেক চন্দ্র, আনন্দিত চন্দ্র, উপভুক্ত চন্দ্র, কলঙ্কিত চন্দ্র, পরাজিত চন্দ্র, বিদ্বিষ্ট চন্দ্র, আতঙ্কিত চন্দ্র—রাধিকার বদন-বন্দনা-কালে এই এতরকম চন্দ্রকে উপমান হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিদ্যাপতি। রমণীর তনুরচনাকালে একই উপমানের এতরকমের পৌনঃপুনিক

১-৬. [পদ্মাবতী (জায়সী)] অনুবাদ : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবহার আধুনিক কবির কবিতায় আর দেখা যায় না। রমণীরূপের বন্দনার সময় দৈবাৎ যদি বা কেউ একই উপমানের পুনরাবৃত্তি করেন, তাহলে বুঝতে হবে উপমানটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের পেছনে প্রথানুস্মৃতি নয় বরং আছে কোনো উদ্দেশ্য। যেমন—

এখানে দ্রাক্ষার বনে প্রাণবন্ত তরুণীরা কেউ
সহসা মন্থর হাতে খুলে দেয় যত্নে বাঁধা চুল।

. . . .

দ্রাক্ষার গুচ্ছের মতো কালো তার গুচ্ছ গুচ্ছ চুল,
দ্রাক্ষার মদের মতো দৃষ্টি তার মাদকতাময়,
পুরন্ত দ্রাক্ষার মতো পুরন্ত তাহার পয়োধর।[১]

এখানে এক দ্রাক্ষাকেই তরুণীর চুল, দৃষ্টি এবং পয়োধরের উপমান করার কারণ, তরুণীটি হচ্ছে ভূমধ্যসাগরতীরবাসিনী—যেখানে গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষা ফলে অজস্র। কবির মনে হয়েছে এই আঙুরের দেশের কন্যাটির সকল প্রত্যঙ্গ আঙুরের সঙ্গে তুলনা করলেই কন্যাটি তার দেশের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদময়তার প্রতীক হ'তে পারে।

প্রাগুক্ত (খ) চিহ্নিত উদ্ধৃতিতে (মনসা যেখানে সর্পময়ী) আমরা আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করি। প্রতি ক্ষেত্রেই কবি প্রথম ছত্রে দেহের যথাস্থানে সর্পভূষণ যোজনা করেছেন এবং দ্বিতীয় ছত্রে সেই শোভার আভাস দেখিয়েছেন নিসর্গের উপমান আকর্ষণ ক'রে। প্রত্যেক চরণে এই যে এক ধরনের শৃঙ্খলা, এটাও মধ্যযুগীয়——এসব ভঙ্গি আধুনিককালে দুর্লক্ষ্য।

পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় নারীরূপবর্ণনা অংশের কোন্ স্থানে কুচরূপ সন্নিবেশিত হয়েছে চোখ বুঁজিয়ে বলা যেত। চুলের সিঁথি থেকে শুরু ক'রে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে নীচের দিকে নামতেন রসিক কবিরা। কিন্তু আধুনিক কবিদের কবিতায় ঠিক কোন্ স্থানে কুচপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে বলা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায় পূর্ণ অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তিনি কুচরূপকথনে বিরত; কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায় দেহবর্ণনাকালে সঠিক সময়টিতে শব্দে তিনি এমন

---

১. 'ভূমধ্যসাগরতীরে' [নতুন কবিতা] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

রঙ মিশিয়ে দিলেন যে তিনি কুচসৌন্দর্যের ইঙ্গিত করছেন, না, পরিপূণ দেহসৌন্দর্যের—সেটি পরিষ্কার বোধগম্য হয় না; আবার কোনো কোনো কবিতায় কুচবর্ণনার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলেও তিনি সুস্পষ্ট কুচপ্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। তিনটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর এই প্রবণতাগুলো স্পষ্ট করা যাক—

১) পূর্ণ অবকাশসত্ত্বেও যখন তিনি কুচকথনে বিরত—

বিবসনা

ফেলো গো বসন ফেলো—ঘুচাও অঞ্চল।
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুর-বালিকার বেশ কিরণ-বসন।
পরিপুর্ণ তনুখানি বিকচ কমল
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।
সর্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ
সর্বাঙ্গে মলয়-বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মতো।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোনে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানব-ভবনে
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে॥[১]

২) যখন তিনি শব্দকে এমন ইঙ্গিতময় ক'রে তোলেন যে, তা কুচরূপ-প্রকাশক না দেহরূপপ্রকাশক, হ'য়ে যায় দুর্বোধ্য—

১. [কড়ি ও কোমল]

মানসসুন্দরী

- - - - - - - কী নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি? কেমন কঙ্কণ
ধরিবে দুখানি হাতে? কবরী কেমনে
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে?
কচি কেশগুলি পড়ি শুভ্র গ্রীবা 'পরে
শিরীষকুসুমসম সমীরণভরে
কাঁপিবে কেমন? শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয় নব নীল অতি সুকুমার
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে! কী সঘন পল্লবের ছায়
কী সুদীর্ঘ কী নিবিড় তিমির-আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখবিভাবরী! অধর কি সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব! লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কী করিয়া মুকুলি বিকশি
অনিবার সৌন্দর্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি
নিঃসহ যৌবনে? . . . .[১]

৩) যখন উপযোগী পরিবেশ না থাকলেও অকস্মাৎ কুচপ্রসঙ্গে সুস্পষ্ট উচ্চারণ—

বসুন্ধরা

. . . .
সুদুর্গম দূরদেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে;

১. [সোনার তরী]

দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা 'পরে
জরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ নির্দয়।
কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূর দূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে; চারিদিকে শৈলমালা
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি;[১]

. . . .

প্রথম উদ্ধৃতিতে কবি যখন সুন্দরীকে অঞ্চলমুক্ত ক'রে বিবসনা ক'রে ফেললেন, মনে হলো অবশ্যই তিনি কুচরূপ অঙ্কন করবেন—কিন্তু দেখা গেলো তিনি যা দিলেন, তা হ'লো ইচ্ছাকৃত নির্লিপ্তি—এবং এভাবেই স্থূলত্বের পঙ্ক থেকে ঊর্ধ্বে রাখতে চাইলেন দেহপ্রতপ্ত তাঁর কবিতাটিকে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে তিনি মানসসুন্দরীর বাহুর সৌন্দর্য দেখছেন, দেখছেন কবরীর, কেশের, গ্রীবার সৌন্দর্য---মনে হচ্ছে এই বুঝি তিনি কুচসৌন্দর্যের কথা বলবেন। কিন্তু সুন্দরীর নয়নে অধরে দৃষ্টিক্ষেপের পর তিনি যখন বললেন—'লাবণ্যের থরেথরে/অঙ্গখানি কী করিয়া মুকুলি বিকশি/অনিবার সৌন্দর্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি/নিঃসহ যৌবনে'—তখন এই ব্যঞ্জনাগর্ভ শব্দাবলীতে কুচসৌন্দর্য সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত করা হ'লো কিনা সে বিষয়ে পরিষ্কার বোঝা গেল না।

তৃতীয় উদ্ধৃতিতে দেখি, জ্বলন্ত বালুকাকীর্ণ মহাপিপাসাময় মরুভূমি-প্রসঙ্গ, যেখানে কুচকথা উত্থাপনের কোনো পরিবেশই নেই—কবি সেখানেই এনেছেন মনোরম মোহন কুচপ্রসঙ্গ। অতি-আধুনিক কবিদেরও দেখি—হয়তো তিনি বলছেন কঙ্কালের করোটির কথা, তার পাশেই অকস্মাৎ

১. [সোনার তরী]

এসে গেলো স্তনপ্রসঙ্গ। স্তনপ্রসঙ্গ উত্থাপনের পরপরই হয়তো তিনি বলতে থাকলেন গণ-আন্দোলনের কথা-ঠিক যে মুহূর্তে মধ্যযুগীয় কবি তারিয়ে তারিয়ে লিখছেন নায়িকার নিম্নদেহের কথা। অতি-আধুনিক কবি একজন খ্যাতনামা কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য যে কবিতা লিখলেন-হয়তো দেখা গেল তাতেও আছে স্তনপ্রসঙ্গ ('একদা কবিতা তার বুক নগ্ন করেছিলো আপনার চোখের সম্মুখে / একদা কবিতা তার স্তনের গোলাপকুঁড়ি চেয়েছিল দিতে।'— 'কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি'/শামসুর রাহমান)। কিন্তু পুরাতন কবিরা নারীর দেহবর্ণনাপ্রসঙ্গে অথবা যে পরিবেশ একান্তই কুচবর্ণনার জন্য সঙ্গত—শুধু সেসব ক্ষেত্রেই উত্থাপন করতেন কুচপ্রসঙ্গ। এসব হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য। পুরাতন কবিদের দৃষ্টিতে ছিল সহজতা, সরলতা, সীমাবদ্ধতা এবং তৃপ্তি। অপর-পক্ষে আধুনিক কবির মনে জটিলতা, অতৃপ্তি, যন্ত্রণা আর সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসবার বাসনা।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রাচীন সংস্কৃত কবিরা এবং মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা উপমা-নির্বাচন-বিষয়ে অতি-উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই বৃত্তবদ্ধ। তাঁদের ব্যবহৃত উপমাগুলো সবই প্রথাসিদ্ধ। 'পাহাড়' 'পাহাড়' 'কটোরি' 'কটোরি' করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে যে কুচপ্রসঙ্গ উঠলেই কবিরা এই 'পাহাড়' আর 'কটোরি' ছেড়ে সহজে অন্য কিছু ভাবতে পারেন না। এমনকি তাঁরা নায়িকার মনেও উপমানটি সম্পর্কে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়েন। রাধার কুচদ্বয়কে জয়দেব, বিদ্যাপতি এতবার শিব শিব করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত রাধাও ভেবেছেন সত্যি বুঝি ও দুটি শিব। তাই দুই অঞ্জলি ভ'রে দুই শিবকে পূজা ক'রে (বক্ষে দুই হস্ত সংস্থাপন ক'রে) রাধা বলেন-"হে কামদহন শিব। আমার প্রাণ রক্ষা কর।"[১] ভাবতে অবাক লাগে যে, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের মত শক্তিধর কবিরাও মুখ বলতে বুঝতেন চাঁদ, নয়ন বলতে বুঝতেন নীলোৎপল, অধর বলতে বুঝতেন বান্ধুলী, কুচ বলতে বুঝতেন পর্বত। তবে পুরাতন বন্ধনীর ভেতর আবদ্ধ থাকলেও শক্তিবাদী কবিদের লেখনীতে শক্তি কিন্তু ঠিকই চমকে ওঠে। তাই দেখি প্রথাসিদ্ধ উপমাও

১. ৫৪৬, বিদ্যাপতি

এমন নূতন বর্ণরাগে রঞ্জিত, যা আমাদের মুগ্ধতা দাবী করার ক্ষমতা রাখে। যেমন, কুচের বাটি উপমান গতানুগতিক —কিন্তু বিদ্যাপতি যখন সেটিকে মাজা বাটির মত উজ্জ্বল বলেন কিংবা গোবিন্দদাস যখন সেটিকে চুরি করা বাটির মত গোপনীয় বলেন, তখন সেই গতানুগতিক উপমান-গুলোই হ'য়ে ওঠে নতুন। শক্তিবান কবিদের পরিবেশনভঙ্গি বড়ই আকর্ষণীয়, তবুও একথা বলতে হবে যে সাতপুরুষের অর্জিত উপমাগুলোর প্রতি তাঁদের বড়ই মমতা। এই ঐতিহ্যপ্রীতি কবিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই ঐতিহ্যপ্রিয়তার জন্য তাঁরা পূর্বসূরী কবিদের সৃষ্ট স্তবকগুলোকে পর্যন্ত কিছুটা রূপান্তরিত ক'রে পাঠকের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেন। বড়ু চণ্ডীদাস এবং আলাওল থেকে দু'টি উদ্ধৃতি চয়ন করছি, যে দুটো প্রায় মিলিয়ে পড়া যায়—একেবারে একই রকম বর্ণনাভঙ্গি —

(১) গিএ গজমুতি হার মনি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুই ধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে।।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

(২) গিম মনোহর কম্বু কণ্ঠবর শোভে সপ্তছরি হার।
কুচ গিরি 'পরে বহে নিরন্তরে তেন সুরসর ধার।।
(আলাওল)

আর দু'টি উদ্ধৃতি চয়ন করি, যেখানে লক্ষ্য করা যাবে বিদ্যাপতির মত একই রকম ব্যাখ্যাভঙ্গি আলাওলেরও —

(১) নাভি-বিবর সঞে লোমলতাবলী
ভুজগী নিশাস পিয়াসা।
নাসা খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সন্ধি নিবাসা।।
(বিদ্যাপতি)

(নাভিবিবর থেকে বার হ'য়ে লোমলতারূপ ভুজঙ্গী নিশ্বাসবায়ু পানের উদ্দেশ্যে গমনোদ্যত হয়েছে কিন্তু নাসা-খগপতির চঞ্চুভয়ে ভীত হ'য়ে কুচগিরি-সন্ধিতে বাস করছে।)

(২) রোমাবলী নাগিনী বৈসয়ে কুণ্ডান্তরে।
পর্বতে উঠিতে চাহে আহারের তরে ॥
গিম নীলকণ্ঠ বৈরী সম্মুখে দেখিয়া।
শৈল সন্ধিসংযোগে রহিল লুকাইয়া ॥
(আলাওল)

(লোমাবলী-নাগিনী কুচপর্বতে আহার-অন্বেষণে আরোহণ করতে চেয়েছিল কিন্তু গ্রীবাময়ূরকে সামনে দেখে শৈলসন্ধিসংযোগে লুকিয়ে থাকলো।) এবার আমরা 'পদ্মাবতী'- রচয়িতা আলাওলের একটি চরণের সঙ্গে 'গুলে বকাউলি'-রচয়িতা নওয়াজিস খান খোন্দকারের একটি চরণ মিলিয়ে পড়বো—

(১) স্বইচ্ছায় কর দিতে সবার আরতি।
(আলাওল)

(২) করপূজা দিবারে কুমারে ইচ্ছা করে।
(নওয়াজিস খান খোন্দকার)

অবিকল একই রকম চরণ রচনা করেছেন সুলতান নাসির সাহা এবং শেখ কবীর। কুচবর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁরা দু'জনই এই চরণটি লিখেছেন 'কুচ শ্রীফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি।' এই প্রসঙ্গে আরও বহু উদ্ধৃতি চয়িত হ'তে পারে—কিন্তু উদ্ধৃতিচয়নের জন্য আমি আপাততঃ তত ব্যস্ত নই। কবিরা যে কি পরিমাণ ঐতিহ্যপ্রিয়, আধুনিককালের কবিদের উপমা-ব্যবহার দেখলেও তা বোঝা যায়। পুরোনো উপমা এখনও তাঁদের আকর্ষণ করে। স্তনের উপমান হিসেবে সেই পুরোনো পদ্ম, পর্বত, কলসী, বেল, বাটি ইত্যাদিকে তাঁরা এখনও ব্যবহার করেন। তবে তাঁদের উপমা-প্রয়োগ-ভঙ্গিমা পুরাতন কবিদের মত নয়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক; যেমন—'বাটি' উপমানটি পুরাতন কবিকুলের কবিতায় এভাবে প্রযুক্ত—'কুচ উলট কটোরে',[১] 'কুচযুগ গিরি কনক কটোরি',[২] 'কুচমণ্ডলী কনক

১. বড়ু চণ্ডীদাস
২. চণ্ডীদাস

কটোরি,'[১] 'কুচযুগ তোর কনক কটোর,'[২] 'কনক কটোরা কিবা কুচযুগ তার'[৩]। এবার দেখা যাক, আধুনিক কবির কবিতায় কিভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে ঐতিহ্যবহ এই 'বাটি' উপমানটি। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়[৪] দেখা যাচ্ছে মধ্যরাতে মুখোমুখি ব'সে প্রেমিক-প্রেমিকা যে কবিতা পড়ছে—সেই কবিতার নায়িকা হচ্ছে স্পার্টার রানী হেলেন; এবং 'বাটি' উপমানটি হেলেনের কুচপ্রসঙ্গেই প্রযুক্ত। এই কবিতায় হেলেনের কুচবিষয়ে 'বাটি' উপমানটি সাতবার ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতাটি থেকে চারটি স্তবক উদ্ধার ক'রে উপমানটি ব্যবহারের ধরন লক্ষ্য করা যাক—

মেঝের উপর মেঘের মতন শাড়ির আঁচল
লোটাবে তোমার; আঁচল ঘুমের মতন শীতল,
পুরোনো কবির পুরোনো কবিতা পড়বো যখন।
(আফ্রোদিতকে অর্ঘ্য দিয়েছে সোনার বাটি
স্বর্গ-দুহিতা হেলেন—দুরাশা সব পুরুষের।
—পুড়ে খাক হ'লো ট্রয়।)
টেবিলের আলো হাতের বইতে, হাতে আমাদের;
চুলে আর চোখে ঘুম-ভাঙা রাঙা আধেক চাঁদের
মলিন জ্যোছ্না - কবিতা আমরা পড়বো যখন।
(সোনার সে-বাটি গড়া হেলেনের বুকের ছাঁচে
স্বাদে আর সাধে, বিষাদে ভরেছে সব পুরুষের—
ছারখার হ'লো ট্রয়!)

... ...

উতল বাতাস, মাতাল বাতাস, রাতের বাতাস,
বাতাসের ভাষা শুনবে পাতারা, শুনবে আকাশ;
পুরোনো প্রেমের কবিতা পড়বো আমরা দু-জন।
('আমার বুকের ছাঁচে গড়া এই সোনার বাটি
বাসনার রসে আনিয়াছি ভ'রে সব পুরুষের।'

১. চণ্ডীদাস
২. দ্বিজ মাধব
৩. দোনা গাজী
৪. 'কবিতা' [বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা]

—গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'লো ট্রয়।)

... ...

পূবের সবুজে শাদা হ'য়ে ফোটে ভোরের আকাশ,
রাতের, দিনের মাঝখানে এসে ঝিমায় বাতাস।
বই শেষ ক'রে চুপচাপ ব'সে আমরা দু-জন।
(কোথায় হেলেন। কোথায় বা সেই বুকের বাটি।
বিশাল বাসনা বুকে জ্বলে তবু সব পুরুষের—
পোড়ে লাখো-লাখো ট্রয়!)

উদ্ধৃত স্তবক চারটিতে 'বাটি' উপমানের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার সম্পর্কে বলতে হয়—উপমানটিতে অধিক মূল্য এবং ব্যঞ্জনা আরোপের কারণেই করতে হয়েছে এই পুনরাবৃত্তি। সকলকালের সব পুরুষের মনের বাসনাকে অর্ঘ্য-রূপে কুচ-বাটিতে ধরেছেন স্পার্টার রাণী—প্রেমের দেবী আফ্রোদিতিকে নিবেদনের জন্য। অতএব 'বাটি' উপমানটি এখানে নতুন তাৎপর্যে, নতুন মূল্যে ঋদ্ধ। সোনার বাটিটির পাশেই ট্রয়-ধ্বংস-সংবাদ—কেমন বৈপরীত্য জাগায়। শেষ স্তবকে যখন বলা হলো হেলেনও নেই, তার বুকের বাটিও নেই—'বিশাল বাসনা বুকে জ্বলে তবু সব পুরুষের—/পোড়ে লাখো-লাখো ট্রয়!'—তখন সোনার বাটিটি আর একবার নতুন অর্থে দেদীপ্য হয়। সাধারণ একটি উপমানকে এতবার ব্যবহারের কারণ যেন তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। প্রেমিক-প্রেমিকা মধ্যরাতে কবিতা পড়তে গিয়ে হেলেনের বুকের সোনার বাটিতে ঐ যে বারবার চকিত দৃক্‌পাত করছে—এতে একরকম সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনাও হয়েছে।

আধুনিক কবি ঐতিহ্যমুগ্ধ কিন্তু ঐতিহ্যশাসিত নন। নিম্নে এমন উদাহরণ উপস্থাপিত করবো, যেখানে দেখা যাবে, আদি মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যদ্বারা কিভাবে অতি-শাসিত হয়েছেন—

অবিরলনিপতিত মদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
সহৃদয়মর্মণি বর্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্।।[১]

(জয়দেব)

১. [গীতগোবিন্দম্]

অহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহ্য করে।।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

আমরা বড়ু চণ্ডীদাসকে দেখলাম সংস্কৃতের হুবুহু অনুকরণ করতে। এরকম অনুকরণাত্মক উপমা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আরও অনেকস্থলেই আমরা দেখতে পাই এবং সেসব স্থলে সংস্কৃতের দাসত্বের জন্য বর্ণনা কেমন অতি-আড়ষ্ট তাও দেখতে পাই। এবার আর একটি সংস্কৃত উদ্ধৃতি চয়ন করি এবং লক্ষ্য করি মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি কিভাবে তার অনুকরণ করেন—

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্‌ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচ-বিলুলিত-মালা-কুঙ্কুম-শ্মশ্রুভির্ণঃ।।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদপি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্তমীদৃক।।[১]
(রূপ গোস্বামী)

অলি হে, না পরশ চরণ হামারি।
কানু-অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি।।
পুর-রঙ্গিনি কুচ- কুস্কুমরঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বনমাল।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল।।
(জ্ঞানদাস)

ঐতিহ্যের প্রতি মধ্যযুগীয় কবিদের এই যে অন্ধ-আনুগত্য—এটি আধুনিক কবিদের মধ্যে দেখা যায় না। আধুনিক কবি ঐতিহ্যকে ধারণ করেন মুগ্ধতার কারণে, বশ্যতার কারণে নয়। ঐতিহ্যপ্রীতির জন্য কুচের পুরাতন উপমান পদ্ম, পর্বত, কলসী, বেল, বাটিকে আধুনিক কবি ব্যবহার করেন বটে, তবে শুধু এই অতীতপ্রিয়তার মধ্যেই তাঁরা গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে রয়েছেন—

১. [শ্রীমদ্‌ভাগবত]

তা নয়। নিত্যই তাঁরা অনেক নতুন উপমাও সৃজন ক'রে চলেছেন। আগে বস্তুর সঙ্গে বস্তুরই তুলনা দেওয়া হতো। বস্তুর সঙ্গে নির্বস্তুকের তুলনা দেওয়া হতো না। আজকাল বস্তুর সঙ্গে নির্বস্তুকেরও তুলনা দেওয়া হয়; যেমন, আধুনিক কবি যখন বলেন—'শব্দ, রাজেন্দ্রাণী শব্দ, কেবলি পিছলে যায়, যেমন হাতের মুঠো থেকে স্তন'[১]—তখন আমরা নতুন একটি উপমাদর্শনে আনন্দ পাই। মধ্যযুগের কোন কবিই শব্দের সঙ্গে স্তনের তুলনা করতেন না। তাঁরা কখনো বলতে পারতেন না—'প্রেমের সঙ্গীত যেন বিকশিয়া রয়।'[২]

মধ্যযুগের কবিরা উপমেয়কে মাঝে মাঝে সাদাসিধে রাখেন বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা উপমেয় উপমান দু'টিকেই ক'রে তোলেন বর্ণোজ্জ্বল। তাঁদের সৃষ্ট উপমেয় এবং উপমান—দু'টিই এমন দর্শনীয় হয় যে, পাঠক কোনটা ছেড়ে কোন্‌টা দেখবেন—বুঝতে পারেন না। বিরহিনী যখন স্তনে মুখ নত করে রাখে, তখনকার দৃশ্য হচ্ছে—মুখচন্দ্রভীত স্তনকমল ফুটে উঠতে পারছেনা। আবার নায়িকা যখন স্নানকালে নগ্ন স্তনদুটিকে বাহুবদ্ধ রাখে, তখনকার দৃশ্য হচ্ছে-সামনেই উজ্জ্বল মুখচন্দ্র, তাই উড়তে ব্যগ্র চন্দ্র-প্রেমিক স্তনচক্রবাক দু'টিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। পাঠক এখন উপমেয় এবং উপমান কোন্‌টির সৌন্দর্যমুগ্ধ হবেন, ভেবে দেখুন। যৌবনমত্ত স্তন মত্ত হস্তীর মতই অবাধ্য এবং বলশালী ব'লে কৃষ্ণ তাকে অঙ্কুশবিদ্ধ (নখাঘাত) করেছেন। পিপাসার্ত হ'য়ে নীল লোমলতারূপ কোমল শুঁড় ঝুলিয়ে দিয়ে বেচারা নাভিকূপ থেকে জলপান করছে। এখানে উপমেয় এবং উপমান—দু'টিই যেন 'আমাকে দেখ' 'আমাকে দেখ' ব'লে কোলাহল তুলেছে। আধুনিক কবিদের সম্পর্কে স্থূলভাবে একটা মন্তব্য করা যায় যে, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপমেয়-র চেয়ে উপমানকেই বেশী বর্ণরঙিন ক'রে তোলেন।

---

১ 'কোনো কোনো কবিতার শিরোণাম'/শামসুর রাহমান

২. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল] / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাচীন কবিরা স্তনকে উপমান করেছেন বটে (যেমন, তাঁরা সবসময় স্তনকে পর্বত বলেন, কিন্তু পর্বতকেও স্তন বলেছেন কখনো[১]) তবে সেটা এত কম যে উল্লেখ করার মত নয়। অথচ আধুনিক যুগের কবিরা স্তনকে উপমান হিসেবে যথেষ্ট ব্যবহার ক'রে দেখছেন; যেমন—বৃক্ষশাখায় ঝুলন্ত ফলকে তাঁরা স্তন মনে করেন[২], আকাশে দোলায়মান চাঁদটিকে স্তন মনে করেন,[৩] দুপাশের পাহাড়দ্বয়কে যুগল স্তন মনে করেন।[৪] এরকম যথেষ্ট উদাহরণ আধুনিক কাব্যে সহজলভ্য।

প্রাচীন কবিরা কখনো কখনো উপমেয়ের উল্লেখ না ক'রেও উপমেয়ের কথা বলেছেন, যেমন—

১) সোনার কটুআ দুটি মানিকে পুরায়াঁ।
নেত বসন তাত ওহাড়ন দিআঁ।।
আহ্মা ভাণ্ডি লআঁ যাহ আমূল ভাণ্ডার।
কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ লৈবোঁ তাহার বিচার।।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

২) গোরি কলেবর নূনা।
জনু আঁচরে উজোর সোনা।।
(শ্রী কবিরঞ্জন)

---

১. প্রান্ত ছেয়ে আছে আম্র বনরাজি ঝলক দেয় তাতে পক্বফল
বর্ণে চিক্কন বেণীর মতো তুমি আরূঢ় হ'লে সেই শৃঙ্গে —
দৃশ্য হবে যেন ধরার স্তনতট, অমর মিথুনের ভোগ্য,
গর্ভসূচনায় মধ্যে কালো আর প্রান্তে পাণ্ডুর ছড়ানো।
[মেঘদূতম্] কালিদাস/অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু

২. অথচ নিত্যই দেখি নির্বিকার জোনাকীরা জ্বলে
ছায়ার প্রহরে আর মসৃণ স্তনের মতো ফলে
'মৃন্ময়' / শামসুর রাহমান

৩. স্বপ্নপরা বাতিস্তম্ভ দূরে দোলায়িত চাঁদটিকে তার উদ্ভিন্নযৌবনা বালা-
প্রেমিকার উপচে-পড়া স্তন ভেবে বাড়ালো দক্ষিণ হাত দিগ্বলয়ে,
'উত্থান' / হুমায়ুন আজাদ

৪. দুপাশের পাহাড়গুলি / দুগ্ধবতীর পয়োধরের মতো।
২৯' [উচ্চারণ] / সৈয়দ আলী আহসান

৩) রোমাবলী নাগিনী বৈসয়ে কুণ্ডান্তরে।
পর্বতে উঠিতে চাহে আহারের তরে।।
(আলাওল)

কিন্তু এমন উদাহরণ খুবই কম, নেই বললেই চলে। উপমেয়কে উহ্য রেখে তির্যকভাবে উপমেয়র কাছে পেঁছানো—এই ভঙ্গিটা আধুনিক কবিদের বড়ই প্রিয়। এই ভঙ্গিটিই আধুনিক কবিদের মধ্যে বেশী লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কবি 'স্তন টিলা মুঠোয় কাঁপে অন্ধকারে' বলার চেয়ে 'যুগল টিলা মুঠোয় কাঁপে অন্ধকারে'[১] বলতে ভালোবাসেন এবং এই টিলা যে কোন্ টিলা সেটা ইঙ্গিতে বুঝে নিতে বলেন পাঠককে। এভাবে ইঙ্গিত দেওয়াতেই আধুনিক কবির আনন্দ। আধুনিক কবিতার রূপ বদলে গেছে ব'লেই এমন হয়েছে। পুরাতন কবিতা স্পষ্ট ছিল – কিন্তু আধুনিক কবিতা স্পষ্টতার চেয়ে ইঙ্গিত বেশী পছন্দ করে।

'দাড়িম্ব দেখিয়া কুচ অতি সুরুচির / লজ্জায় বিদার হয় আপনা শরীর'[২] — এ ধরনের ব্যতিরেক অলংকার মধ্যযুগীয় কবিদের বড়ই প্রিয়। উপমান-বস্তুর অপকর্ষ দেখিয়ে উপমেয়বস্তুর উৎকর্ষ প্রতিপাদন করা হ'য়ে থাকে এ অলংকারে। আসলে এই অপকর্ষের প্রদর্শন একটা ছলনা মাত্র। রূপে বা গুণে আদর্শ ব'লেই উপমানটি সংগ্রহ করা হয়, তারপর তাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হয় এইজন্য যে, উপমেয়টি কবিমনের মমত্বে লালিত—উপমেয়কে তাঁর সুন্দর লাগে, ভালোবাসেন, তাই তাকে অদ্বিতীয় ক'রে তুলতে চান। কিন্তু আধুনিক কবিরা এই অলংকারটি ব্যবহার করেন না। মধ্যযুগে স্তন নিয়ে মালোপমা সৃষ্টির উদাহরণ বেশ লক্ষিত হয়; যেমন—'নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরী কি বেলি'[৩], 'বেল তালযুগ হেমকলস গিরি / কটরি জিনিয়া কুচ সাজা'[৪], 'কমলকোরক কদম্বনিন্দক / সুধার কলস কুচ'[৫]। কিন্তু আধুনিক কবিরা স্তনবিষয়ে মালোপমা সৃষ্টি করতে চান না—একটি উপমান নিয়েই তাঁরা

---

১. 'ময়ূরগুলো' / শামসুর রাহমান
২. আলাওল
৩. বিদ্যাপতি
৪. বিদ্যাপতি
৫. ভারতচন্দ্র

খুশী--তার মধ্যেই ফুটিয়ে তুলতে চান নিবিড় ইন্দ্রিয়ঘনতা। স্তনপ্রসঙ্গে মধ্যযুগে অতিশয়োক্তি অলংকার সৃষ্টির প্রবণতা বেশ লক্ষ্য করা যায়। একটা দু'টো উদাহরণ দিই; যেমন, স্তনচূড়ায় নখক্ষতকে বলা হলো পাহাড়-চূড়ায় চন্দ্রোদয় অথবা স্তনকে বলা হলো বাটি—এমনি বাটি নয়, 'পর্বতময় সুবর্ণের বাটি'[১]। এই অতিশয়োক্তি অলংকার আধুনিক কবিরাও ব্যবহার ক'রে থাকেন। স্তন যখন ফুল বা ফল নয়, আস্ত এক গীর্জা বা মন্দির হ'য়ে যায় কিংবা হ'য়ে যায় আস্ত এক পল্লীগ্রাম ('স্তনপল্লী জলে'[২]) তখন তাকে অতিশয়োক্তি অলংকার না ব'লে কি বলবো? 'কাল পেয়ে শির তোলা দিল যত শির'[৩] এ ধরনের যমকালংকার ব্যবহার মধ্যযুগে বেশ প্রিয় ব্যাপার ছিল—আধুনিক কবিরা যমক ব্যবহারে আগ্রহী নন।

নীচে যে দু'টি অলংকারের কথা বলবো, এগুলো মধ্যযুগীয় কবিদের যত আকর্ষণ করতো, আধুনিক কবিদের তত করেনা—

(১) শ্লেষমূলক বিষমালঙ্কার—

যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু কৃশ কটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥
সুন্দরি, ভালে তুই হরিণ নয়ানি
সো চঞ্চল হরি পিয়া পিঞ্জর ভরি কৈছে ধরলি সেয়ানি॥[৪]

(২) অনুকূল অলংকার—অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥[৫]

ভ্রান্তি অলংকারের প্রয়োগ খুব কম হ'লেও প্রাচীন এবং আধুনিক কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'রঘুবংশে' রাম পুষ্পরূপ স্তনস্তবকে অবনম্রা তণ্বী লতিকাকে সীতাভ্রমে আলিঙ্গনে উদ্যত হ'য়েছিলেন। আধুনিক কবির কবিতায়ও দেখি তিনটি বালক রুটিকে মায়ের স্তন ভেবে ভুল করছে—

১. বিদ্যাপতি
২. 'ওডেলিস্ক' / শামসুর রাহমান
৩. ভারতচন্দ্র
৪. বৈষ্ণব কবি
৫. ভারতচন্দ্র

রুটিকে মায়ের স্তন ভেবে তারা তিনটি বালক
তৃষিত আত্মাকে সঁপে সংযত লোভের দোলনায়
অধিক ঘনিষ্ঠ হ'লো তন্দুরের তাপের আশায়।[১]
(শামসুর রাহমান)

সন্দেহ অলংকারের প্রয়োগ প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতায় তেমন দেখা যায়না। অনুপ্রাস অলংকারের প্রতি মধ্যযুগীয় কবিদের অতিশয় ঝোঁক। কয়েকটা উদাহরণ দেয়া যাক—

(১) কন্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা। (বড়ু চণ্ডীদাস)

(২) কনক-কটোর চোর কুচ কোরক জোরে
উজোরিল মোতিমদাম, (গোবিন্দদাস)

(৩) উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস (গোপাল দাস)

(৪) দেখিয়া সুন্দর অতি কুচযুগ ভঙ্গি।
সুরঙ্গি হইয়া নাম ধরিল নারঙ্গি।। (আলাওল)

অনুপ্রাসপ্রীতি আধুনিক কবিদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়, যেমন—

(১) - - - - - কদম্ব সুন্দর
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে
কেননা মন্মথ-মন মথেন যে ধনী
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন।[২]
(মধুসূদন)

(২) হেরো নারীহৃদয়ের পবিত্র মন্দির [৩] (রবীন্দ্রনাথ)

(৩) বিকচ বুকের বকুল গন্ধ [৪] (নজরুল)

---

১. 'তিনটি বালক'
২. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য]
৩. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]
৪. 'ভীরু'

(৪) বিকচ বুকের কমল-কলিতে কামনার সমারোহ।[১] (আবদুল কাদির)
রূপক অলংকার মধ্যযুগে এবং আধুনিক যুগে সমান প্রিয়—
মধ্যযুগে :

(১) বুকে চাপ কুচগিরি। (ভারতচন্দ্র)
(২) কিবা কুচহর কাম করিতে বিনাশ। (আলাওল)
(৩) চন্দনে রঞ্জিত করু কুচকুম্ভ। (জ্ঞানদাস)
(৪) তোর দুই কুচকুম্ভ বান্ধি নিজগলে
(বড়ু চণ্ডীদাস)
(৫) কুচকোরী কর নখখত রেহ। (বিদ্যাপতি)

আধুনিক যুগে :

(১) স্তনপল্লী জলে[২] (শামসুর রাহমান)
(২) কুচকলি নিঙাড়ি নিঙাড়ি,[৩] (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

কবিতার আঙ্গিক-নিরীক্ষা সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে আরও বলা চলে যে, আধুনিক কবি গদ্যের অবয়বে সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন কবিতার লাবণ্যকে, আচ্ছন্নতাকে, যেমন—

১) স্বর্ণকুম্ভের মতো বিভাসিত যার কুচযুগল, একটি তরঙ্গের আবেশে সে-রমণী পুষ্পিত ফলবান বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে আছে।......
... ... মিথুনের
প্রতীকরূপে সে-যুগেই আমরা বৃক্ষকে আলিঙ্গনরতা রমণীমূর্তিকে পেয়েছি যার নিম্নদেহ-ভাগ উন্মুক্ত ও প্রসারিত।[৪]
(সৈয়দ আলী আহসান)

২) ...জলের সাবলীল রেখাগুলি দর্শনার বিশুদ্ধ মরালগ্রীবা স্পর্শ ক'রে
অতঃপর
বক্ষের মধুর উপত্যকায় ধীরে ধীরে নামছে। হৃদয়। রহস্যবতী নাভিনিম্ন
সমুদ্রে

---

১. 'যৌবনবতী'
২. 'ওডেলিস্ক'
৩. 'উদ্‌ভ্রান্তি' [অর্কেস্ট্রা]
৪. '১৪' [উচ্চারণ]

তোমার নৌকা নামাও। নারীর এই কটিদেশ মসৃণ সুখবস্তু আমাকে
সমুদ্রগামী
জাহাজের যাত্রী হয়ে দূরস্থান সন্ধানের স্বপ্ন এনে দেয়। ইচ্ছে করে
কলম্বাসের মত
প্রাচীন সমুদ্রের আত্মা হয়ে উঠি, শত বছর পরিশ্রম করি নিষিদ্ধের
মাংসল ঢেউ ও
স্তম্ভের নীচে নীচে / . . . .[১]

(মঞ্জুভাষ মিত্র)

আধুনিক কবি কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত রসোল্লাস নির্মাণের জন্য এই যে গদ্যের শক্তিকে ব্যবহার করলেন, সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই রীতিটি অবলম্বিত হ'তে দেখা যায়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছন্দেরই ছিল একাধিপত্য। সাহিত্যিক গদ্য আধুনিককালের আবিষ্কার। গদ্যমাধ্যমে কবিতা রচনার অধিকার তাই আধুনিক কবিরই একচেটিয়া।

রমণীশরীর কিভাবে তাঁকে আকুল করেছে, রমণীর বক্ষোদেশের প্রতি তাঁর কি পরিমাণ দুর্বলতা—কাব্যসাধনার একপর্যায়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে আধুনিক কবি তা পর্যালোচনা ক'রেও দেখেছেন। রমণীবক্ষের প্রতি তীব্র আকর্ষণের কথা, স্বদেশিনী-বিদেশিনীর বক্ষাবলোকনের বিমুগ্ধ অভিজ্ঞতার কথা এবং নতুন নতুন উপমান উদ্ভাবনার আনন্দাবেগের কথা আধুনিক কবি গদ্যমাধ্যমে নিম্নে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের তা করতে দেখা যায়না—

"বড় হ'য়ে রমণীবক্ষের আকর্ষণ অনুভব করেছি। আশ্চর্য সজীব দু'টি গোলক জীবনের প্রতীতীর মতো আমার কাছে মনে হয়েছে। ভারতীয় শিল্পে লক্ষ্য করি রমণীর স্তনদেশ পয়োধি-সমৃদ্ধ, উত্তুঙ্গ, তরঙ্গের আবর্তের মতো—লীলায়িত এবং কুসুমিত প্রশান্তির মতো—বাক্যের অভিপ্রায়ে বাঞ্ছিত কিন্তু চিরকাল অলৌকিকতায় দূরবর্তী। আমার কবিতায় এর বিবরণ নানাভাবে এসেছে। কখনও স্তনবৃন্তকে হৃদয়ের চক্ষু ব'লে বর্ণনা করেছি, কখনও দুটি তারা ব'লে। বিদেশের রমণীবক্ষের বর্ণনায় লিখেছি 'গোলাবী আভায়

১. 'দর্শনার শরীর ১৯' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]

হৃদয়বৃন্তে স্বপ্নেরা আশাহত', কল্পনা করতে চেষ্টা করেছি 'স্নানশেষে নীরবিন্দু তোমার বক্ষের বৃন্তে কেমন মানায়।' একটি কবিতায় লিখেছিলাম—'দু'বাহুর সঞ্চয়ে পরিপূর্ণ দুটি ঢেউ যদি দুই বিন্দু লাল ফুল ছড়ায়।' আমার কাব্যকর্মে রমণীশরীর বিশেষ করে বক্ষোদেশকে মহার্ঘ করেছি হয়তো কখনও বাস্তবকে নিপীড়ণ ক'রে কিন্ত আকাঙ্ক্ষার চিরায়ত প্রতিষ্ঠায়।"[১]

(সৈয়দ আলী আহসান)

রমণীর বক্ষ-বন্দনায় প্রাচীন এবং আধুনিক কবিদের মধ্যে ভঙ্গির যতই তারতম্য থাক-এতক্ষণের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, নারীর কুচশোভা চিত্রণের জন্য কবিরা উপমা নির্মাণ করতে ভালোবাসেন। অতএব কোন্ কোন্ উপমায় রমণীবক্ষের যৌবনতপ্ত এই লোভনীয় সম্পদকে খুঁজেছেন কবিরা, দেখা যাক। এখানে বিনীতভাবে একটি কথা বলতে চাই। বিদেশী কবিদের উপমা ব্যবহারের ধরন ইত্যাদি এই আলোচনার বিষয় নয়। তবুও স্বাদবৈচিত্র্য আনয়নের জন্য আমি বিদেশী সাহিত্যে ব্যবহৃত কুচসম্পর্কিত কিছু উপমা এই আলোচনায় সংযোজন করবো।

ফুলপ্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করা যাক। সুশ্রী নারীঅঙ্গের সুকোমল পেলবতা, লাবণ্যস্নিগ্ধ সজীবতা, যৌবনবর্ণিল ছন্দিত দীপ্ততা কবিদের মনে ছন্দিত সতেজ পুষ্পিত লতার ছায়া নিয়ে আসে। নারীর স্তনকে তৃপ্তিহীনভাবে কবিরা তাই পুষ্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন---সুদূর প্রাচীনযুগ থেকে আজকের কবি পর্যন্ত একই অনুভবে আন্দোলিত হয়েছেন। নারীর স্তন যেন ফুলের মতই সুরভিত, বিকশিত, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য এবং সুধামধুর আধার। কবিরা নারীকে

১. সৈয়দ আলী আহসানের দিনলিপি থেকে

'সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতেব'[১] ভাবতে যেমন আনন্দ পান, 'কম্পিত পুলকভরে যৌবনকাতর'[২] কুসুম ভাবতেও তেমন আনন্দ পান--বরং বেশী আনন্দ পান। পুরুষ মানেই যেন কাঠিন্য আর রমণী মানেই যেন কোমলতা---ফুলের মত কোমলতা। 'কুসুমকোমলা' ব'লে নারীর একটা বিশেষ বিশেষণই আছে। নারীকে পুষ্প কল্পনা করতে কবিদের তাই খুবই আনন্দ। বিদ্যাপতির চোখে নারী সুগুম্ফিত 'পুহপমালা', রবীন্দ্রনাথের চোখে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম'[৩] কিংবা 'একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে'[৪]। জায়সীর চোখে রমণীর মুখের কথাগুলিও ফুল (ফূল দুপহরী জানউঁ রাতা/ফূল ভরহিঁ জ্যোঁ জ্যোঁ কহ বাতা ।।)---এমনকি রমণীর প্রাণটিও ফুল (ফুল বাস তন জীব তুমহারা ।।)। কালিদাসের চোখে রমণীর হৃদয়ও ফুল--'আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং/সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি'[৫]। মধ্যযুগের প্রায় সব কবিই রূপবর্ণনা অধ্যায়ে নায়িকাকে পুষ্পনারী তৈরী করেন। নায়িকার মুখ হয় কমল, নয়ন নীলোৎপল, অধর বান্ধুলী, নাসা তিলফুল এবং করাঙ্গুলি হয় চম্পক। মধ্যযুগের কবিরা নায়িকার ফুলশরীর কেমন ক'রে গড়তেন, একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করলে তা ধারনা করা যেতে পারে—

তমাল কুসুম চিকুরগণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে ।।
সুপুট নাসা তিল ফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে ।।
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কণ্ঠযুগ তোর এ বগহুলে ।।

---

১. [কুমারসম্ভবম্] কালিদাস
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. 'উর্বশী' [চিত্রা]
৪. 'চিত্রা' [চিত্রা]
৫. [মেঘদূতম্]
(উক্ত শ্লোকের বুদ্ধদেব বসু-কৃত অনুবাদ:
ফুলের মত মৃদু হৃদয় রমণীর অচিরে বিচ্ছেদে ভেঙে যায়
কী আর আছে, বলো আশার বাঁধ বিনা, যা তাকে রাখে তবু বাঁচিয়ে)

মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
খস্তুরী কুসুম তোর বসনে ॥
ভুজযুগ হেমযূথিকা মালে।
অশোকতবক করযুগলে ॥
মুকুলিত থলকমল তনে।
রোমরাজী তাত আতরীগনে ॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘযুগলে ॥
চরণকমল থলকমলে।
আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে ॥
নখরনিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে ॥
কনক চম্পক কুসুমপান্তী।
তোহ্মার সকল শরীর কান্তী ॥
নেআলী সেআলী মাহলী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে ॥
দেখোঁ গো তোর ফুলশরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥
(বড়ু চণ্ডীদাস)

নায়িকার শরীর তো নয়--যেন বিচিত্র ফুলে গাঁথা একটি মালা। বিদ্যাপতি ঠিকই বলেছেন 'গাঁথনি পুহপমালা'। নারীর প্রতি অঙ্গই যখন ফুল---তখন তার কুচদ্বয়ও ফুলরূপে কল্পিত হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। ফুলের নির্জন দল উন্মোচনের সঙ্গে কুচের গোপন বিকাশমানতার সত্যিই চমৎকার মিল। ব্যক্ত কুচের সঙ্গে নীরব-মুখর ফুলের সত্যিই অপরূপ সাদৃশ্য---যেজন্য সুদূর প্রাচীন যুগ হ'তে আজকের কবি পর্যন্ত পয়োধরকে 'ফুল' 'ফুল' ব'লে পাগল হলেন।

সব ফুলের মধ্যে আবার কবিদের কমলপ্রীতি বেশ একটা লক্ষ্য করার মত ব্যাপার। অধিকাংশ সময়েই তাঁরা নারীর মুখ, চোখ, কুচ, করতল, চরণ,

ইত্যাদি অঙ্গকে 'কমল' নামে অভিহিত করেছেন। বিদ্যাপতির একটি উদ্ধৃতি উদ্ধার করি, যেখানে তিনি কমলের ভেতর কমল তার ভেতর কমল স্থাপন ক'রে পুলকিত—"রক্তকমলে যেন কমল বসাইল, তাহাতে নীলকমল...দেখিয়া ভ্রমর ধীরে আসিবে।"[১] করতল হ'লো রক্তকমল, তদুপরি স্থাপিত বদন হ'লো সাধারণ কমল এবং নয়ন হ'লো নীলকমল—একেবারে কমলবন। অতএব নায়ক ভ্রমর তো আসবেই। কুচপ্রসঙ্গে কবিদের এই পদ্মপ্রীতির চূড়ান্ত হয়েছে। অতএব এখন কিছু পদ্মদর্শন করা যাক।

নবীন স্তনের উপমান হিসেবে পদ্মকোরক কবিদের খুব প্রিয়—সে স্থলপদ্মই হোক বা জলপদ্মই হোক। রাধার অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত স্তন বড়ু চণ্ডীদাসের চোখে মুকুলিত স্থলপদ্মের মতই রূপরসস্নিগ্ধ--'মুকুলিত থলকমল তনে।' শ্রীকৃষ্ণের নখাঘাতচিহ্নিত রাধিকার নবকুচকে ভ্রমরবিক্ষত নবকমলের সঙ্গে তুলনা করছেন বৈষ্ণব কবি--'নব কুচে নখ দেখি জিউ মোর কাঁপে/জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে।।' রূপবতী বিদ্যার নবোদ্‌গত কুচ শাহ বারিদ খানের চোখে কমলকলিকার মত—'কমল-কলিকা কুচ হৃদয়ে উগিল।' কবি জগজ্জীবনও মনসার স্তনদ্বয়কে কমলকলির মত দেখেন--'স্তন দুই কমলের কলি।' 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র গ্রাম্য কবি দ্বিজ ঈশানও তরুণী কমলার কুচ-সৌন্দর্যকে আশ্বিন মাসের পদ্মকলির সঙ্গে তুলিত করাই যথার্থ মনে করেন—'আশ্বিন মাসেতে যেমন পদ্মুমের কলি/বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি।' কোনো এক তরুণী বারুই-বধূর স্তন মানিকরাম গাঙ্গুলির চোখে কমলকলিকার চেয়েও সুন্দর--'কমল কলিকা জিনে কিবা কুচ দু'টি।' বিপ্রদাস পিপিলাই বলেন, বেহুলার বক্ষ-সরোবরে দুটি কমলকুঁড়ি শোভমান---'অর্ধোত্থিত স্তনদ্বয় শোভে হৃদিপরি/সরোবর মধ্যে যেন কমলের কুঁড়ি।' 'অর্ধোত্থিত' শব্দটি ব্যবহার ক'রে এখানে বেহুলার বয়সের তরুণতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে। কমলকুঁড়িকে নির্বাচন ক'রে বিজয়গুপ্তও বেহুলার তারুণ্য স্বীকার করেছেন---'ক্ষীন কটি আর স্তন হিয়ায়ে শোভে বড়ি / সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি।' ভারতচন্দ্র যখন বলেন,' 'কুচপদ্মকলি কবিরাজ করে/ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে' এবং রামপ্রসাদ যখন বলেন, 'যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা/কুচ পদ্মকলি করপদ্মে ধরে/তনু লোমাঞ্চিত রস রঙ্গভরে'---তখন লক্ষণীয় যে,

১. ২৯৯

উভয়েই বিদ্যাকে তরুণী অথবা নবযুবতী বলে উল্লেখ করেছেন। 'কৈশোর যৌবন দুহু মিলি গেল' কবিতায় জসীমউদ্‌দীন কোনো এক উদ্ভিন্নযৌবনার কুচদ্বয়কে লুক্কায়িতসৌরভ কমলমুকুল ব'লে ব্যাখ্যা করেন—'বক্ষের পরে আধ-মুকুলিত যুগল কমল দুটি/এখনো সুবাসে ভরে নাই দিক পল্লব দলে ফুটি।' অতএব দেখা যাচ্ছে কমলকলিকা নবযুবতীর নবকুচের জন্য বড়ই লোভনীয় একটি উপমান। প্রাচীনকালের কবিদের মত আধুনিক কালের বহু কবিই উপমানটি সমান মমত্বে লালন করেন—(১) পীবর বুকের পদ্মকলিতে কে অলি পড়িবে বাঁধা।[১] (আবদুল কাদির); (২) মুদিত কমলকলিকার মতো/... কুচযুগ তব ফুটেনি;[২] (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত); (৩) শঙ্খমাজা স্তন দুটি মনে হবে শ্বেত পদ্মকলি[৩] (আল মাহমুদ)।

যথার্থই কোরক অবস্থায় পদ্ম যেমন উন্নত এবং সুঠাম—তন্বীর দৃঢ় উদ্ধত, সুগঠিত, পীন পয়োধরও তেমনি সুঠাম ও উন্নত; অবশ্য বিকশিত পদ্মের সুবাসিত স্নিগ্ধ মাধুর্যও নারীর সৌন্দর্যধন্য ও মাধুর্যসঞ্চিত বক্ষের জন্য একটি লোভনীয় উপমান বটে। বিদ্যাপতি তো এই লোভের কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, বিকশিত স্বর্ণপদ্ম দেখলে ছিঁড়তে কার না লোভ হয়? ধনি যখন চকিত চেয়ে চমকে চলে যান—সেই পুলকিত চাঞ্চল্যের দরুণ যখন স্বর্ণপদ্মের মত তাঁর পয়োধরশোভা ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে, তখন সেই স্বর্ণপদ্ম লুট করার কার না লোভ হয়?

চমকি চলিল ধনি চকিত নেহারি।।
তে ভেল বেকত পয়োধর শোভা।
কনক কমল হেরি কাহে ন লোভা।।

কবিদের পদ্ম-প্রীতি এতই প্রগাঢ় যে, তাঁরা পর্বতশৃঙ্গেও দুই পদ্মফুল ফুটিয়ে তোলেন—যেখানে পদ্মফুল জন্মাবার কোনো পরিবেশই নেই—'মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল' (বিদ্যাপতি)। পদ্মফুলকে সর্পসজ্জিত দেখতে তাঁদের কি আনন্দ—"বক্ষে কৃষ্ণবেণী পড়িয়াছে যেন কমলকোষে কৃষ্ণসর্পিনী রহিয়াছে"[৪] (বিদ্যাপতি)। পদ্মদ্বয়কে নিদ্রাসুখী দেখেও কবি মুগ্ধ। রাধা হাত-সূর্য দিয়ে

১. 'অন্তরালবর্তিনী'
২. 'ভ্রষ্ট লগ্ন' [তন্বী (সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সংগ্রহ)]
৩. 'সিমফনি' [লোক লোকান্তর]
৪ ২৮৩

কুচ-কমল আবৃত করলেন দেখে কবি বলছেন, সূর্য-স্পর্শে কমল নিদ্রিত হ'লো। আমরা জানি, সূর্যের কিরণস্পর্শে কমল ফোটে, কিন্তু কবি বিপরীত বললেন। এমন বলার কারণ, সূর্য দূরে থাকলে কমল জেগে থাকতো। কিন্তু সূর্য একান্ত নিকটে। সূর্যের ঘন সান্নিধ্যে কমল তাই গভীর সুখে নিদ্রামগ্ন। কবির রসবোধ সত্যিই অপূর্ব---

কর জুগ পিহিত পয়োধর অঞ্চল
চঞ্চল দেখি চিত ভেলা।
হেম কমলন জনি অরুণিত চঞ্চল
মিহির-তর নিন্দ গেলা ॥
(বিদ্যাপতি)

বিরহকালে এই শতদলই বিবর্ণ, ম্লান হ'য়ে এমন শিথিলদল হয়েছে যে, একটু ছোঁয়ামাত্রই যেন ঝ'রে যাবে---"কমলের ন্যায় উচচ কুচযুগ বক্ষে ভার হইয়াছিল, এখন তাহা ফুটিয়া ম্লান হইল।"[১] (বিদ্যাপতি)। আধুনিককালের কবি জসীমউদ্‌দীন সেই বহুব্যবহৃত কমলকেই স্তনের উপমান করতে ভালো-বাসছেন---

১) বক্ষের পরে যুগল কমল লুকায়ে শাড়ীর জলে,
মৃদু নিশ্বাসে হেলিছে দুলিছে উল্লসি শতদলে।[২]

২) মৃদু নিশ্বাসে দুলিছে দুইটি যুগল কমল বুকে।[৩]

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের দৃষ্টিতেও কুচদ্বয় পদ্ম-সদৃশ---

চ'লে গেল পদ্ম বুকের পরাগ বরষি,[৪]
সুন্দরীর কুচদ্বয়কে শ্বেতপদ্মের মত অমলিন মনে হয়

আবদুল কাদিরেরও---সুন্দরী শিরীঁর বুকে দুটি পদ্ম শুভ্র অমলিন;
এ মুগ্ধ মানসভৃঙ্গ তারি তরে গুঞ্জরিছে চির রাত্রিদিন।[৫]

---

১. ৮৭১
২. 'যৌবন'
৩. 'মালতীর লুম'
৪. 'জালন্ধরের পথে'
৫. 'পৃথিবীর প্রেম' [উত্তর বসন্ত]

সৈয়দ আলী আহসানের চোখেও কুচদ্বয় দেহতরঙ্গে বিকশিত পদ্ম--

কভু মনে হয় পদ্মকোরক
দেহ-তরঙ্গে বিকসিত,
শিশিরে ঊষার সূর্যের তাপে
যেন আশংকা বিলসিত।[১]

কুচপ্রসঙ্গে সুবিকচ পদ্মই স্মরণে আসে শামসুর রাহমানের---

আমার যে প্রিয়া নেই
ডাকে সে বুকের পদ্ম উন্মোচন ক'রে।[২]

আল মাহমুদও রমণীর বক্ষপদ্মের দিকে উড়িয়ে দেন দৃষ্টির ভ্রমর—

পিয়ালার মতো দুটি বক্ষপদ্মে উড়ে গেলো দৃষ্টির ভ্রমর
কাছে গিয়ে ডাকলাম।[৩]

কমলের পরেই দেখছি কদম্বের দিকে কবিদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। স্তন যেন 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল।'[৪] পুলকিত বৃষ্টিসুরভি নিয়ে এসে চেতনায় রিম ঝিম নেশা ধরায়--এমন নেশা, যা মুনিরও মনোহরণে সক্ষম—

১) ফুটিল কদমফুল ভরে নোয়াইল ডাল।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

২) কদম্বকোরক জিনী খুল্লনার স্তন।
(মুকুন্দরাম)

৩) - - - - বুকেতে হয়েছে উচ
কদম্ব কুসুম কর্ণপুর।
(রামেশ্বর)

৪) কদম্বকোরক সম কুচের বলন।
দৃষ্টি হ'লে ততক্ষণে মুনির সরে মন।।
(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

---

১. '৩১' [সহসা সচকিত]
২. 'প্রত্যাবর্তন'
৩. 'অসুখে একজন'
৪. 'দেওয়া-নেওয়া' [সানাই]

কদম্বকেশরগুলোর শিউরে থাকা এবং ঝরে যাওয়া সম্পর্কে ঈশ্বরগুপ্ত চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোন এক মানিনী মানবশতঃ কুচ বসনাবৃত রেখেছে ব'লে ডালিম এবং কদম্ব সে কুচের অপরূপ সুঠামতা দর্শন করতে পারেনি। সেই কুচসৌন্দর্য জ্ঞাত নয় বলেই রূপের গর্বে ডালিম অহংকারে ফেটে চৌচির হয় এবং তার সাথে যোগ দিয়ে কদম্ব অহংকারে শিউরে শিউরে উঠতে থাকে। দু'জনে গলাগলি ক'রে বলতে থাকে—' ওলো ধনি দেখাও দেখাও স্তনদ্বয়'[১]। মানিনীর প্রণয়ী তখন ধনীকে কুচ অনাবৃত করার জন্য অনুরোধ করে। প্রণয়ীর নিশ্চিত বিশ্বাস, তার যুবতী প্রেয়সীর অনুপম বক্ষ-গঠন দর্শনে দাড়িম্ব বীচিত্যাগ ক'রে প্রাণে মরবে এবং কেশর ঝরিয়ে দিয়ে কদম্ব শোভাহীন হ'য়ে পড়বে—

দাড়িম্ব ছাড়িয়া বীচি প্রাণে যাক মরে।
কদম্বের শোভা হের ঝুরি যাক ঝোরে।[২]

কুচের শোভা-দর্শনে কদম্ব যে সত্যিই ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়—মধ্যযুগের কবি সামসুদ্দিন সিদ্দিকীর কবিতা থেকেও সে কথা জানা যায়—'কদম্ব দাড়িম্ব ফাটে দেখিলে মদনে।' ভারতচন্দ্রও বলেছেন কুচরূপের কাছে কদম্ব নিন্দিত হয়—

(১) কমলকোরক কদম্বনিন্দক
সুধার কলস কুচ।[৩]
(২) কমলকোরক কদম্বনিন্দক
করিসুত কুম্ভ উচ।[৪]

তিলোত্তমার বক্ষে আসনলাভের জন্য দাড়িম্ব এবং কদম্বের সেই অবিস্মরণীয় বিবাদের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে—

দাড়িম্ব কদম্বে হইল বিষম বিবাদ
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ বলে।[৫]
(মধুসূদন)

১-২. 'মানভঞ্জন'
৩. 'লক্ষ্মীবন্দনা।'
৪. 'কৌষিকী বন্দনা'
৫. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য]

উভয়ের প্রচণ্ড ঝগড়া দেখে শেষপর্যন্ত দেবশিল্পী দু'জনকেই বাদ দিয়ে পর্বতকে নির্বাচন করলেন। তবে অনিন্দ্য-সুন্দরী তিলোত্তমার বক্ষে স্থান না পেলেও মদন-পত্নী রতিদেবীর বক্ষে স্থানলাভ করতে পেরেছিল কদম্ব ; কদম্বের জন্য সেটি কম গৌরবের নয়—

(১) কদম্ব সুন্দর—
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম কলাপে,
কেননা মন্মথ-মন মথেন যে ধনী
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন।[১]

(২) কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;[২]

বীরাঙ্গনা তারার কুচকথা উত্থাপনকালে মধুসূদন আর একবার স্মরণে এনেছেন কদম্বকে। তারা সোমকে লিখেছেন তারারই চয়িত ফুলদর্শনে সোমদেব প্রতি ভোরে ভাবতেন দয়াময়ী বনদেবী যেন তাঁকে ফুল তুলে দিয়েছেন। অথচ তারাই সেগুলো চয়ন ক'রে প্রতিটি ফুলের সঙ্গে কত কথাই বলতেন। চম্পককে বলতেন—

বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল সাদরে তোরে তুলিবেন যবে
ও করকমলে, সখা কহিস্ তাহারে,—
'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিনীপতি;
কালি সে বর বরণ, তোমার বিহনে!'[৩]

আর কদম্বকে বলতেন—
কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে!—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে।[৪]

১-২. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য]
৩-৪. 'সোমের প্রতি তারা' [বীরাঙ্গনা কাব্য]

শরমাক্রান্ত তারা কথাটি না লিখতে পারলেও—কথাখানি যে কি, তা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। তারার কদম্ব-গঠন-কুচ সোমের আদরবিহনে ম্লান। সেই মালিন্য-দর্শনে দুঃখকাতর কদম্ব শোভাহীন হ'য়ে পড়েছে, এই কথাগুলো কদম্ব সোমদেবকে বলুক—তারার এই অভিপ্রায়। সুগঠন কদম্বকে পয়োধর-সদৃশ দেখেন রবীন্দ্রনাথও। প্রণয়িনী যখন আপন অঙ্গকে 'অরূপ ফুলে' সজ্জিত 'অর্ঘ্যর থাল' হিসেবে রচনা করে, ঠিক সেই মুহূর্তে কদম্বকেই তার কুচের উপমান হিসেবে মনোনীত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'অঞ্চলে মোর কদম ফুলের ভাষা / বক্ষে জড়ায় আসন্ন কোন আশা'।[১] সুন্দরী যেমন কুচগাত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রোমরাজিকে রঞ্জিত করে, নিবিড় আষাঢ়ে ধরিত্রী-কন্যাও তেমন বক্ষের কদম্বকেশরকে রঞ্জিত করে—

পরি লয় নতুন সবুজরঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন।[২]

নজরুল লক্ষ্য করেছেন কদম্বের শিহরণ—

এবার আমার বিলাস শুরু অনঙ্গশেখরে।
পরশসুখে শ্যামার বুকে কদম্ব শিহরে।[৩]

শিহরিত কদম্বশোভা যে কিরকম দৃষ্টিরঞ্জক এবং চিত্তহারী, কালিদাস থেকে তার একটা উদাহরণ দেয়া যাক। কুসুমভূষিতা রতিসজ্জায় সজ্জিতা পার্বতী যখন নববিকশিত কদম্বের মত কুচদ্বয়ে ভাববিশেষ প্রকাশ ক'রে লজ্জাবনতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন জিতেন্দ্রিয় শিবকে পর্যন্ত সবলে চিত্তচাঞ্চল্য দমন করতে হ'য়েছিল—

("নববিকশিত বালকদম্বতুল্য অঙ্গে ভাববিশেষ প্রকাশ ক'রে পার্বতী লজ্জা-বিভ্রান্ত সুন্দরতর নয়নে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ত্রিলোচন জিতেন্দ্রিয়; তিনি সবলে চিত্তের এই বিক্ষোভ দমন করলেন," [৪])

---

১. 'অর্ঘ্য' [মহুয়া]
২. 'লগ্ন' [মহুয়া]
৩. 'ঝড়ঃ পূর্বতরঙ্গ' [পূবের হাওয়া]
৪. [কুমারসম্ভবম্]

কালিদাসের কাল থেকে এই প্রিয় কদম্ব চলে এসেছে অজিত দত্তের কাল পর্যন্ত--চন্দন-অঙ্কনে স্নিগ্ধ স্তনযুগ—বিকশিত নীপ [১]

কুচশোভা বন্দিত হ'য়েছে কখনো গোলাপের কখনো বকুলের সৌন্দর্যের এবং সৌরভের মত---

একদা কবিতা তার বুক নগ্ন করেছিলো আপনার চোখের সম্মুখে
একদা কবিতা তার স্তনের গোলাপকুঁড়ি চেয়েছিল দিতে।[২]

(শামসুর রাহমান)

বিকচ বুকের বকুল গন্ধ
পাপড়ি রাখিতে পারেনা বন্ধ
যত আপনারে লুকাইতে চাও তত হয় জানাজানি।
অপাঙ্গে আজ ভিড় করেছে গো লুকানো যতেক বাণী।।[৩]

(নজরুল)

কবিতা তার লাজরক্তিম গোলাপকুঁড়ির মত স্তনের অনাবৃত উপহার দিতে চেয়েছিল কবি নজরুলকে। কিন্তু সেই গোলাপের উজ্জ্বলতা ছেড়ে কবি চলে গেলেন 'বাগ্মিতা নামের দজ্জাল মেয়ের কাছে, যার ক্ষিপ্ত তুমুল নর্তনে স্বপ্নগুলি পড়লো ছড়িয়ে ভাঙা ঘুঙুরের মতো।'[৪] এখানে গোলাপকোরকের মত সুঠাম এবং লালিম স্তন উপহার হিসেবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হ'য়েছে। আবার, কিশোরী মেয়ে তার সুগোপন বক্ষের মাদক সুরভি যেন অঞ্চলে আবৃত রাখতে পারছেনা—পাপড়ি যেমন পারেনা বিকচ বকুলের মদির সুরভিকে আবদ্ধ রাখতে। অতএব সুরভিত উন্মাতাল বকুল এখানে কিশোরীর বক্ষ-বর্ণনায় যথার্থ হ'য়েছে।

ঋজু ডাঁটায় উদ্ধত রজনীগন্ধার সঙ্গে তন্বী-দেহে উন্নত কুচের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন মনীন্দ্র রায়---

১. 'মালতী' / অজিত দত্ত
২. 'কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি'
৩. 'ভীরু'
৪ 'কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি"

আমার বিলীয়মান মমতা জেগে উঠেছিল সেদিন
তোমার তন্বী শরীরের উদ্ধত রজনীগন্ধার আহ্বানে,[১]

রক্তিম অশোক কালিদাসের অন্যতম প্রিয় ফুল। তাই পয়োধরের মত প্রিয় অঙ্গের সঙ্গে তিনি উপমিত করেন অশোকগুচ্ছকে। ফুলবতী অশোক-লতাকে দেখে তাঁর মনে হচ্ছে 'তন্বীং স্তনাভিরাম স্তবকাভিনম্রাম্।'[২]

বড়ু চণ্ডীদাস চাঁপাকে কুচের উপমান হিসেবে এনেছেন---

চাঁপাকুঢ়ী দেখিতে রূপসে।
তাত নাহি গন্ধের পরশে।।
বিকসিলে মোহে মুনিমনে।
হেন সব নারীর যৌবনে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেফালিবৃক্ষের পয়োধররূপে দেখেছেন শেফালি ফুলকে---

বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
কাননবীথির গোপন কোনের বিজন বাতাসে।[৩]

ডালিম ফুলের টুকটুকে লাল কুঁড়িটি পছন্দ কবি বিজয়গুপ্তের। পদ্মা-পূজার কারণে বেহুলা নিজের স্তন কর্তন ক'রেছিল–সন্তুষ্ট পদ্মা তাই বেহুলার বুকে দুটি সুদৃশ্য ডালিমকুঁড়ি তৈরী ক'রে দিলেন---

বেউলার বচনে পদ্মার হইলেক সুখ।
বাম হস্ত ছোঁয়াইল বেউলার বুক।।
দুই স্তন হৈল জেন ডালিম্বের কুঁড়ি।

'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'র কবির মতে কুচদ্বয় হচ্ছে মল্লিকা ফুল—

আমার আঁচলে মল্লিকার ফুল কেমনে দেখিলে তুমি?
নিকটে আসিয়া কাড়িয়া লইলে কি করিতে পারি আমি।।

মল্লিকা উপমান হ'য়ে এসেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এবং বিনোদ বেরার হাতেও—

---

১. 'ক্রীতদাস' [কালের কবিতা]
২. [রঘুবংশম্]
৩. [শেষ বর্ষণ]

--------স্বপ্ন
তার স্তনে মল্লিকা ফুলের ঘ্রাণ।[১]
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)
মল্লিকা ফুলের ঘ্রাণ স্তনে,[২]
(বিনোদ বেরা)

'নূরবক্ত' কাব্য-রচয়িতা উনিশ শতকের কবি আব্দুল গাফফার বলেন, নওবাহার বিবির কুচের অপরূপ লালিম বর্ণের কাছে লালাপুষ্পের রঙ পরাজিত হয়েছে। তাই লালাপুষ্পের গায়ে দাগ হয়েছে—

দন্ত বিচে মেসী দিছে কুচের প্রকার।
লালা পুষ্প দেখে প্রাণে দাগ হইল তার।।

অতি-আধুনিক এক কবির কাছে কিশোরীর কুচদ্বয় উদ্‌গ্রীব নার্গিসের মতো—
মলমলের ওড়নার মধ্যে উদ্‌গ্রীব তোমার নার্গিস[৩]
(ফরহাদ মজহার)

বয়ঃসন্ধিক্ষণে নবযৌবনা তন্বীর সদ্য গড়ে ওঠা রক্তিম কুচকে মন্দারমঞ্জরী ব'লে ব্যাখ্যা করেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী---

মঞ্জরিত বক্ষতলে রহস্যের মন্দার মঞ্জরী
আপন গোপন বাস সবিস্ময়ে খুঁজিছে গোপনে।

রজনীকান্ত সেন অভিসারিকার স্তন হিসেবে মনোনীত করেন স্নিগ্ধকান্তি মালতীকে---

কুঙ্কুম সুদিগ্ধ তনু চর্চিত সুচন্দনে,
মালতী সুগন্ধ লুটে পীন-কুচ বন্ধনে।।[৪]

কুচদ্বয়কে মাধবীসদৃশ দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।

---

১. 'অরূপ রাজ্য' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]
২. 'নীরা ও মৌমাছি' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]
৩. 'আমাদের ভালোবাসা, মেহেরজান' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]
৪. 'অভিসারিকা'

এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।[১]

স্তনদ্বয়কে দুইগুচ্ছ নমনীয় মাধবীর মতো দেখেন শামসুর রাহমানও—
একদা হৃদয়ে তার দুলতো মাধবীকুঞ্জলতা[২]

গন্ধমদির হাসনাহেনাকে ভালোবাসেন ফররুখ আহমদ। প্রিয়ার বক্ষ-সুরভিকে তাঁর মনে হয় অচেনা বনের তরুণী হাসনাহেনার সৌগন্ধ্যের মত—

তোমারে দেখেছি ঘুমভাঙা রাতে মোর উপাধান পাশে,
বহুদূর হ'তে যেন ও বুকের পুষ্প-সুরভি আসে;
জানিনা সে কোন্ অচেনা বনের তরুণী হাস্না হেনা
চিরদিন মোর অচেনা থেকেও হয়েছে পরম চেনা।[৩]

কুচদ্বয়কে কুন্দ-সদৃশ দেখেন কবি গোলাম মোস্তফা—
হে মোর লক্ষ্মী হৃদয় মক্ষী তোমার চাঁদমুখ কতই সুন্দর।
তোমার কণ্ঠে পীযুষ বণ্টে তোমার সব গায় সুবাস কুন্দর।
কুচযুগলকে শাপলা-সদৃশ দেখেছেন কবি সানাউল হক—

যেন শাপলার স্তন
ফোঁটা কি না-ফোঁটা কুঁড়ি[৪]

বুদ্ধদেব বসুর হাতে স্তনের উপমান হয়েছে জলজ শালুক—
প্রেমিকারা মৃত আজ, স্তন ছিলো শালুকফুলের মতো;[৫]

স্পেনদেশীয় কবি ফেদেরিকা গারথিকা লোরকা সদ্য-স্পর্শিত কুচযুগলকে ফুটে উঠতে দেখেন সদ্যবিকশিত কচুরি-মঞ্জরীর মত—

---

১. '১৪' [বলাকা]
২. 'একদিন রাস্তায়'
৩. 'শাহেরজাদী'
৪. 'লুলুর জন্য'
৫. 'ভিনদেশী'

ছুঁয়ে দিলাম তার ঘুমন্ত স্তন দুটি
তখুনি তারা আমার জন্য পাপড়ি মেলে ফুটে উঠলো
কচুরিপানার মঞ্জরীর মতন।[১]

অনাদৃত আকন্দকে আদর করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিভৃত, অবহেলিত আকন্দ--'ছন্দের উৎসধসভাতলে' যে আসতে চায়নি সংকোচের কারণে--সে-ই ভীরু আকন্দই বিশ্বকবির চিত্তে এনে দিয়েছে 'বিস্ময়ের গভীর আনন্দ'। তাই এই 'নম্রহাসি' আকন্দের নীলের ছোপ দেয়া শাদা ফুলটিকে তিনি সূর্যের আদর-অঙ্কিত কুচরূপে দেখেছেন--

বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালোবাসা।[২]

ধান্যশীর্ষ একটি চমৎকার নতুন উপমান। কৃষকের হাত যেমন পরম মমতায় স্পর্শ করে ভরন্ত ধানশীষকে, তেমন ক'রে কোনো কবি প্রিয়ার কুচ স্পর্শ করেন—

তোমার দেহকে আমি ছুঁই;
তোমার স্তনের ওপর হাত রাখি--
কৃষকের হাত স্পর্শ করে যেমন তার ধানের শীষ।[৩]
(মনীন্দ্র রায়)

শামসুর রাহমান কুচযুগলকে বলেন ফসলের শীষ—হ'তে পারে তা ধান, যব, গম অথবা ভুট্টার শীষ। প্রিয়তমার সমস্ত দেহ—শস্যক্ষেত্র। কুচ দুটি যেন গুচ্ছ গুচ্ছ শস্য---তারই ছায়ায় ঘুমিয়ে থাকে কবির স্বপ্ন। কুচ যেন শস্যমঞ্জরীর মত শান্তি আর সম্ভাবনা এনে দ্যায়—

আমার স্বপ্ন

ঘুমায় তোমার চোখের পাতায়, স্তনের ছায়ায়
কৃষক যেমন নিজস্ব ক্ষেত দ্যাখে অপলক

১. 'অবিশ্বাসিনী পত্নী'
২. 'আকন্দ' [পূরবী]
৩. 'আমাকে জাগতে দাও'

রমণী আমার তেমনি তোমাকে দেখি বার বার
আমার মাটিতে তুমিই সোনালী ফসলের শীষ।[১]

বেল, যুঁই, চামেলি, কস্তুরী, কুরুবক, নাগকেশর, গন্ধরাজ, টগর, রঙন, গাঁদা, ভুঁইচাঁপা, মহুয়া, শিরীষ, পারুল, পলাশ, শিমূল, অপরাজিতা, ডালিয়া, সূর্যমুখী এবং আরও অনেক জানা অজানা ফুল কুচের জন্য এক একটি চমৎকার সুশ্রী উপমান। সহসা আমার চোখে সেগুলো পড়েনি বটে, তবে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ করলে চোখে পড়ে যেতেও পারতো হয়তো। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হ'য়ে আগেই ধন্য হয়েছে—কেউ কেউ ব্যবহৃত হবার জন্য অপেক্ষমান। তবে আর একটি ফুল আমি খুঁজে পেয়েছি, সে ফুলটি ফুলকপি নামে পরিচিত। মন্দারের মত বর্ণধন্য, কদম্বের মত লাবণ্যস্নিগ্ধ, বকুলের মত সৌরভগর্বী, গোলাপ এবং কমলের মত আভিজাত্যমণ্ডিত ফুলদের সাথে যখন তরুণ ফুলকপিকে প্রবেশ করতে দেখি যৌবরাজ্যে—তখন বেশ কৌতূহলই জাগে—

চর তুমি
সবুজ রক্তিম তরমুজের মতো তোমার হৃদয়
কালো জলে সোনার ঘড়ার মতো তোমার নিতম্ব
সবুজ পাতা ঢাঁকা হলুদ তরুণ ফুলকপির মতো তোমার স্তনযুগ
সূর্যের দীঘল সাত-আঙুলের অপেক্ষায়।
(আবদুল মান্নান সৈয়দ)

প্রিয়তমা যখন সবুজাভ চর—তখন তার স্তনকল্পনায় হলুদ তরুণ ফুলকপিই তো সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ।

কোনো নির্দিষ্ট ফুল নয়—যে কোন ফুলও বহুবার নারীর স্তনের উপমান হয়েছে। রূপসী যুবতীর স্তনকে 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবক'[২] রূপে দেখেছেন কবি কালিদাস। রবীন্দ্রনাথ নিদ্রিতা কুমারীর শিথিলকাঁচুলিআবৃত স্তনযুগকে দেখেছেন অনাঘ্রাত পূজার ফুলের মত—'পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাঁকা

১. 'আমি চাই আজ'
২. ['কুমারসম্ভবম্']

অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি'।[১] অন্যত্র তিনি বলেছেন যৌবনের বসন্ত-বাতাস লেগে নারীর প্রাণের প্রেমই যেন কুসুমিত হয়ে ফুটেছে---

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে,
কুসুমিত হ'য়ে ওই ফুটেছে বাহিরে
সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল।[২]

'হৃদয়-আসন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন—

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়।

বাহু দুটি লতার মত লতিয়ে আছে এবং স্তনদুটি বিকশিত। অতএব স্তনকে এখানে ফুল ব'লে উল্লেখ না করা হ'লেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কবি তাকে ফুলই বলতে চাইছেন। সেই 'দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়' আশ্রয় লাভ করার জন্যই তাঁর কোমল কামনা।

যে স্বপ্নসঙ্গিনীকে অন্তরে সংগুপ্ত রাখতে চান কবি বুদ্ধদেব বসু, তার বক্ষে তিনি ফুলের সুষমা দেখেন—

চক্ষে যার বহ্নিরাগ, বক্ষে যার সুমধুর কুসুম-সুষমা,
অন্তরে লুকায়ে রেখো সংগোপনে সেই অন্তঃপুরচারিণীরে ;[৩]

প্রিয়তমা যেন ফুলবাগান। যুবক মালীরা সেই বাগানের দুটি ফুলকে তীব্র-ভাবে আকাঙ্ক্ষা করে—

বাগান তুমি যুবারা যেন তোমার কেনা মালী।
হাজার ফুলের মধ্যে দু'টি ফুলের অনুতাপে
মর্মাহত মালীরা তবু তোমার বুকে কাঁপে।[৪]
(আবুল হাসান)

পয়োধরকে 'যৌবনফুল' নামাঙ্কিত করেন কবি আবদুল কাদির এবং আল মাহমুদ---

---

১. 'নিদ্রিতা' [সোনার তরী]
২. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]
৩. 'স্বপ্নরিকা' [পৃথিবীর পথে]
৪. 'নর্তকী ও মুদ্রা সংকট'

যৌবনফুলে ব্রততীর মতো ভার-নত তনুলতা।[১]
(আবদুল কাদির)

আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখো বুকের গঠন
লুকানো যায়না তবু অনিবার্য যৌবনের ফুল[২]
(আল মাহমুদ)

• কোন নির্দিষ্ট ফুলের কলি নয়, বরং যে কোন ফুলকলিও কবিদের আর একটি প্রিয় উপমান। কিশোরী, তরুণী এবং উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতীর বক্ষবর্ণনায় ফুলের চেয়ে ফুলকলির উপমাই কবিদের কাছে যোগ্যতর মনে হয়। তাই দেখি বিদ্যাপতির নবীনা যুবতী রাধিকা বয়ঃসন্ধির দুর্লভ মাহেন্দ্র-ক্ষণে নবোদ্গত হৃদয়মুকুল দর্শনে নিজেই বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ছে এবং কখনো অঞ্চলে মুকুল দুটি আবৃত আবার কখনো অনাবৃত করছে—

হৃদয়জ মুকুলি হেরি হেরি থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥

পদকর্তা গোবিন্দদাসও লক্ষ্য করেছেন নবযুবতী রাধার কুচদ্বয় পুষ্পকোরক সদৃশ—

কনক-কটোর-চোর কুচকোরক জোরে
উজোরিল মোতিমদাম॥

দিগম্বরী শ্যামার রূপবর্ণনায় পদাবলীকার কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ—

তনুক্ষীণা, সুনবীনা, বস্ত্রহীনা ষোড়শী॥
নীলকমল জিতাস্য,
তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য ভালে শিশু শশী॥

মুখে পূর্ণিমার চাঁদ বেঁধে রেখেছে যে তরুণী কন্যা, তার রূপবর্ণনায় লোক-কবি—'বুকেত বান্ধিয়া রাখে কন্যা জোড় কুসুমের কলি।' ফুলমুকুলের উপমান রবীন্দ্রনাথকেও আকর্ষণ করে—'পূর্ণচন্দ্রকররাশি / মূর্ছাতুর পড়ে আসি / এই নবযৌবনের মুকুলে।'[৩] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতায়ও উপমাটি সহজলভ্য—

---

১. 'যৌবনবতী'
২. 'অহোরাত্র' [লোক লোকান্তর]
৩. 'লজ্জা' [সোনার তরী]

শেষবিস্তার পাণ্ডুর তব স্তনকোরকের জ্যোতি
শিথিল শিথানে কারে মোহিয়াছ ব্রীড়ায় বেপথুমতি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়ও মিলবে উপমাটি—

আঁচল তবু অনামা কলি পীড়ি
কী পরিমল সঞ্চে ফেরে ফেরে।[১]

ফুলপ্রসঙ্গ শেষ হলো। এই অবকাশে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, স্তনপ্রসঙ্গে আমি এক উপমান থেকে আর এক উপমানের রাজ্যে বিচরণ করবো। 'ফুল' থেকে চলে যাবো 'পর্বত' প্রসঙ্গে তারপর চলে যাবো 'ফলে'র রাজ্যে, 'ফল' ছেড়ে চলে যাবো 'ঘট', 'কলস', 'বাটি' ইত্যাদি প্রসঙ্গে—ক্রমশঃ খুঁজবো আরো নতুন নতুন উপমান। একটি করে উপমান বেছে নেবো এবং দেখবো সে বিষয়ে বিভিন্ন কবি কিভাবে মুখর হয়েছেন। অতএব এই মুহূর্তে সুরভিমদির, বর্ণিল এবং নমনীয় 'ফুলে'র উপমান ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি প্রস্তরকঠিন, সুদৃঢ় এবং সুউচ্চ 'পর্বতে'র জগতে।

গঠনগত সাদৃশ্যের জন্য সত্যিই আর একটি চমৎকার উপমান হচ্ছে পর্বত। কালিদাসের পৃথিবী যেন এক সুন্দরী গর্ভবতী রমণী। আম্রকূট পর্বত যেন সেই গর্ভিনীর সুপুষ্ট স্তন। সে পর্বতের প্রান্ত ছেয়ে আছে ঘন আম্রবনে—যে আম্রবন সুপক্ক আম্ররাজিতে শোভিত হ'য়ে নিয়ে এসেছে গৌর-বর্ণের আভাস। কৃষ্ণ কজ্জ্বলমেঘ সেই পাহাড় চূড়ায় ন্যস্ত হবার ফলে যে দৃশ্য হলো, তাতে মনে হয় গর্ভাবস্থায় পৃথিবীর পাণ্ডুবর্ণ স্তনের বৃন্ত যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে—

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ—
স্তয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুন প্রেক্ষণীয়াবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষ বিস্তারপাণ্ডুঃ॥[২]

(প্রান্ত ছেয়ে আছে আম্রবনরাজি ঝলক দেয় তাতে পক্ক ফল
বর্ণে চিক্কন বেণীর মতো তুমি আরূঢ় হ'লে সেই শৃঙ্গে—
দৃশ্য হবে যেন ধরার স্তনতট, অমর মিথুনের ভোগ্য,

১. 'সংশয়' [উত্তর ফাল্গুনী (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ)]
২. [মেঘদূতম্]

গর্ভসূচনায় মধ্যে কালো আর প্রান্তে পাণ্ডুর ছড়ানো।

—বুদ্ধদেব বসু-কৃত উপরোক্ত শ্লোকের অনুবাদ)

বৈষ্ণব কবির চোখে রাধাই ধরিত্রী। তাই সঙ্গতভাবেই তাঁর স্তন হয় পর্বত। বড়ু চণ্ডীদাসেরও তাই ধারনা। রাধার উচ্চ কুচযুগলের উপরে মনিশোভিত গজমোতিহার দেখে বড়ু চণ্ডীদাস কল্পনা করেছেন যেন সুমেরু-শিখরের দুইধারে সমধারায় বহমান সুরেশ্বরী নদী—

গিএ গজমুতী হার মনি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হঅাঁ সমান আকারে সুরেশরী দুই ধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে ৷৷

পর্বতে বহতা নদী বিদ্যাপতিও দেখেছেন—রাধার উন্নত কুচ-চূড়ায় দোলায়মান মোতিহারটি তাঁর চোখে সুরেশ্বরীর দ্বিধাবিভক্ত ধারার মতই বিমল—নির্মল—

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার ৷৷

পর্বতচূড়ায় সুরেশ্বরী নদীকে আলাওলও দেখেছেন—

কুচগিরিপরে বহে নিরন্তরে
জেন ষুরেশ্বরী ধার ৷৷

স্তনোপরি বিন্যস্ত 'শতেশ্বরী হার'কে নীলগিরিশৃঙ্গে মন্দাকিনীপ্রবাহ কল্পনা করেন দুঃখী শ্যামদাস—

শতেশ্বরী হার মধ্যে বুকে দোলে মনি।
নীলগিরি শৃঙ্গে যেন বহে মন্দাকিনী ৷৷

দ্বিজ মাধবের চোখে পর্বতচূড়া দু'টি হিমালয় এবং নদীটি ভাগিরথী—

কুচ তোর গিরিবর মাঝে কনকের হার
সুরচিত শোভয়ে তাহায়ে।
যেন হিমাচল মাঝে ভাগীরথী ধারা সাজে
দেখি ধন্দ পাইলু মনয়ে।

রাধার হেমহারশোভিত সুউচ্চ স্তনমূল চণ্ডীদাসের চোখে সূর্যোজ্জ্বল সুমেরুশিখরের চেয়েও শ্রীমণ্ডিত মনে হয়—

উচ কুচমূলে হেমহার দোলে
 সুমেরু শিখর জিনি।

রাধার এক পয়োধর চন্দনচর্চিত, অতএব রঞ্জিত; অপরটি চন্দনবর্জিত অর্থাৎ গৌর---যেন একটি হিমধরাধর, অন্যটি কনকভূধর—

এক পয়োধর চন্দনলেপিত আরে সহজই গোর।
হিম ধরাধর কনক ভূধর কোরে মিলল জোর।।
(বিদ্যাপতি)

বিদ্যাপতি কুচকে যখন শিব কল্পনা করেন, তখন কুচে চন্দনচর্চা তাঁকে আনন্দ দেয়---মনে হয় শিবশরীরে ভস্মচর্চা করা হয়েছে। কিন্তু কবি যখন কুচকে পর্বত কল্পনা করেন, তখন সবসময় চন্দনচর্চার পক্ষপাতিত্ব করেন না---কেননা সুমেরুর পক্ষে তুষারাচ্ছন্ন হয়ে পড়া সুখদায়ক নয়। হিমাচ্ছন্ন হ'লেই আলোহীন হ'য়ে পড়তে হয়। তাই কবির আবেদন—

চন্দনে ধবল ন করু।
হিমে বুড়ি জাএত সুমেরু।।

চঞ্চল হস্তে বক্ষে অঞ্চল সংস্থাপনের সময় রাধার একটি স্তনের অর্ধাংশ প্রকাশিত হ'য়ে পড়লো---অমনি বিদ্যাপতির মনে হলো, বায়ুতাড়িত শরতের মেঘ অপসৃত হ'য়ে যেন সুমেরু প্রকাশিত হল—

উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভব সরদ ঘন জনু
বেকত কএল সুমেরু।।

২২৬ পদে বিরহিনীর বেদনায় আনত মুখ কুচযুগলে এসে পড়তে দেখে বিদ্যাপতির মনে হয়েছে রাহুর ভয়ে মুখচন্দ্র কুচপর্বতে আরোহণ করেছে। স্তনাগ্রে নখরেখাকে বিদ্যাপতির মনে হয় মেরুশিখরে উদিত নব শশধর—"পীন পয়োধরে মনোহর নখরেখা হাত দিয়া ঢাকিতেছ কেন; মেরুশিখরে নব শশধর উদিত হইলে চুরি গোপন থাকে না।" কবি কখনো পাহাড়ে চন্দ্রো-

দয় দেখেন---কখনো দেখেন অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়ে জ্বলছে অগন্য তারকা। বিপরীত রতিকালে রাধার স্তনযুগলে যখন ঘনকৃষ্ণ কেশ এলিয়ে পড়েছে— তাতে জড়িয়ে গিয়েছে হারের মানিকগুলো, তখনকার চিত্র এটি—

কুচজুগ পর চিকুর ফুজি পসরল
তা অরুঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহিন সব তারা।।

স্তনকে পর্বত কল্পনা ক'রে ক'রে মধ্যযুগীয় সকল কবির মত বিদ্যাপতি এতই অভ্যস্ত হ'য়ে গেছেন যে, তিনি কদলীবৃক্ষের (জানু) ওপর সিংহকে (কটি) সমাসীন ক'রে তার উপর চাপিয়ে দেন প্রকাণ্ড পর্বত (স্তন)। পর্বতের ওপর আবার ফুটিয়ে তোলেন দুই কমল (স্তনবৃন্ত)। মৃণালহীন কমল দু'টি বাঁচে কি ক'রে? তাই মনিময় হারকে সুরেশ্বরী নদী কল্পনা করা হল। সেই সুরেশ্বরী-বারিই জীবিত এবং সতেজ রেখেছে কমল দুটিকে। কবি খুবই ব্যাখ্যাপ্রবণ এবং যৌক্তিকতা-অন্বেষী। তবুও আমরা বুঝতে পারছিনা, পর্বতের ওপর আবার কমল ফোটে কি ক'রে? কিন্তু পর্বত, কমল---এগুলোই তো স্তনের প্রথাসিদ্ধ উপমান। ঐতিহ্যবাদী কবিরা প্রথানুগত্য থেকে বিচ্যুত হ'তে রাজী নন। কবির সেই ব্যাখ্যাবহুল পদটি এই—

কনক কদলি পর সিংহ সমারল
তাপর মেরু সমানে।।

মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাই।

মনিময় হার ধার কহ সুরসরি
তেঁ নহি কমল সুখাই।।

পদ্মকে কখনো কখনো পর্বতশৃঙ্গে উপুড় ক'রে দিয়েও কবির আনন্দ--- "তাঁহার (হরির) করে কুচমণ্ডল লুকাইয়া রহিল, মনে হয় যেন কমল কনকগিরিকে ঝাঁপিয়া রাখিল।"[১] (বিদ্যাপতি)

১. ৫৬৬

শুধু পাহাড় দেখে কবি তৃপ্ত নন। ক্যলনাগিনী যদি সোনার পাহাড়-চূড়ায় কুণ্ডলায়িত থাকে কিংবা নিঃশ্বাসবায়ু পানের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের গায় এঁকে বেঁকে ছুটে বেড়ায়, তাহলে কবি খুবই আনন্দ পান, দৃশ্যগুলো যত অবাস্তবই হোক না কেন—

(১) "ঘন কৃষ্ণ বেণী কুচ-কলসে লুটাইয়াছে, যেন স্বর্ণগিরির উপর কৃষ্ণ-সর্পিনী শয়ন করিয়াছে।"[১] (বিদ্যাপতি)

(২) "তোমার উত্তুঙ্গ পীন পয়োধরের উপর অধরের ছায়া দেখিতেছি যেন মদনদেবের শ্রেষ্ঠ মায়ায় কনকগিরির উপর প্রবাল উৎপন্ন হইল; তাহাতে আবার বিরহমলিনা রমণীর বেণী পালটিয়া পড়িয়াছে, যেন কালনাগিনী নিঃশ্বাস-সমীরণ পান করিবার জন্য ধাবিত হইল।"[২] (বিদ্যাপতি)

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে আর একটি চমকপ্রদ দৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাগর-গর্ভের প্রবালকেও কবি পর্বতশিরে সংস্থাপিত করেছেন। অন্যত্র দেখি কবি পর্বতগাত্রে চামর ধরিয়েছেন---"মুক্ত কবরী উল্টাইয়া বক্ষে পড়িতেছে। যেন স্বর্ণগিরিতে চামর ধরিয়াছে।।" (বিদ্যাপতি)

রাধার ক্ষীণ অঙ্গে স্থূল পয়োধর দেখে কবি মনে করেন স্বর্ণলতায় অথবা দ্রোণলতায় পর্বত উৎপন্ন হয়েছে। কবির ক্ষমতা এখানে যাদুকরের চেয়ে কিছু কম নয়। লতাগাত্রে পর্বত দর্শন করে বিস্মিত হওয়া ছাড়া পাঠকের কোন উপায় থাকেনা—

(১) পীন পয়োধর দুবরি গাতা,
মেরু উপজল কনকলতা।।
(বিদ্যাপতি)

(২) দমনলতা পর দেখল সুমেরু।
(বিদ্যাপতি)

কালিদাস পর্বতশৃঙ্গের ওপর পুঞ্জিত মেঘ দেখেছিলেন---কিন্তু বিদ্যাপতি মেঘকে মাটিতে শুইয়ে তার ওপর পর্বতকে উল্টো ক'রেও স্থাপন ক'রে

১. ১৬৮
২. ২৪৬

দেখেছেন---"জলধর উলটিয়া পৃথিবীতলে পড়িল, এবং তাহার উপরে সুন্দর পর্বতযুগল উদিত হইল।"[১] এটি বিপরীত মিলনের বর্ণনা। জলধর হচ্ছেন কৃষ্ণ, পর্বতযুগল হচ্ছে রাধার স্তন।

এতসব অভিনব পাহাড় দর্শন বাস্তবে কোনদিন সম্ভব ছিলনা---কবি বিদ্যাপতির বদৌলতে আমরা তা দেখে ধন্য হয়েছি।

বৈষ্ণব পদকার কবিরঞ্জন বলেন, মিলনমুহূর্তে সম্ভোগকাতর শ্রীকৃষ্ণ রাধার অঞ্চলাবরণ সরিয়ে উন্নত পয়োধরশোভা দর্শন ক'রে এমন বিমোহিত—ঠিক যেমন জন্মপঙ্গু পর্বতারোহণে এবং শৃঙ্গদর্শনে বিমোহিত—

আঁচর পরশি পয়োধর হেরু।
জনম পঙ্গু জনি ভেটল সুমেরু।।

গোবিন্দদাসও তীক্ষ্মচূড় গিরিকেই রাধার পীনোন্নত পয়োধরের উপমান করেছেন—

ঘন ঘন আঁচর কুচগিরি কাঁচর হাসি হাসি তহি পুন হেরি।

রাধার উচচ কুচশোভা জ্ঞানদাসের মনেও নিয়ে আসে কনকগিরির স্মৃতি---

উচ কুচযুগ কনকগিরি।

মনসার স্তনে সোনালি হালিয়া নাগ যখন শিউরে শিউরে উঠছে, তখন বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনে হয় পাহাড় চূড়ায় যেন বিজুলী ঝলসে উঠছে—

হালিয়া নাগ দেবীর হৃদয়ে শোভে হার।
সুমেরু শিখরে যেন বিজলী ঝঙ্কার।।

ছাগচারণকালে অশ্রুমতি খুল্লনার বক্ষে যখন চিকুররাশি এসে প'ড়েছে, তখন দ্বিজ মাধব বলছেন, বর্ষণ-আশংকায় যেন নাগিনীরা গিরি-ডালে আশ্রয় নিয়েছে---

নয়ানে গলয়ে নীর নিবারিতে নারে চির
কুচমাঝে গলিত চিকুর।
ঘন বরিষণ জানি ভুজঙ্গিনী ভয় মানি
গিরি ডালে আছয়ে প্রচুর।।

---

১. ৬৯৬

চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামও চণ্ডীর কাঁচুলিশোভিত স্তনের উপমা সৃষ্টি-কালে স্মরণ করেন হেমগিরিকে---

গজকুম্ভ পয়োধর কিবা হেম গিরিধর
বিচিত্র কাঁচলি শোভে তায়।।

পদ্মাবতীর স্তনদ্বয়ও আলাওলের চোখে সর্পের আবাসস্থল পর্বতের মত---
রোমাবলী নাগিনী বৈসয়ে কুণ্ডান্তরে।
পর্বতে উঠিতে চাহে আহারের তরে।।

পর্বতশিখরে বলদর্পী সিংহের আস্ফালন একটি অতি স্বাভাবিক চিত্র। কিন্তু এই সিংহকে (কটি) পর্বতের (স্তন) পাদদেশে ব'সে থাকতে দেখা যাচ্ছে আলাওলের কাব্যে—গিরিশৃঙ্গ পরে সিংহ বৈসে অনুক্ষণ।
হেন সিংহ গিরি অধে সতত বসতি।

'পর্বত' উপমানটি নওয়াজিস খান খোন্দকারের কাব্যেও আছে।
ঘুমন্ত রাজকন্যার স্তনদ্বয় নওয়াজিস খোন্দকারের চোখেও যুগল সুমেরুর মতই প্রতিভাত হয়—

কনক কটোরা তাহে যুগল সুমেরু।।

কন্যার লাবণ্যজ্বলজ্বল মুখখানি রামপ্রসাদ সেনের চোখেও দুই পাহাড়ের ফাঁকে চন্দ্রোদয়ের মত—

তারপর শোভিত যুগল গিরিবর।।
তাহার উপর পূর্ণ বিধুর উদিত।

রূপ গোস্বামী রাধা-দেহকে দ্বীপ কল্পনা করেছেন। বাল্যরূপী অন্ধকার কেটে গিয়ে সেই দ্বীপে যৌবন-সূর্য উদিত হচ্ছে। নক্ষত্রের (নয়নের)ঈষৎ চাঞ্চল্য লক্ষিত হচ্ছে, উদয়াচলের (স্তনের) শোভোন্নতি এবং বদনপদ্মের প্রফুল্লতা আরম্ভ হচ্ছে—"তুমি বাল্যরূপী অন্ধকার। শ্রীরাধার দেহরূপ দ্বীপ হইতে তারুণ্য-তপনের বিজয়ারম্ভ অগ্রে প্রকাশ পাইতেছে। অতএব শীঘ্র প্রস্থান কর। ঐ দেখ কৃষ্ণবর্ণ গগনমণ্ডলে ভাস্করের প্রকাশ; নক্ষত্রের ঈষৎ চাঞ্চল্য, বক্ষস্থলরূপী উদয়াচলের শোভোন্নতি এবং বদনপদ্মের প্রফুল্লতা আরম্ভ হইল; অতএব তোমার আর এখানে থাকা উপযুক্ত নয়।"[১]

---

১. [উজ্জ্বলনীলমনি]

কেউ কেউ পর্বতের ভয়ংকর রূপ দেখেছেন। যেমন--'লাঙ্গলের ইসে'র মত দাঁত যার, সেই পুতনারাক্ষসীর মৃত্যুরূপ আঁকার সময় মালাধর বসু তার স্তনদ্বয়কে বিশাল শৈলরূপে দেখেছেন—

লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি
গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি।
গণ্ড সৈল দুই স্তন কপিল কেসভার।

দু'একজনের কথা ছেড়ে দিয়ে সকল কবি সম্পর্কে বলা যায়, পর্বতের ভয়ংকর রূপের চেয়ে তার সৌন্দর্যরূপই তাঁদের অন্তরে গাঁথা আছে। পর্বতের আর একরকম উপযোগিতাও রয়েছে। দেহের কাব্যরচনাকালে পুরাতন যুগের দেহবাদী কবিকুল সেই উপযোগিতা দর্শনে বড়ই শিহরিত হয়েছেন। মিলন-তরঙ্গের গতি বজায় রাখার জন্য স্তন যে কি চমৎকার প্রতিঘাত-শৈল কবি-কুল তা লক্ষ্য করেছেন। প্রতিঘাত-শৈল দু'টি আছে বলেই যুক্তদেহের প্রচণ্ড পুলকাবেগ গতিময়তা লাভ করতে পারে।

পর্বত তার সমুন্নত রূপশোভা নিয়ে আধুনিক যুগের সাহিত্যেও চলে এসেছে। মধুসূদন মেরুশৃঙ্গে দৃঢ়-উন্নত স্তনের আকৃতিক সাদৃশ্য দেখেছেন। তাই তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' অনিন্দ্যসুন্দরী মুনি-মন-মোহিনী তিলোত্তমার 'উরস-আনন্দবনে' বাসের আকাঙ্ক্ষায় দাড়িম্ব এবং কদম্বের বিষম বিবাদ উপস্থিত হলো, দেবশিল্পী সেই বিবাদ দেখে তিলোত্তমার কুচযুগকে মেরুশৃঙ্গাকৃতি দিলেন—

দাড়িম্ব কদম্বে হইল বিষম বিবাদ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস আনন্দ-বনে। সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ।

সহমরণগামী প্রমীলার সুন্দর ক্ষীণ কটিদেশের স্পর্শবঞ্চিত হ'য়ে মলিন মনিময় সারসন---গিরিশৃঙ্গ সদৃশ সেই উচ্চ স্তনের সান্নিধ্যধন্য সুবর্ণ-কবচও ঐ একই কারণে মলিন—

সারসন মনিময়; কবচ, খচিত
সুবর্ণে---মলিন দোঁহে; সারসন স্মরি,
হায় রে সে সরুকটি! কবচ ভাবিয়া
সে উচ্চ কুচযুগে---গিরিশৃঙ্গসম।[১]
(মধুসূদন)

মধুসূদন যখন কপোতাক্ষের জলধারাকে 'দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে'[২] ব'লে আখ্যাত করেন, তখন আমরা সে স্রোতের উৎসমূল খুঁজলে দেখতে পাবো একটি উত্তুঙ্গ পর্বত, যার গা বেয়ে রেখার মত গড়িয়ে নেমেছে কপোতাক্ষের রূপালি ধারা---ঠিক যেন জননীর স্তনগাত্রে দুগ্ধের শ্বেত স্রোতোরেখা।

লাল চাদর-আবৃত কুচদ্বয়কে লাল-আভামণ্ডিত শ্বেত পর্বতরূপে কল্পনা করেছিলেন বিহারীলাল--- লাল আভা মাখা শাদা ধরাধর
উরসে চিকন চাদর সাজে।

রবীন্দ্রনাথও লক্ষ্য করেছিলেন স্তনের পর্বতাকৃতি---
পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা বিহারভূমি কনক-অচল।[৩]

রবীন্দ্রনাথ 'বসুন্ধরা' কবিতায় একগুচ্ছ শৈলমালার বর্ণনা দিয়েছেন---যার পাদদেশে আছে নীল সরোবর---শৈলস্তননির্গত দুগ্ধধারাই যেন সেই সরোবর সৃষ্টি করেছে। খণ্ড মেঘেরা শিখর আঁকড়ে পড়ে আছে মাতৃস্তনপানরত অকলঙ্ক শিশুর মতন—

—চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ খণ্ডমেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি,

১. [মেঘনাদবধ কাব্য]
২. 'কপোতাক্ষ নদ'
৩. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]

স্তনের এখানে কামগন্ধহীন মহিমাব্যঞ্জক রূপ। এই গরিমা আরোপের জন্য এখানে বিশাল-মোহন পর্বতকে উপমান নির্বাচন করা যথার্থ হয়েছে।

আধুনিক অনেক কবিই পর্বতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্তনের উপমান হবার ভাগ্য অর্জনের জন্য---

বক্ষে তার যুগল হেমগিরি[১] (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)
যেন সুভদ্রার তরঙ্গিত শরীরের নারীত্বের বিভা
মুখের নিটোল, কটির ভাঙন, বক্ষের পাহাড়[২]
(বিষ্ণু দে)

হে দৃষ্টি-অন্ধকরা যুগ্ম চূড়া, এ কোন যজ্ঞ? বলো, তুমিই কি ধাত্রী
দিগন্তে ঘুমন্ত সূর্যের?[৩]
(বুদ্ধদেব বসু)

সুমেরু পর্বতে আমি মাথা রাখি[৪] (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)
তুঙ্গ তোমার মোহিনী বুকের চূড়া।[৫] (ফজল শাহাবুদ্দীন)
বৃথাই বস্ত্রে ঢাকিস বুকের ললিত চূড়া[৬]
(পবিত্র মুখোপাধ্যায়)

পর্বতের বিরল-নির্জন-মোহকর পরিবেশ কবিকে এমনই আবেশমুগ্ধ ক'রে ফেলে যে কবি সেখানে আশ্রয় পেতে চান—হারিয়ে ফেলতে চান দিনরজনীর বিভোর প্রহরগুলোকে, এমনকি নিজের সত্তাটিকেও; আর মোহাবিষ্টের মত বলতে থাকেন 'তোমাকে কিছুই অদেয় নয়,' 'তোমাকে কিছুই অদেয় নয়'—

দেহ বিভঙ্গে তুমি নবনীতা
তোমার বক্ষে পাহাড় নামে
আমি আশ্রয় সেখানেই চাই
দিবস রজনী সকল যামে

---

১. 'সংশয়' [উত্তর ফাল্গুনী]
২. 'ভাদ্রসন্ধ্যা' [সংবাদ মূলত কাব্য]
৩. 'জন্ম' [কবিতা সংগ্রহ]
৪. 'সুন্দরের পাশে'
৫. [তৃষ্ণার অগ্নিতে একা]
৬. 'কোনো সুন্দরী মহিলাকে' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]

সেখানে হারাবো সকল সময়
বিভোর কালকে অসংশয়
সেখানে আমার সকল সত্তা
তোমাকে কিছুই অদেয় নয়।[১]
(সৈয়দ আলী আহসান)

কেউবা পর্বতের ছায়ায় চান ঘুমোতে, তেমন ঘুম---নিভৃত পল্লীটি পর্বত-প্রান্তে যেমন ঘুমোয় অকাতরে অথবা লবণপাহাড়ের পাদদেশে হাল্কা নোনতা গন্ধে যেমন ঘুমোয় বিবশ পথিক—

. . . . . প্রান্তরে বিস্তীর্ণ হ'য়ে শুয়েছে যখন,
ঘুমিয়েছি অনায়াসে তুঙ্গ তার স্তনের ছায়ায়
পর্বতের পদপ্রান্তে শান্ত এক পল্লীর মতন।[২]
(বোদ্‌লেয়ার/অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

তার দু'টি মাংসের গোলাপ থেকে নুনের হাল্কা গন্ধ আমার
কামনার ওপর দিয়ে বাতাসের মত বইতে লাগলো। যেন আমি
লবণপর্বতের পাদদেশে ঘুমিয়ে পড়বো।[৩]
(আল মাহমুদ)

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, স্তনের পর্বত উপমান দেশী বিদেশী সকল কবিকেই সমান আকর্ষণ করে। দু'জন বিদেশী কবির কবিতা থেকে উপমানটিকে এখন চয়ন করা যাক। বোদলেয়ারের 'অলংকার' কবিতায় দেখি, ডাকিনীর মতো কবির বাসনায় নাড়া দিয়ে যে সুন্দরী অলসনয়না ঈষৎ হেসে পালঙ্কে এলায়িতা---সমুদ্রের মতো অতলান্ত কবির কামনা তার তুঙ্গ চূড়া ছুঁয়ে দেয় জোয়ারের প্রবল উত্থানে—

নিলো সে আমার কাম: তারপর, পালঙ্কবিতানে
এলিয়ে, ঈষৎ হেসে, তাকালো সে অলসনয়না।
সমুদ্রের মতো নম্র, অতলান্ত আমার কামনা
ছুঁলো তার তুঙ্গ চূড়া জোয়ারের প্রবল উত্থানে।[৪]
(অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

---

১. 'তোমাকে-দুই'
২. 'La Giante' ('দানবী')
৩. 'চক্রবর্তী রাজার অট্টহাসি, [মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো]
৪. 'Los Bijoux'

এ্যালেক্স কামফর্ট তাঁর 'প্রেমের ভংগিমা' কবিতায় যে নারীর উরুর সওয়ার হবার বাসনা পোষন করেছেন, সেই নারীর স্তনকে পর্বতাকৃতি কল্পনা করেছেন। তিনি বলেছেন উরুরূপ ধবধবে ঘোড়াটিকে স্তন-পাহাড়ের কোলে বেসওয়ার বেঁধে রেখেছে সেই নারী—

একটি ধবধবে ঘোড়া, প্রিয়া তাকে পাহাড়ের কোলে
গোচারনে বেসওয়ার বেঁধে রাখে।
. . . দেখেছি সে স্তন দুটি ধমনীত—পাহাড়ের মতো—
(অনূবাদ : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী)

এতক্ষণ ধরে আমরা নানা নামের পর্বত দেখেছি—আম্রকূট পর্বত, সুমেরু পর্বত হিমালয় পর্বত, উদয়গিরি, কনকগিরি, স্বর্ণগিরি, হেমগিরি, নীলগিরি লবণগিরি। কিন্তু মোহিতলাল মজুমদার যে গিরির কথা বলেন—সে গিরি হচ্ছে আগ্নেয়গিরি। সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস হিসাবে তিনি স্তনকে 'অগ্নিগিরি' নাম দিয়েছেন—

নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি;
অনন্তরহস্যময়ী স্বপ্ন-সখী চির অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন--এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী
নেত্র তার মৃত্যুনীল ! অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ। কটিতলে জন্ম-রাজধানী।
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস—জানি তাহা জানি।

এই স্পর্শ-ভয়ংকর যুগ্ম অগ্নিগিরি—যেখানে অগ্নিশিখার মত প্রেম রাত্রিদিন কাঁপছে মৃত্যুহীন—সেখানে কবি এঁকে দেন চুম্বন-চিহ্ন—

বক্ষ তব ঢাকিয়া দিনু চুম্বনের ছাপে—
যুগ্ম সেই অগ্নিগিরি স্পর্শ-ভয়ংকর,
যেখানে প্রেম মৃত্যুহীন রাত্রিদিন কাঁপে।[১]
(বুদ্ধদেব বসু)

কোনো কবি এই টগবগে লাভার আধারকে সুপ্ত রূপে দেখেন—আর তাই গোলাপের পাপড়ি বর্ষণের সাহস পান—তার গাত্রে শিশিরের সৌন্দর্য অবলোকনের সুযোগ পান—

১. 'বিবাহ' [কঙ্কাবতী]

২৮

२५

এসো গোলাপের পাপড়ি ছড়াই
তোমার স্তনের সুপ্ত গিরির গাত্রে
এক নিশীথের শিশির জমুক
অজর লাভার পাত্রে।[১]

(জ্যোতির্ময় দত্ত)

প্রিয়ার 'দেহলাবণ্যে নীপমঞ্জরী', 'কুরলিত' কেশে তরঙ্গহিল্লোল এবং নয়নে খঞ্জন-আসঙ্গ লক্ষ্য ক'রে আবেশবিহ্বল কোনো কবি যখন প্রিয়াবক্ষে আশ্রয় নেন, তখন সহসা ভূকম্পন তাঁকে বিহ্বল ক'রে ফেলে—

বক্ষে তোমার আশ্রয় পেয়ে
যখন সহসা ভূকম্পন[২]

(সৈয়দ আলী আহসান)

পর্বতের চেয়ে আকৃতিতে ছোট টিলা শামসুর রাহমানের বেশ প্রিয়। রমণীর স্তন-অঞ্চলে যে সুগোপণ নির্জনতা বিরাজ করে, জনকোলাহলবর্জিত পার্বত্য-অঞ্চলে নীরব টিলাগুলোর মধ্যেও তিনি সেই নির্জনতা দেখতে পান। পাশাপাশি দুটি সমমাপের টিলাকে যুগল স্তন ভাবতে তাঁর বেশ আনন্দ—

পড়শী নদীর তুলে-ধরা আশিতে ভাসলে মুখ,
ফুলের গোপন অন্তঃস্থলে দুটি চোখ
দেখতে পাওয়া কিংবা
সূর্যোদয়ে নির্জন টিলায় বক্ষচূড়া; নিসর্গের পরতে পরতে
মানবীর রেখা ফুটে ওঠা মানে তোমাকেই ভাবা[৩]

সূর্যোদয়ে নির্জন টিলা যখন রক্তলাল দেখায় তখন কবি তাতে রূপসীর নির্জন, নখরক্তিম স্তনকে প্রত্যক্ষ ক'রে স্মরণে আনছেন প্রেয়সীকে। মধ্যরাতে যখন কবি কামোন্মত্ত হ'য়ে পড়েন, তখন বনজ গন্ধভরা রেশমী ঝোপের মত প্রিয়ার গোপন রোমরাজিতে মুখ রাখেন। প্রিয়ার উরুরূপ যমজ ঘোড়ায় তিনি তখন সওয়ার হ'য়ে পড়েন। অন্ধকারে যুগল টিলার মত প্রিয়ার নিরেট স্তন দুটি তাঁর মুঠোয় কাঁপতে থাকে—

১. 'বনভোজনের আমন্ত্রণ' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]
২. '৩১' [সহসা সচকিত]
৩. 'যখন তোমার কথা ভাবি'

হঠাৎ দেখি মুখ রেখেছি
গন্ধভরা রেশমী ঝোপে;
যমজ ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে
যুগল টিলা মুঠোয় কাঁপে অন্ধকারে।[১]

কবি যখন প্রকৃতিতে নিজের কামনার সঞ্চারণ দেখেন, তখন তাঁর কাছে যুগল টিলা নখরঞ্জিত স্তনসদৃশ মনে হয়—

যুগল টিলা অস্তরাগে লাল।[২]

টিলাকে প্রিয় নয়, বরং ভয়ংকর ভেবেছেন তরুণ কবি মহাদেব সাহা। কবি দুগ্ধবতী গাভী, শিশু, সুন্দরী, স্ফটিক জল, ধানের জমি, সবুজ ভাঁড়ার ইত্যাদি কিছুই ছুঁতে চান না। তাঁর ধারণা, তাঁর অপয়া হাতের স্পর্শে মুহূর্তেই সবকিছু হ'য়ে উঠবে অকল্যাণকর। তাঁর হাতে যেন কুমারীর খোঁপা ভেঙে যায়, স্তন হ'য়ে ওঠে ভয়ংকর কংক্রিটের টিলা—

আমার হাতের স্পর্শে ঝরে যায়
গোলাপের মায়াবী আড়াল
কুমারীর ভেঙে যায় খোঁপা, খোঁপার আহ্লাদ খসে যায়,
বুকের গভীর স্তনে জেগে ওঠে ভয়ংকর কংক্রিটের টিলা।[৩]

পর্বতও নয়, টিলাও নয়—এবার পাথরপ্রসঙ্গ। পর্বতের বিশালতা কমিয়ে বিদ্যাপতি স্তনকে পাথর কল্পনা করেছিলেন। এটা করা হ'য়েছিল কৃষ্ণের স্বার্থে। মানিনী রাধার কাছে কৃষ্ণ শাস্তি যাচ্না করছেন---'পয়োধর পাথর হিয় দহ ভারি'---আমার বুকে পয়োধররূপ পাথর চাপিয়ে দাও। 'পয়োধর গিরি হিয় দহ ভারি'---বলতে হ'লে প্রাণান্ত ব্যাপার হ'য়ে উঠতো শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে। ভারতচন্দ্রের সুন্দর কিন্তু এই প্রাণান্তকর শাস্তিই কামনা করেছিল--- যদিও অপরাধ তার কৃষ্ণের চেয়ে কম। তার অপরাধ হলো—একদিন দিবা-ভাগে বিদ্যার নিদ্রাভঙ্গ না ক'রেই সে তার সঙ্গে রতি-উপভোগ করেছিল। প্রিয়ার কাছে এই সুমধুর অপরাধের জন্য বেচারা বুকের ওপর পাহাড়ের চাপও সহ্য করতে রাজী—

---

১. 'ময়ূরগুলো' ২. 'টানাপোড়েন'
৩. [মানব এসেছি কাছে]

অপরাধ করিয়াছি   হুজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি   নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড।।

যাহোক, আমরা পাথর উপমানটির কথা বলছিলাম। একালের তরুণ কবিও স্তনকে পাথর কল্পনা করেন। তরুণ কবি মহাদেব সাহা বলেন এতকাল তিনি ভুল ওষ্ঠে চুম্বন করেছেন, ভুল রমণীর সঙ্গে যামিনী যাপন করেছেন, কোমল ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয় এখানে স্তন) ভেবে ওষ্ঠে পাথর ছুঁয়েছেন—

আমি এতোকাল ভুল ওষ্ঠে করেছি চুম্বন
ভুল রমণীর সঙ্গে যামিনী যাপন
...কোমল ইন্দ্রিয় ভেবে দুই ওষ্ঠে ছুঁয়েছি পাথর[১]

কুচস্পর্শের অনুভূতি পাথরস্পর্শের মত হোক, এটা কেউ চায়না---তবে এই পাথরই পরম আকাঙ্ক্ষার হ'তে পারে যদি তা হয় পরশপাথর—

কাঙ্গালে পাইল যেন পরশপাথর।
(মালে মুহম্মদ)

সঙ্গমবিরহীর কাছে কুচলাভের আনন্দ, এখানে কাঙালের পরশপাথর লাভের আনন্দের সঙ্গে তুলিত হয়েছে। কবির বক্তব্য, পরশপাথরস্পর্শে সব যেমন স্বর্ণময় হয়—কুচস্পর্শে রমণবঞ্চিত পুরুষের সর্বাঙ্গও তেমন পুলক-পরিপূরিত হয়।

সুনীল শিলার আশ্চর্য রঙ যখন কবিকে বিস্ময়মুগ্ধ করে, তখন কুচ-দ্বয়কে কবি নীলবর্ণ শিলা নাম দেন। এই উপমানে স্পর্শানন্দ নয় বরং বর্ণদর্শনানন্দই প্রবল—

যে হও সে হও তুমি
যার হও, যে কোনো গোত্রের হও,
আর্য হও, অনার্যা রমণী হও...
সেও তুমি শরীরে ধারণ করো সেই একই নীলবর্ণ শিলা[২]
(মহাদেব সাহা)

১. 'ভুল সঙ্গ ভুল সহবাস' ২. 'নারী' [মানব এসেছি কাছে]

উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি কুচপবর্তে আছড়ে পড়তে দেখে কেউ কেউ তাকে নির্ঝর কল্পনা করেন। এভাবে সৃষ্ট হ'য়েছে কুচের নির্ঝর উপমান-"সুন্দরীর নয়নজল যেন পীন পয়োধরে নির্ঝর রচনা করিল।"[১] (বিদ্যাপতি)

রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও নির্ঝর উপমানটিকে লক্ষ্য করা গেছে। রমণী যখন নিজেকে 'পরম সুন্দর' ব'লে উপলব্ধি করছে, তখন তার নিজের চোখেই নিজের নয়ন দুটি 'শিশিরিত পুষ্প,' হাসিটি 'নিরুপম' এবং বক্ষ উচ্ছ্বিত 'অমৃত-নির্ঝর'—

তাই মনে হয় আমি আজি পরম সুন্দর
আমি অমৃত নির্ঝর।
সুখসিক্ত নেত্র মম
শিশিরিত পুষ্পসম
ওষ্ঠে হাসি নিরুপম
মাধুরী মন্থর।
মোর পুলকিত হিয়া
সর্বদেহে বিলসিয়া
বক্ষে উঠে বিকশিয়া
পরম সুন্দর
নব অমৃত নির্ঝর।[২]

কেউ কেউ পছন্দ করেন স্তনের নদী উপমানটিকে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় দেখি উত্তপ্ত উৎসুক পরুষ-স্পর্শে রমণীর কুচদ্বয় হ'য়ে যায় কূল-ছাপিয়ে-ওঠা খরস্রোতা নদী—যার তীব্র আবর্তে ডুবে যায় এই দুরন্ত পৃথিবী—

....তোমার বুকের উপর উত্তপ্ত, উৎসুক
আমার হাতের স্পর্শ; কূল ছাপিয়ে ওঠে তোমার দুই বুক
আমার হাতের স্পর্শে, যেন কোনো অন্ধ অদৃশ্য নদীর
খরস্রোত; তার মধ্যে এই সমস্ত দুরন্ত পৃথিবীর
চিহ্ন মুছে যায়; শুধু এই বিশাল অন্ধকার নদীর

১. ৫৪১
২. 'উৎসব' [চিত্রা]

তীব্র আবর্ত, যেখানে আমরা জয়ী, আমরা এক, আমি
আর তুমি—কী মধুর, কী অপরূপ-মধুর এই কথা—
তুমি—তুমি আর আমি।[১]

নদী উপমানটি ব্যবহৃত হয়েছে সৈয়দ আলী আহসানের কবিতাতেও—

মাতৃদুগ্ধের মতো স্রোতস্বিনী
অজস্র শবের আর্ত দৃষ্টি নিয়ে প্রবাহিত[২]

বৃষ্টিরিক্ত নদীটি কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চোখে রুগ্ন জননীর স্তনের মত—

কালো মেঘের ফিটন চ'ড়ে
কালিঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এলো।

সেখানে যত ছন্নছাড়া গলিরা ভিড় ক'রে
খিদের জ্বালায় হুগলি গঙ্গাকেই
রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধ'রে বেঁহুশ পড়ে আছে।

যুগ্ম কুচের মহিমা কোনো কবির চোখে শঙ্খ-শুভ্রতায় ঝলমলে অনিন্দ্য উপত্যকার রূপের মত—

অর্ধ-বিকশিত তোমার পরিপূর্ণ ভরা বুকের দীপ্ত মোহন
উদাত্ত উদার অনিন্দ্য উপত্যকা
নিবিড় এক শঙ্খ-শুভ্রতায় ঝলমল ক'রে উঠছে।[৩]
(নচিকেতা ভরদ্বাজ)

উপত্যকা উপমানটিকে ব্যবহার করেছেন মঞ্জুভাষ মিত্রও। 'দর্শনার শরীর ১৯' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

...... জলের সাবলীল রেখাগুলি দর্শনার বিশুদ্ধ মরালগ্রীবা স্পর্শ
ক'রে অতঃপর
বক্ষের মধুর উপত্যকায় ধীরে ধীরে নামছে।[৪]

---

১. 'এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে' [নতুন পাতা]
২. 'আমার প্রতিদিনের শব্দ' [আমার প্রতিদিনের শব্দ]
৩. 'অন্য রূপকল্পে উপাসনা' [কালের কবিতা]
৪. 'দর্শনার শরীর ১৯' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]

কায়কোবাদ একস্থলে স্তনকে খনিরূপে কল্পনা করেছেন---

তব অই বক্ষস্থল, লাবণ্যেতে ঢলঢল
অতৃপ্তি-মদিরা ভরা
অমৃতের খনি।[১]

পার্বত্য-অঞ্চল পরিভ্রমণে ক্ষান্ত দিয়ে এবার যাওয়া যাক ফলের রাজ্যে। মধ্যযুগের সাহিত্যে শ্রীফলের সঙ্গে কুচতুলনা এত বেশী পরিলক্ষিত হয়, যা দেখে প্রতীয়মান হয় সে যুগের কবিরা সত্যিই শ্রীফলের শ্রীমুগ্ধ—

শ্রীফল যুগল তোহোর তনে
এহার দান তের লক্ষ ধনে।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

শ্রীফলের সত্যিই সৌভাগ্য যে, তের লক্ষ টাকা পর্যন্ত তার দাম উঠেছে। মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডল থেকে স্বল্পায়াসে শ্রীফলের উপমা আরও বহু সংগ্রহ করা যেতে পারে—

১. শ্রীফল যুগল জিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে। (চণ্ডীদাস)

২. বেল তালযুগ হেম কলসগিরি
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা। (বিদ্যাপতি)

৩. জানহুঁ দুবৌ সিরীফল জোরা।। (জায়সী)

৪. কুচ শ্রীফল, জাঙ্গ কদলী লক্ষণ। (আলাওল)

৫. মন্মথ-মথিত যে সম্পূর্ণ শ্রীফল। (দৌলৎ কাজী)

৬. কুচযুগ মনোরম নবীন শ্রীফল সম---(দৌলত উজীর বাহরাম খান)

৭. কুচ শ্রীফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি। (সুলতান নসির সাহা)

৮. অবিরল শ্রীফল যুগল যেন দুটি। (মানিকরাম গাঙ্গুলি)

শ্রীফল শিবের প্রিয় ফল ব'লেও এর একটা আলাদা মূল্য আছে। কবিরা প্রায়ই শ্রীফল দিয়ে শিবপূজার কথা বলেছেন। ১৭১ নম্বর পদে বিদ্যাপতির

১. 'পাষাণময়ী' [অশ্রুমালা]

রাধা "কররূপ কমল এবং কুচরূপ শ্রীফল" দিয়ে শিবপূজা করেছেন। দেবতা এবং দেবতার পূজাদ্রব্য—উভয়কেই নায়িকা-বক্ষে দর্শন ক'রে মধ্যযুগের কবিরা পুলকিত।

হ'তে পারে শ্রীফলদুটি বৃক্ষের তাজা সবুজাভ ফল--অথবা অপরূপভাবে কুঁদে তৈরী তার অনুকৃতি---

১. এক গাছে গোবীচান্দ দুই শ্রীফল ধরে। (সুকুর মামুদ)

২. কুন্দন বেল সাজি জনু কুঁদৈ। (জায়সী)

অনুকৃতিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় স্বর্ণ-অনুকৃতি--"কনক শ্রীফল দুই কিবা একডালে" (দোনা গাজী)

প্রিয় এই শ্রীফলের রূপ কবিকুল বিভিন্ন ভাবে অবলোকন করেছেন, যেমন--স্নানরতা সুন্দরীর জলসিক্ত স্তন দেখে কবির মনে হয়েছে স্বর্ণবিল্বে হিম শিশির পড়েছে---সজল চীর পয়োধর সীমা।

কনক বেল জনি পড়ি গেও হীমা।। (বিদ্যাপতি)

কখনো বা কুচগাত্রে নখলেখা দেখে কবির মনে হয়েছে---কাঁচা শ্রীফলগাত্রে কিংশুক ফুলের কুঁড়ি এসে পড়েছে---"সে কাঁচা শ্রীফলে নখমুর্তি দিল, যেন কিংশুক ফুলের কুঁড়ি হইল।"[১] (বিদ্যাপতি)

এই শ্রীফল কিন্তু নীরব নয়—মাঝে মাঝে কাঁচুলি-বন্ধন ছিঁড়ে উল্লাস ক'রে উঠে এরা কান্তের হৃদয়কে বিদ্ধ করতে চায়--

কুচ কঞ্চুকী সিরীফল উভৈ।
হুলসহিঁ চহহিঁ কন্ত হিয় চুভৈ।। (জায়সী)

বক্ষপ্রদেশে সুন্দরভাবে উদ্‌গত এই স্বর্ণশ্রীফল যে দেখে, সেই পঞ্চবাণ-বিদ্ধ হয় —

কনক শ্রীফল যেন কুচ বক্ষোপর।
যেই হেরে সেই মরে খেয়ে পঞ্চশর।।
(নওয়াব ফয়জুন্নিসা)

---

১. ৭৭

এই শ্রীফল পেট ভরায়না, শুধু পুরুষকুলকে ব্যাকুল ক'রে মায়াজালে বন্দী করে–

একগাছে গোবীচান্দ দুই শ্রীফল ধরে।
তাহারে দেখিয়া তোমার প্রাণ ব্যাকুল করে।।

এহি ফল খাইলে বাপু পেট নাহি ভরে।
মাঞা জালে বন্দী হৈয়া সব পড়ি মরে।।
(সুকুর মামুদ)

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ তো বটেই—স্বয়ং রাজা পর্যন্ত এই ফল-ভক্ষণে সমান উৎসুক—'দারিউ দাখ বেল রস চাখা।' (জায়সী)। রাজা রত্নসেন ফুলের চেয়েও কোমল নববধূ পদ্মাবতীকে অঙ্কে ধারণপূর্বক তার দাড়িম্ব (গণ্ডদেশ), দ্রাক্ষা (অধর) এবং বেল (স্তন) রস পান করলেন। ডালিম, আঙুর এবং বেলের মিশ্রিত রসে বে অপূর্ব বস্তু হ'লো তার স্বাদ রাজাই বুঝতে পারেন—কেননা তাঁর আছে পদ্মিনী নারী—পদ্মিনীর দেহগন্ধ অবগত আছেন ব'লেই সম্ভোগান্তে যে চুয়া, চন্দন, মৃগমদগন্ধ অবশিষ্ট থাকে সে সব সুগন্ধের তাৎপর্য তিনি জানেন—

রহী বসাই বাসনা চোবা চন্দন মেদ।
জেহি অস পদমিনি রানী সো জানৈ য়হ ভেদ।।
(জায়সী)

বিল্বফলের কাঠিন্য, বর্তুলতা এবং যৌবলাবণ্য—সুদৃঢ়, পূর্ণপুষ্ট, শ্রীময় কুচের জন্য উপযোগী উপমা, যদিও উপমাটি বহুব্যবহৃত—

বিল্বফলের মতো স্তন
বাহু দুটি সুপক্ক শশা,
গুরুভার প্রশস্ত জঘন
ঘিরে আছে নিরত তমসা।[১]
(ওমর আলী)

একটি দ্বৈত লোকগীতিতেও উপমানটিকে পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে সাঁওতাল রমণীর কুচদ্বয়কে বলা হয়েছে 'বিল্বফলের বিস্ময়'—

১. 'সুসজ্জিত'

যুবক—তোমার শরীরটা যেন পাকা আমের মতো রসালো,
তোমার স্তন দু'টি যেন সুডোল বেলফলের বিস্ময়;
কার জন্য তোমার ওই রূপময় দেহ
কার জন্যে তোমার ওই স্তন জোড়া!

যুবতী—হে প্রিয়তম আমার সম্পর্কে কিছু বলোনা
হে প্রিয়তম আমার দেহ নিয়ে আক্ষেপ করোনা।
আমার এই কোমল শরীর, আমার এই সুডোল স্তন
এসব কেবল তোমারই জন্য।
আমার এই স্তনাচ্ছাদন, এই পাতলা কাপড় আর কে
ব্যবহার করবে!

যুবক—হে প্রেয়সী, এমন কথা তুমি বলোনা!
হে প্রেয়সী, এমন ক'রে তুমি আক্ষেপ করোনা!
তোমার ওই স্তনাচ্ছাদন, তোমার ওই পাতলা কাপড়
আমরা দু'জনে ব্যবহার করবো!

(অনুবাদ: আবদুস সাত্তার)

এবার ফলবিষয়ক অন্যান্য উপমাগুলো এক এক ক'রে চয়ন করা যাক। সীতার তপ্ত কাঞ্চনের মত গাত্রবর্ণ সত্ত্বেও তাঁর কুচদ্বয়কে কনকবর্ণ নয় বরং স্নিগ্ধ সবুজ তালফলের মতই ভাবতে ভালো লাগে বাল্মীকির—

এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ সম্প্রগল্‌ভিতৌ।।
পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ।
মনিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তৌ পয়োধরৌ।।

("তোমার ঐ উচ্চ বর্তুলদৃঢ় ও লোভজনক স্তনযুগল উত্তম মনিময় আভরণে ভূষিত। তাদের মুখ পীনোন্নত, গঠন স্নিগ্ধ তালফলের তুল্য সুন্দর।") এই উপমাটির অনুস্থতি লক্ষ্য করা যাবে জয়দেবে, বড়ু চণ্ডীদাসে, বিদ্যাপতিতে, আলাওলে—

তালফলাদপি গুরুমতিসরসম।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্।।

(জয়দেব)

তালফল জিনিআঁ তোম্মার পয়োভার।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

বেল তালযুগ হেম কলস গিরি
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।
(বিদ্যাপতি)

কুচ দরশনে অঙ্গ না দেখিনু ভাল।
উলটা সংযোগে পুনি হয় লতা তাল।।
(আলাওল)

প্রাচীন এক ইংরেজ কবিও নারীকে তালবৃক্ষের সঙ্গে এবং তার কুচ-দ্বয়কে তালের সঙ্গে তুলিত করেন—"তোমার দীর্ঘতা তালবৃক্ষের ন্যায় ও তোমার স্তন তাহার ফল স্বরূপ। আমি কহিলাম, আমি তালবৃক্ষে আরোহণ করিব এবং তাহার বাগুড়া ধরিব;"[১]

বিদ্যাপতির কিশোরী রাধিকার স্তনদ্বয় মৌসুমের প্রথম কুলের মত ক্ষুদ্র কিন্তু দৃঢ়---নবযৌবনসমাগমে তা-ই বিবর্তিত হ'তে হ'তে কমলাকৃতি লাভ করেছে---

হসইত অপন পয়োধর হেরি।
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।।

কুলকে বিদ্যাপতি আরো দু'একবার স্মরণে এনেছেন---

১. নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরী কি বেলি।

২. কুচ কোরী ফর নখ খত রেহ।

নখশোভিত স্তনকে নখাঙ্কিত বদরীফল ভেবে বিদ্যাপতি কি খুশী। মধ্য-যুগের আর কোনো কবিকে এই ফলটির সমাদর করতে দেখা যায়না। কমলা, বাতাবি, কুল, বেল, তাল---কোন্ ফলটি যে স্তনের যোগ্য উপমান, সে বিষয়ে বিদ্যাপতি যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। বয়ঃসন্ধির এই সফল রূপকার স্তন সম্পর্কে গবেষণাপ্রবণ ব'লে ফলবিষয়ক দুটি অপ্রচলিত উপমানকে গ্রহণ

---

১. প্রাচীন কবি রচিত বাইবেলের অনুবাদ/রঙ্গলাল লিখিত প্রবন্ধের অন্তর্গত

করেছেন---সেগুলো হচ্ছে কুল ও বাতাবি। অন্যান্য কবিরা যখন দাড়িম্ব এবং নবরঙ্গ ছাড়া অন্য ফলের কথা ভাবতে পারছেন না, বিদ্যাপতি তখন দিব্যি টককুল এবং বাতাবি লেবুকে ভাবতে পারছেন---

নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরি কি বেলী।
কামে পসাহলি আচার ফেলী।।

দ্বাদশবর্ষীয়ার পয়োধর তাঁর কাছে 'কোরী'র মত এবং ষোড়শীর পয়োধর 'ছোলঙ্গী'র মত। এই ছোলঙ্গ পরবর্তীকালে আলাওলের হাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। আলাওলের ধারণা সুন্দরী রমণীর কুচের অপরূপতা দর্শনে লজ্জিত হ'য়েই জামির ও বাতাবি অম্লযুক্ত এবং পিঙ্গলবর্ণ হয়েছে—

জামির ছোলঙ্গ পুনি অম্বলরস হৈয়া
ডালেতে পিঙ্গল হয় অতি লজ্জা পাইয়া।

জামির বাতাবিলেবুর চেয়ে ছোট একজাতীয় ফল। পদ্মাবতীর কৈশোর বর্ণনাকালে জামির আলাওলের কাছে মনোনয়ন লাভ করেছে। উপমানটি প্রথাপিষ্ট নয়—

হৃদয় হইল কুচ কনক জামির।

জামির ফলটি জায়সীর কাব্যে 'জম্ভীরা' 'জঁভীরা' 'জঁভীর'রূপে আছে---

১. ঔ লঘু কুচ উতঙ্গ জম্ভীরা।
২. হিঅ হুলসই কুচ কনক-জঁভীরা।।
৩. উতঁগ জঁভীর হোই রখবারী।

আমি আবার বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গে ফিরে যাবো। তাঁর সমকালীন অন্যান্য কবি যখন 'দাড়িম্ব' 'দাড়িম্ব' 'নবরঙ্গ' 'নবরঙ্গ' ক'রে পাগল হচ্ছেন, বিদ্যাপতি তখন অবলীলাক্রমে 'কোরী' 'কোরী' 'ছোলঙ্গি' 'ছোলঙ্গি' ক'রে আনন্দ-আকুল হ'য়েছেন। অবশ্য নবরঙ্গের প্রতি বিদ্যাপতির বিরাগ আছে এমন অপবাদ কেউ তাঁকে দিতে পারবে না। নবরঙ্গ রূপময়—আর বিদ্যাপতিও রূপপ্রিয়। তাই এই রূপময় ফলটি তাঁর কবিতায় আছেই---

পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।

সুপুষ্ট পরিণত পয়োধরকে নবরঙ্গ বলাই বিদ্যাপতি সমীচিন মনে করেন।

জায়সী 'পদ্‌মাবৎ' কাব্যের বেশ কয়েক জায়গায় নবরঙ্গের উপমা নিয়ে এসেছেন। কমলাকে তিনি অনাস্বাদিত আস্বাদিত উভয়রূপেই প্রত্যক্ষ করেছেন। পদ্মাবতী যখন কুমারী তখন বলা হয়েছে 'কমলালেবু দুটি কার জন্য রাখা আছে?'---'অস নারঁগ দহু কা কহঁ রাখে।।' আর বিবাহিতা পদ্মাবতীর উপভুক্ত কুচরূপ দর্শনকালে বলা হয়েছে নবরঙ্গ দুটি শুকনখ-চিহ্নিত, ভ্রমরদষ্ট এবং সর্পস্পৃষ্ট---

১. নারঁগ জানি কীর নখ দিএ।

২. বৈঠ ভেঁৌর কুচ নারঁগ বারী।
লাগে নখ উছঁরী রঙ্গধারী।।

৩. অলক সুরঙ্গিনি হিরদয় পরী।
নারঁগ ছুব্‌ নাগিনি বিষভরী।।

প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে কবি নখরঞ্জিত কুচরূপ দেখেছেন। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে সারারাত্রি জাগরণের পর নিদ্রামগ্না পদ্মাবতীর ভুক্তকুচের ওপর শিথিল অলক এসে পড়েছে—দেখে মনে হচ্ছে যেন বিষাক্ত নাগিনী নারাঙ্গ ছুঁয়ে আছে।

আলাওল কল্পনা করেন পদ্মাবতীর কুচরূপ দেখেই যেন কমলা 'সুরঙ্গি' হ'য়ে 'নারঙ্গি' নাম ধারণ করেছে---

দেখিয়া সুন্দর অতি কুচযুগ ভঙ্গি।
সুরঙ্গি হইয়া নাম ধরিল নারঙ্গি।।

লায়লীর কুচদ্বয় দৌলত উজীর বাহরাম খানের চোখেও নবীন নারঙ্গেরই মত নিটোল---

কুচযুগ মনোরম নবীন শ্রীফল সম
কিবা নব নারাঙ্গ যুগল।

কবি শেখ চান্দও নায়িকা আমিনার বক্ষে দুটি কমলা শোভমান দেখেছেন---লক্ষ্য করেছেন তার চমৎকার সুবাস—

বক্ষমূলে নবরঙ্গ দেখিতে শোভিত।
যার গন্ধে দশ দিক করে আমোদিত।।

ডালিম আর একটি সুরঙিন ফল। ডালিমের লালিমা দেখে অবাক-তকিয়ে-থাকা কয়েকজন কবিকে আমরা এখন একত্রিত করি—

১. ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে।
   তাহাত মজিল মন আহ্মারে।। (বড়ু চণ্ডীদাস)
২. দারিউঁ দাখ ফরে অনচাখে। (জায়সী)
৩. এক ডালে ডালিম যুগল শোভাকার। (দোনা গাজী)

রায়শেখরের ধারনা কুচের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাবার ভয়ে দাড়িম্ব শ্রীফল ইত্যাদি আকাশে বাস করে—

দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু।

কিন্তু দূরে থেকেও ডালিমের অক্ষত থাকা হলোনা। বড়ু চণ্ডীদাস বলছেন রাধার স্তন ডালিম-সদৃশ নয়, বরং ডালিমের চেয়েও শোভন। রাধার মনোহর কুচদর্শনে সুপক্ক ডালিম তাই ফেটে চৌচির হয় এই অভিমানে, যে সে কেন অত সুন্দর হলোনা—

কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে।
আভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে।।

একই কথা আলাওলেরও। পদ্মাবতীর কুচভঙ্গি দেখে ডালিম যেন নিজের হীনতার লজ্জায় ফেটে চৌচির হ'য়ে গিয়েছে—

ডালিম্ব দেখিয়া কুচ অতি সুরুচি।
লজ্জায় বিদার হয় আপনা শরীর।।

ডালিমের চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া সম্পর্কে সামসুদ্দিন সিদ্দিকীরও একই মত—

ডুবিল কমল কলি কুচ দরশনে।
কদম্ব দাড়িম্ব ফাটে দেখিলে মদনে।।

দ্বিমত নেই কৃষ্ণরামেরও—

দাড়িম্ব বিদরে যেন শোভা না ধরিয়া।

ঈশ্বরগুপ্তের ধারণা সুন্দরীর পয়োধরশোভা অঙ্গে ধারণ করার অপরাধেই শীতে ডালিম শাস্তি লাভ ক'রে থাকে ভয়ে তাকে শিউরে থাকতে হয় এবং এই পাপের কারণেই তাকে বুক ফেটে মরতে হয়—

ডালিম হরিল তব পয়োধর ভাব।
সেই হেতু শীতে তার বিপরীত লাভ।।

ভয়েতে শিহরে সদা কাঁটা কলেবরে।
আপনি আপন পাপে বুক ফেটে মরে।।[১]

ডালিমের ফেটে চৌচির হওয়া সম্পর্কে ঈশ্বরগুপ্ত আরও কারণ অন্বেষণ করেন। তার মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে বিধাতার অবিচারে ডালিমের মনে অভিমানবোধ। বিধাতা পয়োধরের স্থান নির্দিষ্ট করলেন রমণীবক্ষে আর ডালিমের বাসস্থান নির্দেশ করলেন কিনা কাঁটাময় বৃক্ষে! ডালিমের পক্ষে ভিমানে ফেটে তছনছ হ'য়ে যাওয়া তাই খুবই সঙ্গত---

বিধাতার অবিচার দেখি সমুদয়।
যুবতীর হৃদয়েতে পয়োধর রয়।
দালিমের বাসস্থান বৃক্ষ কাঁটাময়।।
মানিনী রূপসী রামা আপনার দুখে।
অভিমানে ফেটে তাই থাকে অধোমুখে।।[২]

কিংবা ফাটবার আরও এক অভিপ্রায় আছে বোধ হয়। শিশুদের যেন ইঙ্গিতে ডেকে বলছে প্রসূতির স্তনের চেয়েও সে সুধাসিঞ্চিত---একবিন্দু রসে এত সুধা যেন জননীর স্তনেও নেই---

ফাটিবার আর এক আছে অভিপ্রায়।
ইঙ্গিতে বালকগণে করে আয় আয়।।
আমার নিকটে আয় ওরে শিশুগণ।
মিছে কেন পান কর প্রসূতির স্তন?
চুষিলে আমার বীচি বুড়া থাকে বশে।
কোথা ইন্দু সুধাসিন্ধু এক বিন্দু রসে।।
আমার মধুর রস একবার খেলে।
আর তোরা হবিনেক জননীর ছেলে।।[৩]

ডালিমের ভেঙে খান খান হবার অনেক কারণ আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো সে যাই হোক, লালিমাময় ডালিমের গঠনটা যে বড় মারাত্মক, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। ডাঁসা, পাকা, বিচুর্ণ সব অবস্থাতেই সে স্তনেরই

---

১. 'শীতকালের প্রভাতে'
২-৩. 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য'

মত উত্তেজক। অরণ্য যখন বধূ এবং স্মরশরজর্জরিত---তখন মত্ততাবর্ধক ডালিমই হ'তে পারে তার বক্ষাঙ্গ। মদনপীড়িত বনবধূ কামনার হরষণে কেমন ক'রে ডাঁশিয়ে তুলছে কুচ-ডালিম, নজরুল তার চমৎকার ছবি এঁকেছেন---

দেয় করতালি তালিবন
গাহে বায়ু শন্ শন্
বনবধূ উচাটন
মদনপীড়ায়
তার কামনার হরষণে ডালিম ডাঁশায়।[১]

স্পষ্ট কল্পনা করা যায়, কামনার হরষণ যখন উচ্চগ্রাম স্পর্শ করবে তখন ডালিম ডাঁশতে ডাঁশতে হ'য়ে যাবে সুমোহন বিচূর্ণতা। ডালিম উপমানটি পুরাতনকালের মত অতি-আধুনিক কালেও সমান সুপ্রিয়---

১. রাঙা ডালিমের মতো বুকে তোমার ঢেলে দিয়েছি স্বপ্ন।[২]
(মনীন্দ্র রায়)

২. নখের আঁচড় কাটতে দিলে ডালিম বনে[৩]
(পূর্ণেন্দু পত্রী)

মুহম্মদ দানেশের কাব্যে বেদানাকে স্তনের উপমান হিসেবে দেখা যায়---
বেলুনের মত বাজু ছাতিতে আনার।

ফলের মধ্যে আর একটি সুদৃশ্য উপমান---রস-টসটসে ঈষৎ লালাভ আপেল। স্বাস্থ্যোচ্ছল ভুটিয়া যুবতীর কুচদ্বয় যতীন্দ্রমোহন বাগচীর চোখে আপেলের মতই পরিপূর্ণ এবং রসনিটোল---

টসটসে রসে ভরপুর---
আপেলের মত মুখ আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর;
যৌবনের রসে ভরপুর।[৪]

---

১. 'মাধবী প্রলাপ' [সিন্ধু হিন্দোল]
২. 'ক্রীতদাস' [কালের কবিতা]
৩. 'অনেককেই তো অনেক দিলে' [পূর্ণেন্দু পত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৪. 'যৌবন চাঞ্চল্য'

অতি-আধুনিক কবির কবিতায়ও আপেল উপমানটি আছে—

১. ওই দুটি বিস্মিত আপেল কোনো চিত্রশিল্পীকে দিয়ো[১]
(কৃষ্ণ ধর)

২. সোনার আপেল দুটি কতটুকু দোল খায়
বুনো আকাঙ্ক্ষায়।[২]
(দিনেশ দাস)

সুগঠন-সুস্বাদ নাসপাতিকে ব্যবহার করেন বিদেশী কবি ডুম মীরন—
নাসপাতি ঢেকেছ বুকে, রেখেছ মুখ মিঠায় ভরি;[৩]
(অনুবাদঃ সত্যেন দত্ত)

রস-টলমল দ্রাক্ষাগুচ্ছও তার অপরূপতা নিয়ে ধরা দিয়েছে কবিদের দৃষ্টি-সীমায়—

১. আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।[৪]
(রবীন্দ্রনাথ)

২. দেহ তব দ্রাক্ষার প্রান্তর
বক্ষেও দ্রাক্ষার পুঞ্জ—[৫]
(বুদ্ধদেব বসু)

৩. দ্রাক্ষা-বুকে তেমনি তবু জ্বলছে আজও চুনীর হার।[৬]
(ওমর খৈয়াম/অনুবাদঃ কান্তিচন্দ্র ঘোষ)

৪. দারিউঁ দাখ ফরে অনচাখে। (জায়সী)

৫. আমার তন্ময় চোখ, মগ্ন হ'য়ে মধুরের ধ্যানে,
দ্যাখে, তার দ্যুতিময় কটিতট জঠর, জঘন,

১. 'তোমার বসন্ত' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]
২. 'শ্রীমতি' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]
৩. 'উড়ো পাখী'
৪. 'উৎসর্গ' [চিত্রা]
৫. 'কোনো বিদেশিনীর প্রতি' [কঙ্কাবতী]
৬. [রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম]

মরালপঙক্তির মতো কম্পমান, কেলিপরায়ণ;
উদর, স্তনযুগল, দ্রাক্ষাপুঞ্জ আমার উদ্যানে[১],
(বোদলেয়ার / অনুবাদঃ বুদ্ধদেব বসু)

৬. "এখন তোমার স্তন দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছ স্বরূপ।..."

(প্রাচীন কবি রচিত বাইবেলের অনুবাদ / রঙ্গলালের প্রবন্ধ থেকে)

আঙুর শুকিয়ে যখন কিশমিশ হয়েছে, কুচের উপমানরূপে তখনও তাকে আদর দেয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে—

কবেকার লাল ঝরাপাতা
চমৎকার উড়ে আসে খাতার পাতায়,
মিশে যায় যুবতীর ডাগর স্তনের
কিশমিশ[২] (শামসুর রাহমান)

বেদুইনবালার স্তন নজরুলের কাছে খোর্মার মত সুমিষ্ট মনে হয়—

চক্ষে সুর্মা বক্ষে খোর্মা
বেদুইন কিশোরীরা—
বিনা কিম্মতে বিলালো সেদিন
অধর চিনির সিরা।[৩]

সুপক্ক একজোড়া লালাভ ডওফল রসনারসিকদের কাছে বড়ই লোভনীয়। পদ্মাবতী যখন বিবাহ-সজ্জায় সজ্জিত, তখন তার বুকে লোভজনক এক-জোড়া ডওফলই যেন শোভমান দেখছেন কবি—

ডওফল জোড় নয়ান ধিভোর, আঁখি সে সুন্দর
এহি সে পয়োধর রঞ্জিতা।
(আলাওল)

নারিকেল উপমানটিকে দোনাগাজী এনেছেন বিশাল এবং বিকট বোঝানোর জন্য, আর মধুসূদন এনেছেন তার অন্তঃস্থ রসের মর্ম বোঝানোর জন্য। দোনা গাজীর চোখে জঙ্গী রাজকন্যার স্তনদ্বয় বৃহৎ নারকেলের মত—এবং হাঁটার সময় তা করতালের মত শব্দ করে—

১. 'Les Bijoux' ('অলংকার')
২. 'আশি দশকের পদাবলী' [কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি]
৩. 'অবতরণিকা' [মরু ভাস্কর]

স্তন দুই নারিকেল লটকি আছএ।
করতাল শব্দ করে হাঁটিতে সমএ ॥

মধুসূদনের চোখে, নারকেলের রস তৃষাতুরের কাছে মাতৃদুগ্ধতুল্য---

নারিকেল, যার স্তনচয়
মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে।[১]

দ্বিজ ঈশানের চোখে কমলাকে মনে হয় সুমসৃণ সুপুরিগাছ, আর তার কুচযুগ সুপুষ্ট সবুজ থোল থোল সুপুরি যেন—

কাকুনি সুপারিগাছ বায়ে যেন হেলে।
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে ॥[২]

আধুনিককালের কবি পূর্ণেন্দু পত্রীকেও দেখা যাচ্ছে সুপারি উপমানটি নির্বাচন করতে---

দাঁতের ফাঁকে লাল সুপারি ভাঙতে দিলে।[৩]

কামরাঙার অম্লস্বাদের মত কিশোরীর কুচ-স্বাদ জিহ্বায় রসের ক্ষরণ ঘটায় কোন কবির---তাই তিনি বলেন কিশোরীর কামরাঙা-কুচে দন্তস্ফোটনের সুতীব্র সুখের কথা---

কিশোরীর কামরাঙা কেড়ে নিয়ে দাঁত বসিয়েছি
সেই সুখ পশমী চাদরে ছিল, কামরাঙা কিশোরীতে ছিল।[৪]
(আবুল হাসান)

সত্যেন দত্তের 'কিশোরী' কবিতায় করমচা উপমানটিকে পাওয়া যায়। যে কিশোরীর সিঁথায় রাঙা সিঁদুর দেখে রঙন রাঙা হয়, যার কানে জোড়া দুল দেখে ঝুমকো জবা দুল দোলায়, যার সিঁদুর টিপ---খয়ের টিপ দেখে কুঁচের গায়ে রঙ ধরে—নিশ্চয়ই তার করমচার মত তাজা তরুণ কুচরূপ দেখেই করমচাশাখা তার আঁচল টানাটানি করে—

১. [তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য]
২. [মৈমনসিংহ গীতিকা]
৩. 'অনেককেই তো অনেক দিলে' ৪. 'সেই সুখ'

তার সিঁথায় রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল,
তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগল ভুল,
... ...
করমচা ডাল আঁচল ধরে[১]

যৌবনভারনতা বেহুলাকে বিজয়গুপ্তের মনে হয় থোকা থোকা আমের ভারে নুয়ে পড়া ডালের মত---

আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কতকাল।।

রসপূর আমের মত স্তন বলায় রসনাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করা হচ্ছে। সৈয়দ আলী আহসানের চোখেও তাঁর প্রিয়তমা আম্রভারনত শাখার মত। শাখাস্থিত আম্রগুচ্ছকে আদর ক'রে কাছে টানার মতই কুচাবনত প্রিয়াকে আদর ক'রে কাছে টানেন তিনি—

আমি তার কটিতট বেষ্টন ক'রে কাছে নিলাম
যেমন ক'রে সুপক্ক আম্রভার-নত শাখাকে কাছে টানি।[২]

আনারস-রসিক ঈশ্বরগুপ্ত আনারস-বন্দনাকালে তাকে স্তন-সদৃশ দেখেছেন---

তিন লোক জয় করে তব আস্বাদন।
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন।।[৩]

অপরূপ আস্বাদনের জন্য আনারসকে তিনি যেমন স্তনতুল্য দেখেন, তেমনি দেখেন পেয়ারাকেও—তার চমৎকার স্বাদ এবং মনোহর গড়নের জন্য। মাতা---তরুণী, যুবতী বা প্রৌঢ়া, যেমনই হোকনা কেন, বালক যেমন কোন বাছবিচার না ক'রে তার স্তন পছন্দ করে; তেমনই পেয়ারা—কাঁচা, ডাঁসা, পাকা যেমনই হোক না কেন, বালক সবই পছন্দ করে। কিন্তু যুবক যেমন ভালোবাসে যুবতীর পয়োধর-- তেমনি পেয়ারার মধ্যে ভালোবাসে ডাঁসা পেয়ারা, কচি বা পাকা নয়---

১. 'কিশোরী' [ফুলের ফসল]
২. 'বৃষ্টির মধ্যে সে'
৩. 'আনারস'

কেবা জানে ডাঁসা পাকা কেবা জানে কচি।
পেয়ারার গন্ধে হয় অরুচির রুচি।।
বালকেতে যাহা পায় তাহা খায় কেড়ে।
আগে ভাগে হাতে লয় মাতৃস্তন ছেড়ে।।
ডাঁসার আদর অতি যুবকের কাছে।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি বসে থাকে কাছে।।[১]

এখানে দেখা যাচ্ছে পেয়ারা স্তনের চেয়েও লোভনীয়। তাই শিশু মাতৃস্তন ছেড়ে পেয়ারা কেড়ে খায়—আর যুবকের ইচ্ছা হয় দিনরাত ডাঁসা পেয়ারার কাছে ব'সে থাকতে।

'সুচারু শ্যামল' 'সুশোভিত' 'রসময়' আতাকেও বসুমতী মাতার স্তন ব'লে ভাবতে ইচ্ছে হয় ঈশ্বরগুপ্তের---

অনেক যতনে তোরে রসময় আতা।
বিশেষ বিরলে বসি গড়িছেন ধাতা।
সুচারু শ্যামল বর্ণ সুশোভিত পাতা।
মনোহর কলেবর অতি দক্ষদাতা।
হৃদয়ে ধরেছে তোরে বসুমতি মাতা।।

আল মাহমুদের চোখেও স্তন হচ্ছে উষ্ণ এবং সুরভিত আতাফল---

তোমার মাংসের উষ্ণ আতাফল
শোনিতে মেশালো কি মধুর সৌরভ?[২]

এতসব রসালো ফল থাকা সত্ত্বেও বড়ু চণ্ডীদাস বাধ্য হ'য়ে একটি অনাদৃত এবং নিন্দিত ফলের দ্বারস্থ হ'য়েছিলেন। সুরূপ অথচ বিষাক্ত সেই ফলটি হচ্ছে মাকাল। রাধিকার কুচযুগলকে মাকালের সঙ্গে তুলনা দেবার কোন ইচ্ছাই কবির ছিলনা। কিন্তু রাধার যৌবনলুণ্ঠনোদ্যোগী কৃষ্ণকে প্রতিহত করার জন্যই এমনটি করতে হ'য়েছে। মাকাল ভক্ষণে নিশ্চিত মরণ এই ব'লে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করছেন রাধা---

১, 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য'
২, 'শোণিতে সৌরভ'

মাহাকাল ফল আন্ধার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে।।

কুচপ্রসঙ্গে নামহীন ফলের কথাও কবিরা বহুবার বলেছেন। রাধার বিরহ-পীড়িত দেহরূপ থেকে সখীরা কৃষ্ণব্রতের রূপক আবিষ্কার করেছে। অশ্রুসৃষ্ট নদীতে স্নান ক'রে ব্রতচারিণী দেহশুদ্ধি করলো। মৃণাল হ'ল জপমালা, কৃষ্ণনাম হ'ল জপমন্ত্র, হৃদয়---বেদী, মদন--আগুন। চিকুর হল কুশ এবং পয়োধর উৎসর্গ-ফল।

করতি হোমবধ হোএবহ ভাগি।।
চিকুর বরহিরে সমরি করে লেঅই।
ফল উপহার পয়োধর দেওই।।

(বিদ্যাপতি)

রূপ গোস্বামী স্তনকে একস্থলে 'সৎফল' নাম দিয়েছেন। নবযৌবন-ভূপালকে উপহৃত হবে ব'লেই ফল দুটি 'সৎফল' নামে অভিহিত---"দেখ দেখ নব যৌবন-ভূপাল শ্রীরাধার তনুরাজ্য অধিকার করাতে গুণশালী নিতম্ব স্বীয় উন্নতি জানিয়া উল্লাসপূর্বক কিঙ্কিনীবাদ্য করিতে আরম্ভ করিল, বক্ষ যৌবনরাজকে উপহার দিবার নিমিত্ত দুইটি সৎফল সঞ্চয় করিতে লাগিল এবং মধ্যদেশ আপনার ধ্বংস সম্ভাবনার আশংকা করিয়া ত্রিবলীর সাহায্য অবলম্বন করিল---অতএব হে সখে নবযৌবনরাজের কি অদ্ভুত প্রভাব।"[১]

প্রলুব্ধ, অস্থির কবি কুণ্ঠাহীন গমন করেন সেই শরীর-উদ্যানে, যেখানে ঝুলে থাকে রক্তবর্ণ পক্কফল---

যেখানে পেতেছে কাম আপনার স্বর্ণ-সিংহাসন,
রক্তবর্ণ পক্কফল ঝুলে রয় যে কল্প উদ্যানে;---
যেথায় স্ফুরিছে নাসা কটিলগ্ন স্বেদের আঘ্রাণে;
বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন,
আমি সেথা গিয়াছিনু সন্ধ্যাবেলা প্রলুব্ধ অস্থির
আসঙ্গবাসনাপঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক।[২]

(বুদ্ধদেব বসু)

১. [উজ্জ্বল নীলমনি]
২. 'মানুষ'

সুডৌল এবং নিভাঁজ কুচদ্বয় শামসুর রাহমানের চোখে টসটসে ফলের মত—

উঁচু বুক দেখে ভাবি পেশোয়ারি উজ্জ্বল দোকানে
দূর থেকে দেখছি তাজ্জব হ'য়ে টসটসে ফল।

রেশমী বস্ত্রে টানটান জড়ানো ডৌলহীন পয়োধর ডলডলে ডাঁসা মসৃণ ফলের মত দেখালেও তার ওপর কোনো অধিকার নেই ব'লে তার দিকে তাজ্জব হ'য়ে দেখা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বরং যে নারী নন্দিত ফুলের ঝাড় তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ইঙ্গিতময় হ'য়ে ওঠে, বাসনার উত্তাপে সেই নারীর কুচদ্বয়কে আরো আবেগগাঢ় ক'রে দেন কবি---সূর্য যেমন প্রগাঢ় চুম্বনে গাঢ় ক'রে তোলে গ্রীষ্মের ফলকে—

সহসা উঠলো ভেসে গভীর জলের সেই নারী
এবং সহজে তার করতলগত
নন্দিত ফুলের ঝাড় দিলো সে বাড়িয়ে
আমার চোখের নিচে। দুর্লভ মনির মতো স্তন
ঘন হলো বাসনার তাপে, যেমন গ্রীষ্মের ফল
গাঢ় হয় সূর্যের চুম্বনে।[১]

(শামসুর রাহমান)

কখনো কবি সূর্যের গন্ধভরা সোনালি ফলের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ান তরুণীর নবোত্থিত স্বর্ণালী কুচের সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে পেতে চান তার সুনিবিড় সান্নিধ্য—

অষ্ট্রিয়ান বাড়ীর বাগানে
যে তরুণী ফুল তোলে, নোয়ায় কম্পিত ডাল যার
স্তনভারে সূর্যগন্ধী ফলের সোনালি---অন্য মনে
গভীর গোলাপটিকে হাওয়ায় দুলিয়ে জীবনের
মানে বলে বাক্যের অতীত---তারই কাছে সারাবেলা
কেবলি পৌঁছুতে চাই।[২]

(শামসুর রাহমান)

---

১. 'সুন্দরের গাঁথা'
২. 'নিরুদ্দেশ দেওয়াল'

কখনো কবি স্তনকে দেখেন নিটোল ফলের মত, কখনো ফলকেই দেখেন নিটোল স্তনের মত। গাছে যে ফল দোলে, সেগুলো যেন সন্তানের জন্য উৎসর্গীকৃত পৃথিবীর দোলায়মান অজস্র স্তন—

এই সেই পৃথিবী অপার মাটি যার এতোকাল
সুপুষ্ট স্তনের মতো ফল আর ফাল্গুনের ফুল
করেছে উৎসর্গ নিত্য সন্তানের শ্রম প্রজ্ঞা প্রেমে
পূর্ণ হ'য়ে দীর্ণ হ'য়ে?[১]

(শামসুর রাহমান)

ফল যেমন বাসনাঘন তেমনি কখনো আবার মমতামধুর---রুগ্ন শিশুর মাথায় জননী যখন পানি ঢালছিলেন তখন তাঁর স্তন দুটি মমতাগাঢ় ফলের আবেগে ঝুলে ছিল---

আমার স্ত্রী শিশুটির
মাথায় পানির ধারা দিচ্ছিলেন। তাঁর চোখ ছিল পলকহীন, পাথর।
স্তন দুটি দুধের ভারে ফলের আবেগে ঝুলে আছে।[২]

(আল মাহমুদ)

এবার তরকারীর রাজ্যে প্রবেশ করা যাক। লাউয়ের গঠনের সঙ্গে অর্পগত-যৌবনার পয়োধর-সাদৃশ্য খুঁজে পান বড়ু চন্ডীদাস। তাঁর কৃষ্ণ সতর্ক করেছে যৌবনগর্বী রাধাকে—

হেনস যৌবন রাধা সব আলপাউ।
যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হবে লাউ॥

লাউয়ের গঠনকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা ক'রে ঈশ্বরগুপ্ত বলেন—

প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরন।
বোঁটা সরু মোটা মুখ বিমল বরণ॥[৩]

গোড়ার দিক সরু এবং নীচের দিক স্থূল হ'য়ে ঝুলে পড়া লাউ নিঃসন্দেহে প্রাচীনার পয়োধরকে এক মুহূর্তে স্পষ্ট ক'রে তুলেছে।

---

১. [প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে]
২. 'অন্তরভেদী অবলোকন'
৩. 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য'

কবি সানাউল হকের চোখে পয়োধর বেগুনের দোলমার মত—

আমার বুকের কালোপাখী, যার স্তন যুগল কমলানেবু,
বেগুন দোলমার চেয়ে সুস্বাদু,[১]

বড়ু চণ্ডীদাস একস্থলে ব্যবহার করেছেন অম্বল উপমান। বিরহজ্বরে আক্রান্ত কৃষ্ণের কাছে রাধার কুচদ্বয় অম্বলের মতই রুচিকর। রাধা আপন পয়োধরকে 'চাঁপাকুটী'র মত গন্ধহীন ব'লে উল্লেখ করলে (চাঁপাকুটী দেখিতে রূপসে/তাত নাহি গন্ধের পরশে ।।), কৃষ্ণের প্রত্যুত্তর—

বিরহে পুড়িআঁ কাহ্নু হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআঁ যেহ্নু রুচক অম্বল।।

ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের নিকট হরিণের মাংস যেমন লোভজাগানো, রমণ-বুভুক্ষু মানুষের কাছে কুচও তেমন—

শরম ত্যাগিয়া ধরে বুকে বুকে কসি।।
... ...
বাঘেতে পাইল যেন গোস্ত হরিণের।
(মালে মুহম্মদ)

সারাদিন উপবাসী থাকার পর সন্ধ্যায় এফতার রোজাদারের কাছে যেমন পরমবাঞ্ছিত—সঙ্গমসুখবঞ্চিতের কাছে কুচদ্বয়ও তেমন—

জড়াজড়ি ধেঁসাঘেঁসি ছিড়িল কাঞ্চলি।
... ...
সারাদিন ভুকা যেন থাকে রোজাদার।
শামে পাইল গোস্তরুটি করিতে এপ্তার ।।
(মালে মুহম্মদ)

র‍্যাবো চুল্লির লাল ঘুলঘুলিতে স্তনের উষ্ণতা ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যদিও উপমানকে স্পষ্ট ক'রে বলেননি, তবুও বুঝে নিতে হবে যে চুল্লির ভেতর তৈরী হ'তে থাকা উষ্ণ, নরম, টাটকা রুটিগুলোই হচ্ছে স্তনের উপমান। শীতের রাতে কনকনে হাওয়ায় পাঁচটি দরিদ্র ক্ষুধার্ত লোভাতুর শিশু তাকিয়ে ছিল হোটেলের সেই চুল্লির ফোঁকরে তৈরী হ'তে থাকা রুটিগুলোর দিকে—যেগুলো মায়ের স্তনের মত আশ্বাস আনে, ক্ষুধা মেটায়—

১. 'হাইতি মেজাজ: ত্রিতয়' [একটি ইচ্ছা সহস্র পালে]

কুঁকড়ে আছে তারা, একটু নড়েনা,
নিশ্বাস নেয় লাল ঘুলঘুলিতে
স্তনের মতো উষ্ণ।[১]

(অনুবাদঃ বুদ্ধদেব বসু)

শামসুর রাহমানের কবিতাতেও দেখছি ক্রয়ক্ষমতাহীন অথচ ক্ষুধার্ত, লোভাতুর তিনটি বালককে তাকিয়ে থাকতে বাদামি রুটির দিকে—যে রুটিকে তাদের মনে হয়েছে মায়ের স্তনের মত—নরম অথচ উষ্ণ এবং প্রয়োজনীয়—

তিন জোড়া চোখ
বাদামি রুটির দীপ্তি নিলো মেখে গোপন ঈর্ষায়।
রুটিকে মায়ের স্তন ভেবে তারা, তিনটি বালক
তৃষিত আত্মাকে সঁপে সংযত লোভের দোলনায়,
অধিক ঘনিষ্ঠ হ'লো তন্দুরের তাপের আশায়।[২]

একজন অতি-তরুণ-কবি স্তনকে সুস্বাদু বিস্কুট মনে করেছেন—

ঐ স্তন
খুলে দাও। ওরা হোক সুস্বাদু বিস্কুট
আমার তালুতে।[৩]

(অরুণাভ সরকার)

জায়সী কুচদ্বয়কে দেখেছেন হৃদয়ের পাত্রে রক্ষিত কাঞ্চন-নাড়ুর মত। তাঁর 'পদ্মাবৎ' কাব্যে দেখা যায়, সখীদের কাছে বাসরবর্ণনাকালে পদ্মাবতী জানিয়েছেন প্রিয়তমকে কাঞ্চন-নাড়ুর মত কুচদ্বয় আগমন-ভেট দেবার কথা—

হিয়া থার কুচ কঞ্চন লাড়ু।
আগমন ভেঁট দীহ্ন কৈ চাঁড়ু।।

কুচদ্বয়কে লবণ কল্পনা করার মধ্যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা না থাক—প্রয়োজনীয়তা আছে হয়তো। কোনো কবি তাই স্তনকে লবণ ভেবেও তৃপ্তি পান—

---

১. 'উদ্‌ভ্রান্তেরা' [কালিদাসের মেঘদূত (ভূমিকা)]
২. 'তিনটি বালক'
৩. 'একটি প্রস্তাব, তার অনুষঙ্গ'

যে রুটিতে ঝরেনা ঝর্ণার মতো, মেশেনা তোমার
স্তনের লবণ, আমি তাকে কোথাও দেখিনা
খুঁজি না কখনো।[১] (শহীদ কাদরী)

পানি, দুধ, মধু ইত্যাদি জলীয় উপকরণের সঙ্গেও কুচের তুলনা দিয়েছেন কবিকুল। ভ্রমরের মধুপান এবং তৃষিতের পানিপানক্রিয়ার সঙ্গে কবিকুল কুচচুম্বনসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন—

ধরিল বানুর কুচে প্রেমরঙ্গ রসে।
শাহাজাদী রসমুখী মুচকিয়া হাসে।।
. . . .
ভোমরায় মধুপান করে মন রসে।
পিয়াসী পাইল পানি অনেক দিবসে।।
(মালে মুহম্মদ)

রক্ত মনুষ্যের নিকট সুপেয় না হ'লেও ব্যাঘ্র, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র জন্তু এবং জোঁকের কাছে বড়ই প্রিয়--বিশেষতঃ সে রক্ত যদি হয় মনুষ্যরক্ত। নারীসঙ্গরহিত পুরুষের কাছে পয়োধর তেমনই লোভনীয়, যেমন উপবাসী জোঁকের কাছে মনুষ্যরক্ত—

ধরিল বানুর কুচে প্রেমরঙ্গ রসে।
. . . .
জোঁকেতে পাইল যেন রক্ত মনুষ্যের।।
(মালে মুহম্মদ)

এতক্ষন আমরা দেখলাম নানারকম খাদ্যদ্রব্যকে কবিকুল কুচের উপমান-রূপে কিভাবে ব্যবহার করেছেন।

কলস, ঘট, ঘড়ার সঙ্গেও স্তন বহুবার তুলিত হয়েছে। মনিমঞ্জরী-শোভিত রাধার কুচকুম্ভ স্পর্শের জন্য জয়দেবের কৃষ্ণ কাতরতা প্রকাশ করছেন—

স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মনিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।

১. 'একবার শানানো ছুরির মতো'

বড়ু চণ্ডীদাসের কামার্ত কৃষ্ণ তো রাধার দুই কুচকুম্ভ গলায় বেঁধে রাধার লাবণ্যগঙ্গায় ডুবেই যেতে চাইছেন—

তোর দুই কুচকুম্ভ বান্ধি নিজগলে।
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্যগঙ্গাজলে॥

কুচঘট অবলম্বন ক'রে রাধার হৃদয়-যমুনায় কৃষ্ণের ঝাঁপ দেবার বাঞ্ছা, বৈষ্ণব পদাবলীতেও আছে—

মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর মঝু মানস ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার তটিনি কুচ ঘট উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥

বিদ্যাপতির রাধা প্রিয়-অধিষ্ঠানের জন্য নিজের দেহকে বেদীরূপে সজ্জিত করেছে—গলার মুক্তাহার হ'য়েছে আল্‌পনা এবং কুচদ্বয় নিয়েছে মঙ্গলকলসের ভূমিকা—

আল্‌পনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥

স্তনকে বিদ্যাপতি রসের কলস বলেছেন কখনো। জোর ক'রে আঁচল ফেলে দিলে রস ছলকে পড়তে পারে—"জোর করিয়া আমার আঁচল ফিরাইয়া দিবে না বা ফেলিয়া দিওনা রস উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।" ঘনকৃষ্ণবেণী স্বর্ণাভ স্তনে লুটিয়ে পড়েছে দেখে রূপপ্রিয় কবি ভাবছেন কনককলসীর গলায় কালনাগিনী জড়িয়ে আছে—

কলস কুচ লোটাইলী
ঘন সামরি বেণী।
কনয়া পরা সুতলী
জানি কারি নাগিনী॥
(বিদ্যাপতি)

গোবিন্দদাস ভাবেন স্বর্ণকলসে ঘনরস ভরে চুরি ক'রে বুকে রেখেছেন রাধা—চুরি করা জিনিষ বলেই আঁচলে আবৃত রেখেছেন—

কনয়া কলস ঘন রস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই॥

কখনো তাঁর মনে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কে রাধা যেন স্তনকলসে পুরে সীলমোহর ক'রে রেখেছেন—

জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি
মুহরি রাখল কত বেরি।

ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণার স্তনযুগলকে শুধু কলস নয় বরং 'সুধার কলস' ব'লে অভিহিত করেছেন এবং যিনি অন্নপূর্ণা, তাঁর স্তনকে সুধার আধার কল্পনা করা অত্যন্ত সঙ্গত হয়েছে—

কটি অতি ক্ষীনতর নাভি সুধা সরোবর
উচচ কুচ সুধার কলস।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মানবীর স্তনকেও দেবীর স্তনের সমমূল্য দেন। তিনি কোনো এক দেবদাসীর স্তনকেই 'সুধার কলস' আখ্যা দিয়েছেন—

দেহ পঞ্চবটীচ্ছায়ে আবির্ভাব সেই দেবতার
ধরিলে অধরে তাঁর কামনার দ্রাক্ষারসসার।
নিবেদিল 'দেবদাসী' নটবরে সুধার কলস।

পুরুষের প্রতিটি করস্পর্শ যেন এক একটি ফুল। এই ফুলমালায় কুচ-কুম্ভকে সজ্জিত ক'রে দর্শন করাচ্ছেন কৃষ্ণরাম দাস—

সাতকুম্ভ ঘট বেড়ল জৈসন
পরশন (সু) রঙ্গমালা।।

মালিকাসজ্জিত কুম্ভদর্শন হ'লো। এবার পত্রপল্লবসজ্জিত ঘট দর্শন করা যাক। কুচদ্বয় যেন ঘট। রতিমহোৎসবের সময় এই ঘটদ্বয় পুরুষের করপল্লব দ্বারা শোভিত হয়—

রতি মহোৎসবে এ কর পল্লবে
কুচঘট যবে শোভিত হবে।
কেমন করিয়া ধৈরজ ধরিয়া
গুমানে মরিয়া গুমান রবে।।
(ভারতচন্দ্র)

রতিমহোৎসবকালে নখরক্তছটারূপ প্রবাল দিয়েও কুচ হেমঘটকে সজ্জিত করা হয়—

কুচ হেম-ঘটে নখরক্তছটা।
বলিহারি স্বুরঙ্গ প্রবাল ঘটা॥
(ভারতচন্দ্র)

ঘট, কুম্ভ ইত্যাদির সৌন্দর্যরূপ যেমন কবি দেখেছেন, তেমনি তার প্রয়োজনের দিকটাও লক্ষ্য করেছেন বরং খুব বেশী পরিমানেই লক্ষ্য করেছেন। ঘট পূজাদ্রব্য হিসেবে প্রয়োজনীয়—কুম্ভও। তবে কুম্ভের প্রয়োজনীয়তা আরও ব্যাপক। এই কুম্ভ মাঝে মাঝে জীবনরক্ষাকারী বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ে বিচিত্র রকমের সরোবর, নদী, হ্রদ, সাগর পাড়ি দেবার জন্য একমাত্র অবলম্বনই হচ্ছে কুম্ভ—

সম্ভোগকালে: এক বণিকনন্দন রাজকন্যার সঙ্গে রতিরত হলে দোনাগাজী এভাবে সেই যুগনদ্ধ ছবি আঁকেন—

কুচকুম্ভ যুগলে ভাসিছে মীনবরে।
স্রোতে নিব করিয়া ধরএ বারে বারে॥
কিবা কাম সরোবর হ'তে চাহে পার।
কলসী বুকেত লই দিয়াছে সাঞ্চার ॥

কামসরোবরে কুচকুম্ভ দুটো ভেসে যাচ্ছে—তাই তাকে বারবার ধ'রে রাখার প্রয়াস করে বণিকনন্দন। কখনো আবার কলসী দুটো বুকে নিয়ে বুকসাঁতার দেয় কামসরোবর পার হবার জন্য।

অভিসারকালে: "একে অন্ধকার রাত্রি, পথ পিচ্ছিল, কুচযুগল কলসী করিয়া যমুনা পার হইল।"[১] (বিদ্যাপতি)

মানকালে: (১) "(গোকুলপতি) বিরহ-সিন্ধু মধ্যে ডুবিতেছে, তুমি গুণবতী ধনী, তোমার কুচকুম্ভে লক্ষ্য প্রদান করিতে দিয়া গোকুলপতিকে উদ্ধার কর।"[২] (বিদ্যাপতি)।

(২) কামদহে পড়ে ভীত প্রণয়ী মানিনী নায়িকার কুচকুম্ভ প্রার্থনা করছে কামদহ পাড়ি দেবার জন্য—

১. ৪৪৪
২. ৬৬৪

মানিনী মান পরিহর দূর।
পড়িলু মুঞি কামদহে বড়হি পাইলু ভয়ে
কুচ-কুম্ভ দিয়া কর পার।
(দ্বিজ মাধব)

বিরহকালে: বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী
হএ মোর তবেসিঁ নিস্তার।।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

বেদনাময় অভিসারযাত্রাকালে নায়িকা কুচযুগলকে কলসী ক'রে আকুলভাবে রাত্রি-যমুনা সন্তরণ করছে---সেই-নদী-সন্তরণের মধ্যে নায়িকার অসহায়তার ব্যঞ্জনা অপূর্বভাবে ফুটেছে। কিন্তু মানকালে কুচকুম্ভের অবলম্বন দিয়ে নায়ককে বাঁচানোর জন্য যেখানে নায়িকাকে অনুরোধ করা হচ্ছে—সেই অলংকারের মধ্যে ভোগকামনা ব্যক্ত করাই কবির অভিপ্রায়। কল্পনার চতুরতা এখানে বেশী। অতএব একই 'কলস' দুই অলংকারে দুই ভিন্ন ভাবের প্রকাশক।

কুচযুগল অপূর্ব কলস, প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রয়োজনীয় তো বটেই--এমনকি মুনিদের জ্ঞানোদয়ের জন্যও অত্যন্ত মূল্যবান---"কুচযুগল কাঞ্চন কলস সমান, মুনিজন দেখিলেও তাহাদের জ্ঞান হয়।"[১] (বিদ্যাপতি)। কবি-কুলের ধারনা কাঞ্চনকলস সদৃশ কুচ দেহবিষয়ে আগ্রহহীন মুনিদের হয়তো দেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ক'রে তুলতে পারবে।

'পদ্ম', 'পর্বত', 'শ্রীফলে'র মত 'কুম্ভ' উপমানটিও দ্বিধাহীন চলে এসেছে আধুনিককালে। যেখানে ইচ্ছে করলেই স্বচ্ছন্দে যে কোন নতুন উপমান ব্যবহার করা যেত---সেখানে আধুনিক কবি যখন 'কুম্ভ' শব্দটিরই পরিষ্কার উচচারণ করেন---তখন বোঝা যায় পুরোনো কবির সারিতে দাঁড়ানোয় আধুনিক কবির কি আনন্দ। সেই 'কুম্ভ' শব্দের প্রয়োগ, স্বর্ণের প্রতি সেই ইচ্ছাকৃত পক্ষপাত, পুরাতনকেই নতুন আনন্দে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে---ঐতিহ্যের প্রতি কবিদের এমন মোহন মোহ—

১. ৪৩৯

স্বর্ণকুম্ভ বিভাসিত বুকে,
মসৃণ তাপে বহু কৌতুকে
কতনা নিবিড় প্রেমের আবহে
একদা কখন সময় শেষ[১]
(সৈয়দ আলী আহসান)

যৌবনপুষ্ট স্বর্ণালী পয়োধর অনেক যত্নে লালিত সোনার কলসের মতই আদরণীয়। পরিপূর্ণতার জন্য এবং স্বর্ণে গঠিত হওয়ার জন্য জলভরা স্বর্ণকুম্ভ যেমন মূল্যবান—যৌবনজলে ভরা স্বর্ণবর্ণ পয়োধরও তেমনিই। স্বর্ণ-কুম্ভের সুপেয় জল যেমন সুন্দরীর কাঁখ থেকে ছলকে পড়ে এবং তৃষ্ণা হরণ করে, কুচকুম্ভও তেমন ছলকিয়ে ওঠে জীবনের স্বর শুনে—সীমাহীন ক্লান্তি সে নিমেষেই হরণ করতে সক্ষম—

জ্বলজ্বলে দুটি স্বর্ণকুম্ভ
কানায় কানায় যৌবনজলে ভরা।
জীবনের স্বরে ছলকিয়ে ওঠে,
সীমাহীন পথে সে জল ক্লান্তিহরা।[২]
(শামসুর রাহমান)

কবি আবদুল কাদিরকে এই কুম্ভে জলের বদলে ভ'রে আনতে দেখি অনুরাগ—বুকের কুম্ভে ভরা অনুরাগ।[৩]

উপমান 'কুম্ভ' এবং 'ঘট'কে এতক্ষন আমরা লক্ষ্য করেছি। এবার দেখা যাক, ঘড়াকে ব্যবহার করেছেন কোন কবি। এক উন্মাদিনীর লুণ্ঠিত বক্ষপ্রদেশ দেখে শামসুর রাহমান ভাবেন, তার সোনালি মায়াবী ঘড়া দুটো থেকে কে গণ্ডুষ গণ্ডুষ জল পান করলো নিষ্ঠুরের মত—

তার ঘড়া,
সোনালি মায়াবী ঘড়া থেকে গণ্ডুষ গণ্ডুষ জল
কেউ করেছে কি পান?[৪]

---

১. '২৩' [সহসা সচকিত]
২. 'মিশ্ররাগ'
৩. 'অভিষেক'
৪. 'একদিন রাস্তায়'

পয়োধরের আর একটি বহুব্যবহৃত উপমান হচ্ছে 'বাটি'। মধ্যযুগের কবিদের দৃষ্টিতে গৌর কুচজোড়া হচ্ছে উল্টে থাকা দুটো সোনার বাটি। তাঁদের ভাষায় বাটি হচ্ছে 'কটোরি' বা 'কটোর'—

১. বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল
কুচ উলট কটোরে।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

২. কুচযুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
(চণ্ডীদাস)

৩. কুচমণ্ডলী কনক কটোরি
বনাইল অনুপ ধাতা।
(চণ্ডীদাস)

৪. একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
(বিদ্যাপতি)

৫. পীন পয়োধর গোরা
উলটল কনক কটোরা।।
(বিদ্যাপতি)

৬. তেই উদসল কুচ-জোরা।
পলটি বৈসাওল কনক-কটোরা।।
(বিদ্যাপতি)

৭. রঙ্গ পরিহর অতি ভেল গোর।
মাজি ধবল জনু কনক কটোর।।
(বিদ্যাপতি)

৮. কনক কটোর চোর কুচ কোরক জোরে
উজোরিল মোতিম দাম।
(গোবিন্দদাস)

२९

२८

৯. কনয়া কটোরি কুচে করিয়া কস্তুরী।
শ্যামল রতন ধন পর কণ্ঠ ভরি।।
(পরশুরাম)

১০. হিয়া থার কুচ কনক-কচোরা
(জায়সী)

১১. কনক কচোর উঠে জনু চারু।।
(জায়সী)

১২. উরজ কঠিন হেম কটোর।
(আলাওল)

১৩. কনক কটোরা তাহে যুগল সুমেরু॥
(নওয়াজিস খান খোন্দকার)

১৪. কনক কটোরা কিবা কুচযুগ তার।
(দোনা গাজী)

উদ্ধৃতি খুব কমই হ'য়ে গেল। মধ্যযুগের ধনভাণ্ডার থেকে স্বর্ণকটোরা আরও বহু লুট করা যেতে পারত। আমরা দেখেছি কলসের ক্ষেত্রে, কবিরা তার ব্যবহার-রূপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন অলংকারে। সোনার বাটি কিন্তু কাব্যে সৌন্দর্যসম্পদরূপেই গৃহীত হয়েছে। নায়িকারা এই স্বর্ণ বাটি দুটির অধিকারিণী হ'য়ে নিজেরা যেমন আনন্দে গর্বে অধীর হয়েছেন, কবিচিত্তেও তেমন সীমাহীন স্ফুর্তির হিল্লোল বইয়ে দিয়েছেন।

এর আগে আমরা দেখেছি স্বর্ণকলস দুটিকে কবিকুল শূন্য রাখেননি, পূর্ণ ক'রেছেন 'জলে', 'রসে' 'সুধা'য় অথবা 'অনুরাগে', ঠিক তেমনি স্বর্ণকটোরা দু'টিকেও তাঁরা শূন্য রাখেননি—ভালোবেসে করেছেন পূর্ণ। পুরাতন কবিকুল যেমন স্বর্ণকলসে নায়কের মনকে বন্দী ক'রে সীলমোহর ক'রে রাখতেন, তেমন স্বর্ণকটোরায়ও বন্দী করতেন নায়কের হৃদয়কে—

১. কুচযুগ তোর কনক কটোর।
দেখি মন বন্দী হইল মোর।। (দ্বিজ মাধব)

২. কাঞ্চন কটোরা কুচ চর্চিয়া চন্দনে।
নিজ হিয়া তথা যেন সম্বরে বামনে।। (দৌলৎ কাজী)

অনুরূপ কর্ম করেন আধুনিক কবিও। স্বর্ণকটোরা দুটিকে পুরুষের হৃদয়ের বাসনারসে ভরে আনেন তিনি—

আমার বুকের ছাঁচে গড়া এই সোনার বাটি
বাসনার রসে আনিয়াছি ভ'রে সব পুরুষেয়।[১]
(বুদ্ধদেব বসু)

পুরাতন কবিকুল ভালোবেসে বাটি দুটোতে সমুদ্রও পুরে রাখতেন। নিম্নের পদে দেখা যাচ্ছে—সমুদ্ররূপী কৃষ্ণকে রাধা ধরেছিলেন ঐ ছোট কটোরাতেই—

ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন।
নিমগন কতহুঁ রমণি-মন-মীন।।
শ্রবণে মকর গিমে কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমি মিলিত মনি-রাজ।।
এ সখি শ্যাম-সিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধয়লি কুচ কনয়-কটোর।।
(বিদ্যাপতি)

পয়োধরকে যখন কবিকুল অমৃতপাত্র, পানপাত্র, ভাণ্ড বা শিশি বলেন তখনও বুঝতে হবে সেগুলেকে তাঁরা পূর্ণ করেছেন অমৃতে, শরাবে অথবা কোন সুপেয় পানীয়ে; কুচকে আধাররূপে কল্পনা করলে রসপূর্ণ করাটাই কবিদের স্বভাব—

১. অমৃত রতন মোন দুই মূদেঁ।।
(জায়সী)

২. কভু সে এসেছে পাশে স্নেহ-পীন বক্ষে আবরিয়া
অমৃতের ঝারি,
সে উন্মদ সুধা লাগি' ছিনু কন্ঠে পিপাসা ভরিয়া
দু'বাহু প্রসারি'।।[২]
(আবদুল কাদির)

---

১. 'কবিতা'
২. 'বিচিত্রা'

৩. শ্যাওলার, ত্বকের দেহ, ব্যগ্র, গাঢ় দুধের শরীর।
হে বুকের **পানপাত্র**, হে অনুপস্থিতির চোখেরা
হে গোলাপ নিতম্বের।[১]
(পাবলো নেরুদা/অনুবাদঃ শামসুর রাহমান)

৪. বুকের **ভান্ড** লুন্ঠন তাই
করেছি দস্যু সম।[২] (আবদুল কাদির)

৫. আকলের তো গপ্ করো
আকলোর সীম নাই
নিয়ামত ভরা **শিশি** উপইর
দেখছোনি কও চাই।
(লোক কবি)

যখন বুকের গেলাস দু'টিকে 'তৃষ্ণাভরা' বলেছেন কবি, তখনও তাকে আবেগে-অনুরাগে পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা আছে তাঁর মনে—

লবনাক্ত তৃষ্ণাভরা **গেলাস** তোমার হৃদয়—
(পাবলো নেরুদা)

স্তনের আর একটি নতুন উপমান হচ্ছে কৌটা। বলা বাহুল্য কৌটাটি সোনার। মানিকভরা দুটি সোনার কৌটা যেন আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন রাধা। কৃষ্ণ তাই আবরণ উন্মোচন ক'রে এ ব্যাপারে বোঝা-পড়া করবেন—

সোনার কটুআ দুটি মানিকে পুরাআঁ।
নেত বসন তাত ওহাড়ন দিআঁ।।
আক্ষা ভাণ্ডি লআঁ। যাহ আমুল ভাণ্ডার।
কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ। লৈবোঁ। তাহার বিচার।।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

দেখা গেল সোনার কৌটাকে পর্যন্ত কবিরা মানিকে ঋদ্ধ করেন। অতএব ফুলদানিকে তাঁরা প্রফুল্ল ফুলে উচ্ছলিত ক'রে তুলবেন একথা স্পষ্ট—

---

১. 'একজন নারীর শরীর' [আত্মস্মৃতি ও কয়েকটি কবিতা।]

২ [সফল বসন্ত]

অলজ্জ ঐ জানু তোমার হায় কী উতল
যমজ দুটি ইন্দ্রধনুর বর্ণালীতে।
জামার নিচে মঞ্জুরিত তণু তোমার
ফুলের ভারে উচ্ছলিত ফুলদানি সে।[১]
(বেলা আখমাদুলিনা*/অনুবাদঃ মনীন্দ্র রায়)

অতঃপর কবি পুষ্পপূর্ণ ফুলদানিকে ধ'রে রাখেন আলতো ক'রে—

তার হাত
একটি স্তনকে আলতো ক'রে ধরে ফুলদানির মতো[২]
(শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়)

এবার সরা প্রসঙ্গ। নিভাঁজ নগ্ন স্তন শামসুর রাহমানের চোখে কখনো সুডৌল সরার মত লাগে---সরার ঝুঁটিটা যেন স্তনবৃন্তের সুগোল বৃত্তটা—

সাবানে ঘষছো তুমি বগলের সবুজাভ ভূমি
সরার মতন স্তন, নাভিমূল, উরু
এবং ত্রিকোণ মাংসপিণ্ড কি মঞ্জুল।[৩]

কখনো কখনো পয়োধ রকল্পিত হ'য়েছে খেলনারূপে—

শশী সূর্য্য তোমার কন্দুক
আমারও খেলনা আছে প্রেয়সীর সুচারু চুচুক।
(মোহিতলাল মজুমদার)

কবি বলছেন শশী সূর্য যেমন স্রষ্টার খেলনা, তাঁর খেলনা তেমন রমণীর সুচারু চুচুক। কবি হ'য়ে যেতে চান একটি ছোট্ট শিশু--আর নিজের নধর নরম কচি আঙুল দিয়ে খেলতে চান কুচখেলনা নিয়ে--- আর আমার ছোট্ট হাতের নধর নরম কচি আঙুলগুলি

ঊর্ধ্বোন্মুখ উন্মোচিত ক'রে—
আঁকড়ে ধ'রে আছি তোমার গ্রীবা, খেলা করছি তোমার চুল,
তোমার চিবুক নিয়ে, তোমার দুটি স্তনের খেলনা নিয়ে।[৪]
(নচিকেতা ভরদ্বাজ)

---

১. 'স্কুটার'
* রাশিয়ার কবি
২ [মৌরীর বাগান ও কিছু নতুন কবিতা]
৩. 'পাশাপাশি' [দুঃসময়ে মুখোমুখি]
৪. 'অন্য রূপকল্পে উপাসনা'

এই খেলনা হ'তে পারে বর্তুক, লাট্টু অথবা পাশা খেলার গুটি—

১. যেন বা দুইটি বর্তুক লয়ে যেবা পারে খেলিবার,
ভালবাসা দেশে পৌঁছিতে তার খুলে যায় সব দ্বার।[১]
(জসীমউদ্দীন)

২. জানহু দোউ লটু, এক সাথা।
জগ ভা লটূ চঢ়ে নহিঁ হাথা।। (জায়সী)

৩. হিয়া-ঘর এক খেল দুই গোটা।। (জায়সী)

দেখা গেল এই বর্তুকক্রীড়া ভালোবাসা-দেশের সকল দ্বার খুলে দিতে পারে। আর এ লাট্টু এমনই যে, সারা জগৎ পাগলের মতো ঘুরছে কিন্তু এদের হস্তগত করতে পারছেনা। কুচদ্বয় যখন পাশা খেলার গুটিরূপে কল্পিত হয়েছে তখন তার প্রয়োগ যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। নিম্নের দু'টি উদ্ধৃতির একটিতে দেখা যাবে, রাজা মনে মনে পাশার চাল দিয়ে নববধূর গুটিযুগল স্পর্শ করতে চাইলে, নববধূ কেমন ক'রে নব প্রেম বা ন'য়ের চাল রচনা ক'রে রাজার হৃদয়ে জয়ের দশম দান দেন---আর অপর উদ্ধৃতিতে দেখা যাবে বারাঙ্গনাদের ঐ ছলনাময় পাশাখেলার গুটিযুগল স্পর্শ ক'রে কত খেলুড়ে হাত ঝেড়ে নিরাশ হ'য়ে চ'লে যায়—

১. ঐসৈ রাজকুঁবর নহী মানৌঁ।
খেলু সারি পাঁসা তৌ জানৌঁ।।
কাঁচে বারহ পরা জো পাঁসা।
পাকে পৈঁত পরী তনু রাসা।।
রহৈ ন আঠ অঠারহ ভাখা।
সোরহ সতরহ রহৈঁ সো রাখা।।
সত জো ধরৈ সো খেলনহারা।
ঢাবি ইগারহ জাই ন মারা।।
তূঁ লীহ্নে আছসি মন দুবা।
ঔ জুগ সারি চহসি পুনি ছুবা।।
হৌঁ নব নেহ রচৌ তোহি পাহঁা।
দসউঁ দাঁর তোরে হিয় মাহঁা।।

---

১. [সখিনা]

তৌ চোপর খেলৌঁ করি হিয়া।
জৌ তরহেল হোই সৌতিয়া।।
(জায়সী)

((রানী বললেন) "এতেই রাজকুমার প্রবোধ মানবনা। যদি পাশা খেলতে পার তবেই বুঝব। পাশার বারোটা গুটি যদি কাঁচা থাকে তবে ঠিক ঠিক পাকা দান হবে। তখন আর আট বা আঠারো থাকবে না, শুধু ষোল এবং সতেরোর দান থাকবে। যে সাতের দান চালবে বা সত্যকে রাখবে সেই পাকা খেলোয়াড়। যে (দশেন্দ্রিয়-সহ-মন) এগারোর দান চালবে তাকে কেউ হারাতে পারবেনা। তুমি মনে মনে পাশার চাল দিয়ে তারপর আমার গুটি-যুগলকে (বক্ষযুগল) স্পর্শ করতে চাইছ। আমি তোমার জন্যে নব প্রেম বা ন'য়ের চাল রচনা করব এবং তোমার হৃদয়ে (জয়ের) দশম দান দেব। তোমার হৃদয় অধিকার ক'রে চারের চালে খেলব, যাতে অপরের তিনের চাল (সপত্নীরা) যেন আমার অধীন হয়।"

—-অনুবাদঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

২. পুনি সিঙ্গার হাট ধনি দেসা।
কই সিসার তইঁ বইঠী বেসা।।
মুখ তঁবোল তন চীর কুসুম্ভী।
কাননহ কনক জরাউ খুম্ভী।।
হাথ বীন সুনি মিরিগ ভুলাহীঁ।
সুর মোহহিঁ সুনি পাইস ন জাহীঁ।।
ভউঁ হঁ ধনখ তিন্‌হ নয়ন অহেরী।
মারহি বান সানি সউঁ ফেরী।।
অলক কপোল ডোলু হঁসি দেহীঁ।
লাই কটাজ মারি জিউ লেহীঁ।।
কুচ কঞ্চুকি জানউঁ জুগ সারি।
অঞ্চল দেহিঁ সুভাবহি ঢারী।।
কেত খেলার হার তিন্‌হ পাসা।
হাথ ঝারি হোই চলহিঁ নিরাসা।।
(জায়সী)

("ধন্য এ দেশ আর তার শৃঙ্গারের হাট। সেখানে শৃঙ্গার ক'রে বারাঙ্গনারা বসেছে। মুখে তাম্বুল, তনুদেহে কুসুমবর্ণের বস্ত্র। কানে কনক জরির কর্ণাভরণ। হাতের বীণাধ্বনি শুনে মৃগ মোহিত হয়। যে তাদের সুরে মোহিত হয়, সেই স্থানু হ'য়ে পড়ে। তাদের ভুরু ধনুক এবং নয়ন তীক্ষ্ণবাণ, দৃষ্টিতে শাণিত ক'রে তারা এই বাণ নিক্ষেপ করে। যখন তারা হাসে, তাদের কপোলের অলক দোদুল্যমান হয় এবং কটাক্ষে তারা জীবন হরণ করে। চোলীর অভ্যন্তরের স্তন দুটি পাশা খেলার সারী। স্বভাববশতঃ তারা বার-বার আঁচল ফেলে দিচ্ছে। অনেক খেলাড়ু পাশা খেলায় হাত ঝেড়ে নিরাশ হ'য়ে চলে গেছে।"—অনুবাদ: সৈয়দ আলী আহসান)

কাঠিন্য সত্ত্বেও কুচে যে রম্য কোমলতা আছে, তাকে কোন কোন কবি তুলার কোমলতার সদৃশ মনে করেন। জীবনে যে কোনদিন রমণী দর্শন করেনি—সেই মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ ব্রাহ্মণবেশী রমণীদের বক্ষস্পর্শ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে তার পিতার কাছে—

পরম ব্রাহ্মণ কারো লোম নাহি মুখে।
তুলার সমান দুটা মাংসপিণ্ড বুকে ॥
তাতে যদি হস্তটি করাই পরশন।
স্বর্গবাস হাতে পাই হেন লয় মন ॥
(কৃত্তিবাস)

পয়োধরকে তুলার সঙ্গে তুলনা করলে যে মধুর অনুভূতি হয়, তুলার তৈরী গদির সঙ্গে তুলিত করলে সেই অনুভুতি মুহূর্তেই চুরমার হ'য়ে যায়। যুবতী অপসৃত হ'য়ে মুহূর্তে একজন বিগতযৌবনা স্থূলাঙ্গী দেখা দেয়, যার কুচদ্বয় শিথিল এবং বিশাল—

তাহার পাছে চলে আইয় নাম তার রাধি।
দুই কুচ পড়িছে জেন বিছানের গদি ॥
(নারায়ণ দেব)

অবশ্য উপমাটি যেমনই হোকনা কেন, প্রথাপরবশ উপমার রাজ্যে এটা যে নতুন স্বাদ এনেছে, তা স্বীকার করতেই হবে। এ ধরণের লৌকিক উপমাগুলো অল্প পরিমাণ হ'লেও প্রথার শিলীভূত সৌন্দর্যের জড়তা কাটাতে মাঝে মাঝে সাহায্য করেছে।

গদি যদি উপমান হ'তে পারে—তাহলে বালিশ উপমান হ'য়ে এলে বিস্ময়ের তেমন কারণ ঘটেনা। বালিশে মাথা রেখে নিমীলিত চোখে নিসর্গসন্দর্শনের সুখালস অনুভূতিটি সৈয়দ আলী আহসানের চোখে—

তোমাকে আমার স্বপ্নের ছায়া ক'রে
হৃদয়ের তাপ নিবারণ করি যদি,
তোমাকে আমার ইচ্ছার খেয়া ক'রে
স্বপ্নবারিধি পার হই নিরবধি
তাহলে তখন তোমার বক্ষ উপাধান ক'রে নিয়ে
শয়নে কাটাই সারা দিনরাত যদি
সেই তো আমার সফল জীবন সফল সাগর নদী।[১]

দয়িতাকে ইচ্ছার খেয়া ক'রে স্বপ্নবারিধি পার হবার সময় কুচউপাধানে মাথা রেখে সারা দিনরাত শয়নে কাটিয়ে দিতে চান কবি; স্বপ্নাচ্ছন্ন কবির চোখে জীবন তখন সফল মনে হয়, সফল মনে হয় সাগর নদী—প্রকৃতি।

উপাধান উপমানটিকে সৈয়দ আলী আহসানের কাব্যে আরও কয়েকবার লক্ষ্য করা যায়—

১) অথবা সমুদ্র যেন উপাধান তোমার বুকের[২]
২) এবং বক্ষে উদ্বোধন—
উপাধান যেন চিরাশ্রয়ের[৩]

বাঙালী আর কোনো কবিকে এই উপমানটি ব্যবহার করতে দেখা যায় না। উপাধান উপমানটি ব্যবহারের পেছনে যে মানসিকতা কাজ করে, তা হচ্ছে রম্য একটি আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুলতা। সৈয়দ আলী আহসানের কুচসম্পর্কিত উপমাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পয়োধরে আশ্রয় কামনা করছেন; পয়োধর যখন মৃত্তিকা—তখনও, পয়োধর যখন তরঙ্গ—তখনও, পয়োধর যখন পাহাড়—তখনও, এমনকি পয়োধর যখন অগ্নিগিরি—তখনও—

১. 'তোমাকে----এক' ['অগ্রদূত' পত্রিকা]
২. 'প্যারিসের চিঠি' [অনেক আকাশ]
৩. '১১' [সহসা সচকিত]

১) তখন বৃন্তের ছায়া
মৃত্তিকার আশ্রয়ের মতো।[১]

২) তোমার যে তরঙ্গিত বক্ষ
আশ্রয়ের উপঢৌকন ছিলো[২]

৩) তোমার বক্ষে পাহাড় নামে
আমি আশ্রয় সেখানেই চাই[৩]

৪) বক্ষে তোমার আশ্রয় পেয়ে
যখন সহসা ভূকম্পন[৪]

কবি যখন অগ্নিগিরিতেও আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন উপাধানে আশ্রয়ের জন্য আকুলতা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক—

আমার আশ্রয় শয্যা —কম্পমান বক্ষ-উপাধান[৫]

উপাধানে শিরসংস্থাপনের সুখের মত মায়ের কোমলপ্রতপ্ত বুকে মাথা রেখে ঘুমোনোর সুখ কবির শিশুকালকে যেভাবে আচ্ছন্ন রেখেছিল—বড় হয়েও সেই আচ্ছন্নতা তিনি অন্বেষণ করেন রমণীবক্ষে—আর তাই উপাধান উপমানটি বারবার মনোনয়ন পায় ("আমি একসময়ে লিখেছিলাম আমি আমার মা-র স্তনের ছায়ায় লালিত হয়েছি। কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য। এখনও মনে পড়ে মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়েছি একটি কোমল উপাধানের আশ্রয়ে। বড় হয়ে রমণীবক্ষের আকর্ষণ অনুভব করেছি।"[৬] —সৈয়দ আলী আহসান)। সৈয়দ আলী আহসানের স্বপ্নাতুর কৈশোরে কীট্‌সের স্বপ্নকল্পনা ছায়া ফেলে গিয়েছিল; কেননা স্কুলে ছাত্রথাকাকালীন সময়ে তিনি কীট্‌স্ অধ্যয়ন করতেন। কুচের 'উপাধান' উপমানটি আহরণে কবি কীট্‌স্-ই তাঁর উৎসাহের উৎস—

১. ব্যঞ্জনা'
২. '৮১' [উচ্চারণ]
৩. 'তোমাকে--দুই' ['অগ্রদূত' পত্রিকা] ৪. '৩১' [সহসা-সচকিত]
৫. 'নূতন স্বাদ' [অনেক আকাশ]
৬. সৈয়দ আলী আহসানের দিনলিপি থেকে

Bright star
Pillow'd upon my fair
Love's ripening breast
To feel forever its
Soft fall and swell
Awake forever in a sweet unrest[১]
(Keats)

কীট্‌সের এই কবিতায় কুচউপাধানে শিরসংস্থাপনের আনন্দ ও অধীরতা বাণীরূপ লাভ করেছে। শিরসংস্থাপনের পর পয়োধরের ফুলে ওঠা পার্শ্ব-দেশের স্পর্শসুখ অনুভব করতে করতে এবং মৃদু উত্থানপতনের ধ্বনি শুনতে শুনতে কবি গভীর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হ'তে চান---কিন্তু একপ্রকার মধুর অস্বস্তিতে জেগে ওঠেন বারংবার। এই উপাধান এমনই বিলোড়নসৃষ্টি-কারী-মাদকতাসঞ্চারী। বোদ্‌লেয়ারের চোখেও এই উপাধান মদমুগ্ধ এবং দেবদূতেরও শক্তিহরণকারী---

-------- আমি রতি বিশারদ
বাহুবন্ধে, যখন প্রিয়তমের করি কণ্ঠরোধ,
কিংবা কাম-দংশনে অর্পণ করি, উদ্বেল, সচ্ছল,
অপরূপ স্তনভার—ভীরু, দৃপ্ত, পেলব, প্রবল,
হৃতশক্তি দেবদূত, সেই মদমুগ্ধ উপাধানে,[২]
(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

কোন কবি সূতোয় বোনা লেসের মসৃণতা লক্ষ্য করেন পয়োধরে—

তার বুক
ওঠানো লেসের
মসৃণতা
সম্ভ্রম শানায়।[৩]
(মায়াকোভ্‌স্কি/অনুবাদ : মুকুল গুহ)

---

১. 'Sonnet'
২. 'পিশাচীর রূপান্তর' [বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা]
৩. 'আকাশছোঁয়া বাড়ির ক্রস সেকশন' [মায়াকোভ্‌স্কির শ্রেষ্ঠ কবিতা]

আর কেউবা পয়োধরে লক্ষ্য করেন মখমলবস্ত্রের কোমলতা—

তুমি সবে ঢাকতে শিখেছ তোমার শরমিন পাপড়ি
তোমার মখমল[১] (ফরহাদ মজহার)

তুলা, গদি, বালিশ, লেস, মখমলবস্ত্র—গৃহকর্মে ব্যবহৃত এই সব দ্রব্যাদি কবিকুলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—লক্ষ্য করা গেল। কোনো কবিকে দেখা যায় আসবাবপত্রের মহলেও অবলীলায় প্রবেশ করতে। যুদ্ধক্ষেত্রে নানান অস্ত্রের ঝনঝনানি আর রক্তারক্তি কাণ্ডের মধ্যে থেকে থেকে অতিষ্ঠ কবি ফিরে গিয়ে বসতে চান তাঁর প্রেয়সীর স্তনের শান্তিময় মনোরম টেবিলের পাশে। কোন অলস প্রহরে এই বিরহী যোদ্ধার মনে পড়েছে প্রিয়া 'দুহাতের পেয়ালায়' তাঁর মুখ তুলে ধরেছিল, সেই কথা। 'পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে' তাই তিনি প্রেয়সীর 'চোখের সৈকতে' সূর্যাস্ত দেখলেন আর ভাবলেন—

আবার কবে স্বদেশ দেখতে পাবো?
দেখতে পাবো তোমার মুখের অবাধ দিগন্ত?
আবার কবে ফিরে বসবো তোমার স্তনের টেবিলে?[২]
(লিওপোল্ড সেঙ্ঘর/অনুবাদ: সৈয়দ শামসুল হক)

বৈষ্ণব কবি যখন পয়োধরকে চুম্বক কল্পনা করেন, তখন গুণগত কারণেই তা সঙ্গত মনে হয়। কুচে যে চুম্বকের সুতীব্র আকর্ষণশক্তি আছে, সে তো প্রমাণিত। অতএব সুপুরুষবধে পটু রাধিকা যখন উচচ কুচ-চুম্বক-সম্পদ নিয়ে আবির্ভূত—তখন কৃষ্ণ সজ্ঞানে তাঁর সরস স্পর্শ নিয়ে আসছেন স্বেচ্ছামরণের জন্য—

তব অগেয়ানে কয়লি তুহুঁ ঐছন অব সুপুরুষ বধ জান।
উচ কুচ চুম্বক সরস পরশ দেই উদ্‌ঘাটহ নিঠিবান॥

আরবদেশের কবি ইমরাউল কয়সের কবিতায় 'মুকুর' উপমানটির দেখা পাওয়া যায়। উপমানটি খুব নতুন—হয়তো বা অ-স্পর্শিতও—

---

১. 'আমাদের ভালোবাসা মেহেরজান'
২. 'তোমার হাতের পেয়ালায়' [আফ্রিকার কবিতা/সেনেগাল]

সূক্ষ্ম কোমর শুভ্র আনন, নিটোল সরু প্রিয়ার কায়া,
স্বচ্ছ মুকুর বক্ষে প্রিয়ার মলিনতার নেইকো ছায়া[১]
(অনুবাদ: নূরুদ্দীন আহমদ)

রাধার স্তনকে মোতিহারশোভিত দেখতেই আমরা অভ্যস্ত—কিন্তু গোবিন্দদাস সেই মতিহারকেই রাধার কুচযুগলের সতীন কল্পনা ক'রে বলেছেন--'দূরে কর সোতিনী মোতিমহার।' এই মুহূর্তে স্তন বরং 'কঞ্চুক' অর্থাৎ বর্মরূপে কল্পিত হয়েছে—

কী যশ উচ কুচ কঞ্চুক ভার।
দূরে কর সোতিনী মোতিম-হার।।

বোদলেয়ারের 'LE BEAU NAVIRE' কবিতাতেও এই 'বর্ম' উপমানটিকে পাওয়া গেছে--

এগিয়ে আসে তোর নিটোল স্তনভার তুঙ্গ, উদ্দাম,
অনেক দ্বৈরথে বিজয়ী ওরা দুটি বর্ম অভিরাম---[২]
(অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

বোদ্‌লেয়ারের উক্ত কবিতাতে আমরা আর একটি নতুন উপমান পাই---সেটি হচ্ছে ঢাল---

এগিয়ে আসে তোর নিটোল স্তনভার তুঙ্গ, উদ্দাম,
অনেক দ্বৈরথে বিজয়ী ওরা দুটি বর্ম অভিরাম---
যুগল ঢাল ধরে কতনা
সুগোল, রেখায়িত আলোক--রশ্মির দ্যোতনা।

উগ্র ঢাল, তার তীক্ষ্ণ শরমুখ রঙিন, কোপনীয়,
রেখেছে সঞ্চিত যা-কিছু মায়াময়, মধুর, গোপনীয়--
আসব, সুরা, সৌগন্ধ্য---
বুদ্ধি বানচাল, হৃদয়ে প্রলাপের ছন্দ।[৩]
(অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

---

১. সব্‌আ মুয়াল্লাকা [বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা পৌষ-চৈত্র ১৩৬৬]
২-৩. 'সুন্দর জাহাজ' [বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা]

কখনো কখনো এই ঢাল চক্ররূপ ধারণ করে। রাধা এই স্তনচক্র দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকুসুমকে নিষ্ঠুরভাবে কাটেন। রাধাকে তাই নিষ্করুণ বলছেন শ্রীকৃষ্ণ—

> হিয় চক্রীকূচ ভর দেই মরদলি
> শিরিষ-কুসুম-তনু এহ ।।
>
> (বলরাম দাস)

'পয়োধর পাথর হিয় দহ ভারি'[১] ব'লে মধুর শাস্তি কামনা করলেও অনেক সময় এই পয়োধর-প্রচাপন সহ্য করা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও রীতিমত কষ্টকর হ'য়ে ওঠে। বলরাম দাসের উপরোক্ত পদ শ্রীকৃষ্ণের সেই যন্ত্রণা-কাতরতাকে ধারণ ক'রে রেখেছে। কবিকুল যখন পয়োধরে পুরুষপ্রবরকে কর্তন অথবা বিদ্ধ করার অভিপ্রায় লক্ষ্য করেন তখন চক্র, সন্না, ধনুক, শর, শৃঙ্গ, কন্টক—ইত্যাদি উপমান নির্বাচন করেন। বিদ্ধ করার ব্যাপারটি এখন একজন কবির চোখে দেখা যাক। 'ছুরি' কবিতায় শহীদ কাদরী বলেন, বড়শী যেমন ক'রে মাছকে গাঁথে, ঈগল দারুণ নখে গাঁথে ইঁদুরকে, চাঁদের ফলা কারুর বুকে গেঁথে ঘটায় রক্তপাত, স্তনের পীনোন্নত চূড়া তেমনি বিদ্ধ করে প্রেমিককে—

> সফেদ স্তনের পীনোন্নত চূড়ায় বেঁধা
> শহীদ প্রেমিক কাৎরে ওঠে,[২]

অনেকসময় প্রিয়তমের বুকে প্রিয়তমার দৃষ্টিশেল বিঁধে যেতে পারে—প্রিয়তমের পৃষ্ঠদেশে তখন কুচাগ্রভাগের সন্না বিঁধিয়ে দিয়ে সেই শেল উৎপাটন করা যায়—

> কস পিউ পীঠি দীন্হি মোহিঁ দেখে।।
> মকু পিউ দিস্টি সমানেউ সালূ।
> হুলসী পীঠি কঢ়াবৌঁ ফালূ।।
> কুচ তূঁবী অব পীঠি গড়োবৌঁ।[৩]
>
> (জায়সী)

---

১. বিদ্যাপতি ২. [তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা]

৩ ("কেন প্রিয় আমাকে দেখে পিঠ ফেরালেন? মনে হয় প্রিয়তমের শরীরে আমার দৃষ্টিশেল বিঁধেছে। আমি তাঁর পৃষ্ঠদেশ আলিঙ্গন ক'রে সেই ফলা বের ক'রে দেব। এখনই আমার কুচাগ্রভাগের সন্না তাঁর পিঠে বিঁধিয়ে দেব।"—অনুবাদ: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

কুচ-ধনুকে নয়ন-বাণ যোজনা ক'রে কার্মুকে টংকার হানেন কোনো কবি—

বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুলধনু, চোখে চোখে ফুলবাণ।[১]

(নজরুল)

কুচদ্বয়কে বাণযোজিত ধনুক নয়—বরং সরাসরি বাণরূপে দেখেছেন কোনো কোনো কবি। এই অগ্নিবাণদ্বয় অন্য হৃদয়কে বিদ্ধ করার জন্য সদা উল্লসিত; যদি বক্ষে বাঁধা না থাকতো তাহলে জগৎকে বিদ্ধ করতো—

জোবন বাণ লেহিঁ নহিঁ বাগা।
চাহহিঁ হুলসি হিয়ে হঠ লাগা।।
অগিনি-বাণ দুই জানৌ সাধে।
জগ বেধহিঁ জউঁ হোহিঁ ন বাঁধে।।

(জায়সী)

কোনো কবি বলেন এই শরাঘাতে নায়িকা নিজেই যন্ত্রণাবিদ্ধ—

উচ কুচ বিকচ শরে আকুল বালা।

(কৃষ্ণরাম দাস)

কোনো কবি বলেন পুরুষপ্রবরকে দংশানোর জন্য রমণী নিজের শরীরে বেণীসাপিনী পোষে, এবং তাকে বিদ্ধ করার জন্য অঞ্চলে দুটি শৃঙ্গ লুকিয়ে রাখে—

নারীর যৌবন বড় দুরন্ত।
শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত।।
বিনোদ বিননে বিনায়্যা বেণী।
পুরুষে দংশিতে পোষে সাপিনী।।
... ...
দুখানি বিষাণ নিশান রাখি।
হৃদয়ে মৃণাল রেখেছে ঢাকি।।

(ভারতচন্দ্র)

পুরুষভ্রমরকে বিদ্ধ করার মানসে কোনো কবি নির্মাণ করেন বিষাক্ত কাঁটা—কাঁটাটি কেতকীর—অপরূপ এবং মোক্ষম—

১. 'সাম্যবাদী'

বেধৈ ভঁউর কন্ট কেতকী।
চাহহিঁ বেধ কীহ্ন কঞ্চুকী॥
(জায়সী)

লোককবি পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন শিমূলকাঁটার প্রতি---

ওকি দা দা রে
যৌবন হইলো
শিমলা কাঁটার মোত॥

কর্তনও নয়, বিদ্ধও নয়—বরং পুরুষপ্রবরকে একেবারেই ধ্বংস করার মানসে নির্মিত হয়েছে কামানের গোলা---

কুচ গোলা দুই হিরদয় লাএ। (জায়সী)

বিজয়গুপ্ত কুচদ্বয়কে প্রেমপরিপূরিত দুই বল্লভা মনে করেন---

বল্লভা দুই কুচভার   হৃদয় মুকুতা হার
দুই পায় পরিল পাশলি।

বুদ্ধদেব বসু একস্থলে কুচদ্বয়কে বালিকার মতো সরল মনে করেছেন---

টের পাই তার স্তন দুটি উঁচু হ'য়ে দেখছে আমাকে,
বালিকার মতো সরল।[১]

পয়োধরকে কেউ আবার সুজন ও খলের মত দেখেন; খলের মত তারা স্তব্ধ, নিত্যোন্নত ও ছিদ্রবিহীন এবং সঙ্গমে সুজনের মত তারা অঙ্গকে আশ্বাস দেয়---

সিহনা সুয়ন খলা ইব থড্ঢা নিচচুন্নয়া য মুহরহিয়া।
সংগমি সুয়নসরিচ্ছা আসাসহি বেবি অংগাই।[২]
(আব্দুর রহমান)

পয়োধরকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা দিতে দিতে কবির এমন হয়েছে যে, যখন তিনি আঁচলের তলায় দুই রাজকুমার শায়িত আছে মনে করেন, তখন সেই কুমারদ্বয়ের মুখকেও দেখেন পদ্মের মত---

১. 'একদিন : চিরদিন' [একদিন : চিরদিন]   ২. [সন্দেশ-রাসক]

"ওরে ভ্রমর, কপাট খুলিওনা, অঞ্চলে পদ্মকুমার শয়ন করিয়া আছে।"[১]

(বিদ্যাপতি)

কেউ কেউ বক্ষদেশে শায়িত কুমার দেখেন না ববং সিংহাসনে আরূঢ় দুই গর্বিত রূপবান রাজাকে দেখেন—যাঁদের শিরোদেশে শোভা পাচ্ছে বর্ণে গরীয়ান দুই ছত্র—

এক পাট বৈ্ দূনৌ রাজা।
সাম ছত্র দূনহুঁ সির ছাজা।।

(জায়সী)

মদনবাণে কৃষ্ণ যখন রাধার হৃদয়বধের চেষ্টা করছেন, তখন গরবিনী রাধা নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বড় বড় বীরের মর্যাদা দিয়ে বলছেন—বড়ায়ি, তুমি কৃষ্ণকে বলো গিয়ে, 'তীনভূবন বীরে'রা আমার দেহকে পাহারা দিচ্ছে, অতএব 'কি করিতে পারে জগন্নাথে?' এবং তখনই নাসাকে বিনতানন্দন, কর্ণকে কর্ণ এবং কুচযুগকে যুধিষ্ঠির কল্পনা করা হয়েছে—

নাসা বিনতানন্দন পাণ্ডুগণ্ড পাশে কর্ণ
বিম্ব ওষ্ঠ পুষ্প দন্ত সঙ্গে।
কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর
সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে।।

(বড়ু চণ্ডীদাস)

পিনদ্ধ বল্কলবন্ধে আবদ্ধ যুগকুচকে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে যৌবনের বার্তাবহ দুই বন্দী দূত; বন্দী অথচ বিদ্রোহী—

পিনদ্ধ বল্কলবন্ধে যৌবনের বন্দী দূত দোঁহে
জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে।[২]

দেখা যাচ্ছে স্তনের বস্তুবাচক উপমান কবিরা যেমন ব্যবহার করেছেন—তেমনি ব্যবহার করছেন ব্যক্তিবাচক উপমান। উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোই এর প্রমাণ। স্তন এখানে প্রাণবান মানুষের মত ব্যবহার করছে। মানুষ তো বটেই, দেবতা শিবঠাকুর পর্যন্ত স্বয়ং স্তনের উপমান হয়েছেন। শিবভক্ত কবিরা নায়িকাবক্ষে তাঁদের প্রিয় দেবতাকে দেখতে আগ্রহী ব'লেই এমনটি হয়েছে। স্তনকে শিব কল্পনা ক'রে কবিরা কাব্যের নায়কদের

১. ২০৪
২. 'অনসূয়া' [সানাই]

୨୧

൭൦

অনেক সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। নায়ক যদি কথায় কথায় শিবকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, শরণ প্রার্থনা করেন; নখচন্দ্র দিয়ে অর্চনা করেন এবং কর-পুষ্পাঞ্জলি দেন, তাহলে নায়িকার কিছুই বলার নেই—

(১) "আমার কুচযুগরূপ শম্ভু স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিল, তাই আমার বিশ্বাস হইল।"[১]

(বিদ্যাপতি)

(২) "কুচযুগরূপ শম্ভুর শরণ আমাকে দাও।"[২]

(বিদ্যাপতি)

(৩) অম্বর বিঘটুঅ কামিক কামিনি করে কুচ ঝাপু সুছন্দা।
কনক সম্ভুসম অনুপম সুন্দর দুই পঙ্কজ দশ চন্দা॥

(বিদ্যাপতি)

(৪) ক্ষীরধর গিরি কুচ হর নাম ধরে।
করপূজা দিবারে কুমারে ইচ্ছা করে॥

(নওয়াজিস খান খোন্দকার)

(৫) উৎপলে পূজত হেমক শিব।

(জ্ঞানদাস)

নায়িকা নিজেও শিবদুটিকে কখনো চামরে ব্যজন করেন, কখনো চন্দনচর্চিত এবং দুগ্ধস্নাত করেন, কখনো বা মৃগমদে পূজা করেন—

১) "চাঁচর কেশ বক্ষে লম্বিত, যেন স্বর্ণশম্ভু চামরে আবৃত।"[৩]

(বিদ্যাপতি)

২) চন্দনে রঞ্জিত করু কুচ-কুম্ভ।
দুধে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু॥

(জ্ঞানদাস)

৩) "অশ্রুগলিত কজ্জ্বলে রঞ্জিত রাধাবক্ষ যেন মৃগমদে স্বর্ণশম্ভুর পূজা।"

(বিদ্যাপতি)

---

১. ১৬৪
২. ৩৩৭
৩. ৬১৭

মদনদেবও কখনো গঙ্গাজলে অথবা কুবলয়ে শিবার্চনা করেন, কখনো নিক্ষেপ করেন বাণ—

১) গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশত
গীম গজমোতি হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত স্থরধুনী ধারা।।
(বিদ্যাপতি)

২) রাই পয়োধর পিয়া কর সাজ।
কুবলয়ে শম্ভু পূজল কামরাজ।। (রায় শেখর)

৩) কিবা কুচহর কাম করিতে বিনাশ।
আড় ধনু ধরে লোমাবলী নাগপাশ।।
(আলাওল)

কুচচূড়ায় নখরেখাকে শিবশিরে চন্দ্রকলা ভেবে কবিও সুতৃপ্ত। নখ-ক্ষতকে কবি কখনও মনে করেছেন রক্তকিংশুক। নখাঙ্কিত কুচকে তাই কবি মনে করেন রক্তকিংশুকে অর্চিত শিব। ফুলে ফুলে অর্চিত এই শিব মুক্তাহাররূপ গঙ্গাকে জটার বাঁধনে বেঁধেছেন দেখে কবি উল্লসিত—

অমর ভূধর সম পয়োধর
মহঘ মোতিম হার।
হেম-নির্মিত শম্ভু শেখর
গঙ্গ নির্মল ধার।।
(বিদ্যাপতি)

সিংহ (কটি) পার্বতীকে পরিত্যাগ ক'রে এই শিবের বাহন হ'য়েছে দেখে কবি কি খুশী!—

হেন সিংহ গিরি অধে সতত বসতি।
হরের বাহন হৈল তেজিয়া পার্বতী।।
(আলাওল)

এমনকি শিবের সাপটিকে (স্তনস্থিত হার) পদ্মমধু পান করতে দেখেও কবি আনন্দ পান—

হরশির হৈতে কুণ্ডল ফণী অনুমান।
নাভিপদ্ম নাম্বিয়া করয়ে মধুপান॥
(দুঃখী শ্যামদাস)

রমণীর ভুরুভঙ্গি দেখে ধনু ফেলে মদন যেন অনঙ্গ হ'য়ে কটিতে আশ্রয় নিয়েছে। রমণীবক্ষের শোভন রোমরাজি যেন মদনের কেশ। নারীবক্ষস্থিত শিব লুক্কায়িত এই মদনের কেশাকর্ষণ করেছেন ভেবে কবি আনন্দিত—

উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিস্থলে।
ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে॥
(ভারতচন্দ্র)

রঞ্জিত, চর্চিত, অর্চিত, পূজিত, নন্দিত, বন্দিত এই শিব মাঝে মাঝে বড় বেকায়দায় পড়ে যান। চরম লজ্জায় ধ্যানস্থ হওয়া ছাড়া তখন তাঁর আর গত্যন্তর থাকেনা—"শম্ভু যেন সমাধিস্থ হইয়া মুখ নীচু করিয়া রহিয়াছে।"[১] (বিদ্যাপতি—বিপরীত রতির বর্ণনায়)। রসিকের পাল্লায় পড়ে শিব না হয় চূড়ান্তভাবে লজ্জিত হন—কিন্তু অরসিকের পাল্লার পড়লে তিনি বিদীর্ণ হন। রসিক ব্যক্তি নখচন্দ্রকলায় তাঁকে সজ্জিত করে—কিন্তু অবিদগ্ধ ব্যক্তি অকুশলতাহেতু নখাঘাতে তাঁকে বিদীর্ণ ক'রে তাঁর মাহাত্ম্যই নষ্ট করে—

কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥
(বৈষ্ণব কবি—রাধার অতি-উপরত বক্ষোদেশের বর্ণনা)

স্তনের উপমান হিসেবে মানুষ, দেবতা যেমন গৃহীত হয়েছে তেমনি গৃহীত হ'য়েছে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, মৎস্য এবং সরীসৃপ। পশুরাজ্য থেকে এসেছে হাতী এবং হরিণ। স্তনকে উন্মত্ত হস্তী কল্পনা করা বড়ই সঙ্গত হয়। মদন-মদ-জলে যদি এই হস্তী উন্মত্ত হয়, তাহলে প্রিয়তম অঙ্কুশ (নখাঘাত) লাগিয়ে ধরবে। যৌবনপীড়ায় ক্ষ্যাপা হস্তীর মত ক্ষেপে ওঠা এবং নখবিদ্ধ হওয়া স্তনের স্বভাব—এ তো সর্বজনবিদিত। অতএব আকৃতির দিক থেকে না হলেও প্রকৃতির দিক থেকে হাতীর সঙ্গে স্তনের চমৎকার মিল আছে—"যৌবনকেই হস্তী স্থির কর। যদি মদন-মদ-জলে উন্মত্ত হয়, প্রিয়তম অঙ্কুশ লাগাইয়া ধরিবে।"[২] (বিদ্যাপতি)

১. ৪৯৫
২. ২৫২

রমণী যখন রতিসংগ্রামের উদ্দেশ্যে সমরসাজে নিজেকে সজ্জিত ক'রে এই মদমত্ত হস্তী পুরুষের সামনে প্রেরণ করে, তখন এই উন্মত্ত হস্তী সামলানো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়—

জোঁ তুম চহহু জুঝি পিউ বাজা।
কীহ্ন সিংগার-জুঝ মৈঁ সাজা।।
জোবন আই সোঁহ হোই রোপা।
পখরা বিরহ কাম-দল কোপা।।
বহেউ বীর রস সেন্দুর মাঁগা।
রাতা রুহির খড়্গ জস নাঁগা।।
ভৌঁহেঁ ধনুক নৈন সর সাঁধে।
কাজর পনচ বরুনি বিষ-বাঁধে।।
জনু কটাছ সোঁ্য সান সঁবারে।
নখসিখ বাণ সেল অনিয়ারে।।
অলক-ফাঁস গিউ মেল অসূঝা।
অধর অধর সোঁ চাহহিঁ জূঝা।।
কুম্ভস্থল কুচ দোউ মৈমন্তা।
পেলোঁ সোঁহ সঁভারহু কন্তা।।

(জায়সী)

('রমণী বলল') "হে প্রিয়, যদি তুমি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও, আমিও দেখ সমরসাজে নিজেকে সজ্জিত করেছি। যৌবন এসে (দেহের) সম্মুখভাগে কেতনরূপে স্থাপিত হয়েছে। বিরহ বিক্ষিপ্ত, কামচমূ ক্রুদ্ধ। রক্তে রাঙা উলঙ্গ তরবারির মতো আমার সীমন্তের সিঁদুরে বীররসের ধারা প্রবাহিত। আমার ভ্রূ-ধনুকে নয়ন-শর উদ্যত, চোখের কাজল হল জ্যা এবং আঁখি-পল্লবে বিষাক্ত তীরপুচ্ছ। কটাক্ষের ধারে তা সানানো। আপাদমস্তক আমার রূপ যেন সুতীক্ষ্ণ শেল এবং বাণ। আমার কেশফাঁস তোমার পক্ষে অনুত্তীর্ণ কন্ঠপাশ। অধর চাইছে অধরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। (আমার) কুচযুগল মদমত্ত দুই হস্তীকুম্ভ—এবার তা তোমার সামনে প্রেরণ করছি, হে প্রিয়, সামলাও।"—অনুবাদঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

কিন্তু পুরুষপ্রবর যদি যথার্থই বীর্যবান হন তাহলে এই মদমত্ত হস্তী ধ্বংস করতে পারেন—

ভএউ জুঝ জস রাবণ রামা।
সেজ বিধাঁসি বিরহ সংগ্রামা॥
...   .
কীহ্ন সিঙ্গার অহা সব লূটা॥
ঔ জোবন মৈমন্ত বিধাঁসা।

(জায়সী)

("মনে হল যেন রাম রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে। শৃঙ্গার-সংগ্রামে শয্যা বিধ্বস্ত হল।.... নায়িকার সাজসজ্জা তিমি লুন্ঠন করলেন। যৌবনের মত্তহস্তী ধ্বংস হল।"—অনুবাদঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

'কুম্ভ' শব্দের আভিধানিক অর্থ কলস, ঘট; হস্তিমস্তকের পার্শ্বস্থ মাংস-পিণ্ড। কবিকুল যখন 'গজকুম্ভ' শব্দ প্রয়োগ করেন তখন হস্তীমস্তকের পার্শ্বস্থ মাংসপিণ্ড নয়---বরং সম্পূর্ণ হস্তীমস্তকই বোঝাতে চান। 'কুম্ভ' শব্দটিকে চরণের মধ্যে প্রয়োগের ভঙ্গিমা থেকে আমরা বুঝতে পারি শব্দটি কোথায় কলস অর্থে প্রযুক্ত এবং কোথায় হস্তীমস্তক অর্থে প্রযুক্ত। যেমন-কবি যখন বলেন, 'জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি/গুহরি রাখল কত বেরি'---তখন পরিষ্কার বোধগম্য হয় এই কুম্ভ হচ্ছে কলস আর যখন বলেন, 'জিনিয়া কুঞ্জরকুম্ভ কুচযুগ ধরে দম্ভ'--তখন স্পষ্ট প্রতীত হয় এই কুম্ভ হচ্ছে গজমস্তক। বোঝা গেল কুচদ্বয় হস্তীর চেয়েও বলদর্পী। আলাওলও বলতে চান কুচদ্বয় গজমস্তকের চেয়ে মনোহর—'করিবর কুম্ভ জিনি কুচ মনোহর।'

স্তন গজকুম্ভ এবং কটিদেশ সিংহ। সিংহের ওপর অপূর্ব হস্তিনীকে আরোহী দেখে কবি তাই হর্ষাকুল---

১) করিকুম্ভ বসতি পারীন্দ্র শিরপর।
বড় অপরূপ অতি দেখ মনোহর॥

(আলাওল)

২) কুচযুগ গজকুম্ভ কটি সিংহ জিনি।
সিংহ আরোহণ দেখি অপূর্ব হস্তিনী॥

(দোনা গাজী)

যে সিংহ নখাঘাতে হস্তীমস্তক বিদীর্ণ করে (করিকুম্ভ বিদারি ভুঞ্জএ মৃগপতি।--আলাওল)--সেই সিংহ এখন হস্তীকে মস্তকে ধারণ করেছে দেখে কবির কৌতূহল।

জায়সী সিংহের (কটিদেশের) উপর একজোড়া হস্তীকুম্ভ (স্তনযুগল) তার উপর সর্পের অঙ্কুশ (বেণী) এবং ময়ূররূপী মাহুত (কন্ঠ) প্রত্যক্ষ ক'রে মুগ্ধ বিস্ময় বোধ করেন--

সিংঘ-লঙ্ক কুম্ভস্থল জোরা।
আঁকুস নাগ মহাউত মোরা।।

পয়োধরকে গজমস্তকরূপে কল্পনা করার পর কবির মনে হয়েছে গজমস্তকে গজমুক্তা জন্মায়---তাই রমণীর কণ্ঠস্থিত মুক্তাহারকে কুচশিরে সংস্থাপন করেন কবি---

কুচযুগ গজকুম্ভ হার গজমোতি।
তথা হোন্তে এথা আসি করিল বসতি।।
(দোনা গাজী)

গজমুক্তাকে শিরোদেশে নিয়ে হাতী লোফালুফি করছে---এমন দৃশ্যও কল্পনা করেন কোন কবি---যখন তিনি দেখেন সুন্দরীর আন্দোলিত মুক্তাহার পয়োধরের সঙ্গে ক্রীড়াশীল---

গজমুক্তা হার তার অধঃত নামিয়া।
ঢুলনী খেলাএ সুখে গজকুম্ভ দিয়া।।
(দোনা গাজী)

স্তন যেন একজোড়া চঞ্চল হরিণ। বাঁধা পড়েছে আঁচলের মমতায়। যে রমণীর 'বিলম্বিত আঙুলের মোহে অস্থির প্রেমের ঘনশ্বাস ফুঁসে যায়, যার 'স্তনের হরিণে ঝলসায় দ্বৈত সূর্যের সুতীক্ষ্ম মুখ', যার 'সুপেলব কটিদেশ চূড়ান্ত পর্বতখাড়ি,' 'প্রখর জানুতে সারাক্ষণ দ্বৈরথের তীব্র উত্তেজনা,' কবি তার আগমন-অপেক্ষায়—

বিলম্বিত আঙুলের মোহে অস্থির প্রেমের ঘনশ্বাস
ফুঁসে যায়, স্তনের হরিণে ঝলসায় দ্বৈত সূর্যের সুতীক্ষ্ম মুখ।[১]
(হাসান হাফিজুর রহমান)

---

১. 'উল্কার ছারখারে'

রমণীর বক্ষস্থিত সোনালি রোমরাজি যেন রাশিকৃত শোশন্ পুষ্প। স্তন যেন এই শোশন্ক্ষেত্রে বিচরণশীল এবং শোশন্ভক্ষনকারী যমজ হরিণ বৎস—

১. "হে আমার প্রিয়ে তুমি সুন্দরী ও তুমি পরম সুন্দরী, ঘোমটার মধ্যে তোমার চক্ষু কপোতের চক্ষুর ন্যায়, এবং গিলিয়দের পার্শ্বে চরে এমত ছাগপালের ন্যায় তোমার কেশ।. . . এবং শোশন্ পুষ্পের মধ্যে ভক্ষনকারী মৃগের দুই যমজ বৎসের ন্যায় তোমার দুই স্তন. . ."[১]

(প্রাচীন কবি রচিত বাইবেল)

২. "- - - - - এবং তোমার নাভিদেশ মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক গোলপাত্রের ন্যায় এবং তোমার উদর শোশন পুষ্পবেষ্টিত গোধূমরাশির ন্যায়। এবং তোমার স্তনদ্বয় যুগল হরিণ বৎসের ন্যায়।"[২] (প্রাচীন কবি রচিত বাইবেল)

পক্ষীকুল থেকে উপমান হ'য়ে এসেছে চক্রবাক, পারাবত, সারস এবং মরাল। মধ্যযুগের কবিরা যখন পয়োধরকে চক্রবাকের উপমেয় করেন তখন মনে হয় দুটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ইষদোষ্ণ নরম পাখি গুটিসুটি ব'সে আছে বক্ষের কোমল আশ্রয়ে---

অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল।

(বড়ু চণ্ডীদাস)

কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোচযুগলা।

(বড়ু চণ্ডীদাস)

কুচযুগ চারু চকেবা।

(বিদ্যাপতি)

এই 'অপুরুব' চক্রবাকযুগল মুখচন্দ্রের লোভে উড়ে যাবার জন্য ব্যগ্র। তাই তাদের ভূজপাশে বেঁধে রাখা হয়েছে---

কুচযুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলিঅ আনি কোন দেবা।।
তেঁ সঙ্কাএ ভুজপাসে।
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত আকাসে।।

(বিদ্যাপতি)

১-২. রঙ্গলালের প্রবন্ধ থেকে

আলাওল অবশ্য বিপরীত কথা বলেন। তিনি বলেন ঐ চাঁদকেই তো চক্রবাকদম্পতির ভয়। রাত্রিতে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়েই চক্রবাক দুটি অখণ্ড-মিলনে লুকিয়ে রয়েছে বক্ষপ্রদেশে—

চক্রবাক যুগ নিশি বিচ্ছেদের ডরে।
অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরঃসরে।।

কৃষ্ণের রূপানুরাগের পদে বিদ্যাপতি চমৎকার এক স্বপ্নছবি এঁকেছেন। সুরপুর থেকে এক অনিন্দ্য রূপসী কৃষ্ণের আচ্ছন্ন নয়নের সম্মুখ হ'তে পৃথিবীতে নেমে গজেন্দ্রগমনে চলছে—তার বুকে মুক্তাহার দুলছে। মুক্তাহার যেন গঙ্গার ধারা—কুচচক্রবাক দুটি যেন সেই গঙ্গার ধারে চরছে। চলার বেগে বক্ষের উচ্ছ্বাস ঐ বিহঙ্গ উপমান ছাড়া অন্য কিছুতে যেন অত সুন্দর ফুটে উঠতোনা।

কবি জগজ্জীবন ব্যতিরেক অলংকার ব্যবহার ক'রে বলেন বেহুলার সুগঠিত পয়োধর অপরূপ চকোরের সৌন্দর্যকেও হার মানায়—'জিনিঞা চকোরবর দেখি দুটি পয়োধর।'

ধরিত্রীকামিনীর পয়োধরকে অসংখ্য চক্রবাক-মিথুন সদৃশ দেখেন যতীন্দ্র মোহন বাগচী—

বক্ষ জুড়িয়া চক্রবাকের বক্রপাটল মিথুন মেলা।

কবিরা যে কুচযুগলকে প্রায়শঃই চক্রবাকমিথুন ব'লে কল্পনা করেন, তার একটা সঙ্গত কারণ আছে। কালিদাস তাঁর 'শৃঙ্গারতিলকম্'এ বলেন—

বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্য-লীলাজলং শ্রোণীতীর্থশিলা চ নেত্র-শফরং ধম্মিল্ল-শৈবালকম্।

কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাক-যুগলং কন্দর্পবাণানলৈর্দ্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্মিতম।

("কন্দর্প-শরানলে দগ্ধ পুরুষের অবগাহনের জন্য বিধাতা একটি রমণীয় সরোবর নির্মাণ করিয়াছেন। সে সরোবরে কান্তার দুই বাহু মৃণাল, মুখ কমল, লাবণ্যলীলা জল, শ্রোণী অবতরণের সোপান, নেত্র শফরী, কেশপাশ শৈবাল এবং স্তনযুগল চক্রবাক-মিথুন।")

চকোরের উড়ু উড়ু ভঙ্গি, মন্থর বিচরণ দৃষ্টিসুখ জাগায়---তাই দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে তার আবেদন প্রবল। কোমলকবোষ্ণ পারাবতও কম দৃষ্টিনন্দিত নয়, তবে স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাছে এই পক্ষীর আবেদন অমোঘ। পাবলো নেরুদা কোনো এক সুন্দরীকে যখন 'ও মেয়ে, গোলাপবনের মেয়ে' ব'লে ডাকেন, তখন তার বক্ষে স্পর্শের কবোষ্ণ সুখ সন্ধান করেন—

ও মেয়ে, গোলাপবনের মেয়ে, উষ্ণ কোমল পারাবতের বুক[১]
(অনুবাদঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

কবি শামসুর রাহমানের চোখে এই কপোত শুভ্র-পবিত্র এবং শান্তিময়---

১) -----দেখি সেই মুখ, সেই স্তন,
পবিত্র কপোতদ্বয়[২]

২) যখন তুমি . . . . . .
. . . .
মুক্ত করো যমজ পায়রাকে
শান্তি পাই[৩]

চক্রবাক, পারাবতের পাশে সারসকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন কবি জসীম-উদ্দীন। হরিদ্রাপেষণরতা হলুদবরণী কন্যার আন্দোলিত কুচদ্বয় তাঁর চোখে শাড়ীসরসীতে কখনো ডুবন্ত কখনো ভাসমান সারসীযুগল---

মর্দ্দিত দুটি যুগল সারসী শাড়ী সরসীর নীরে,
ডুবিতে ভাসিতে পুষ্পধনুরে স্মরিতেছে ঘুরে ফিরে।[৪]

ভিনদেশী এক কবি সমুদ্রোত্থিত জলপরীর কুচদ্বয়ে মরালের ডানার জলগন্ধ এবং শুভ্রতা লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত, বাক্‌রুদ্ধ—

সেখানে দেখলাম অনন্য এক জলপরী।
রুদ্ধশ্বাসে আমি লুকিয়ে রইলাম জলপাইয়ের ঘনঝোপের আড়ালে
দেখলাম রক্তগোলাপের মতো প্রবাল-সমুদ্র বেয়ে উঠে আসছে এক অর্ধমানবী
জল চলকে উঠছে তার মরাল-শুভ্র স্তনে
আর ফেনার মালাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে তার দীঘল কালো বেণীতে।[৫]
(পুশকিন)

---

১. 'গাথা ও বিলাপ' ২. 'স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের মতো' [কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি]
৩. 'শান্তি পাই' [আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি] ৪. 'হলুদ বাঁটিছে মেয়ে' ৫. [পুশকিনের রচনা সংকলন]

পাখিপ্রসঙ্গ উঠলো যখন, এই সুযোগে পাখির ডিমটিকে, পালকটিকেও উপমানরূপে দেখে নিই। পাখির ডিম স্তনের একটি শোভন উপমান। গোলাকার অথচ ইষৎ লম্বাটে চমৎকার গঠনের শ্বেতবর্ণ ডিমদুটিকে পয়োধর কল্পনা করা সত্যই এক আশ্চর্য অনুভব। প্রিয়তমা মরুভূমি---কিন্তু উটপাখির যুগল ডিমের লাস্যে খিলখিল মরুভূমি–

উটপাখির যুগল ডিমের লাস্যে খিলখিল মরুভুমি তুমি।[১]
(আবুল হাসান)

উটপাখী তার ডিমজোড়া কি লুকিয়েছে ঐ বুকে?[২]
(মোহিতলাল মজুমদার)

বকের পাখা যেমন শাদা, তেমনি শাদা আরশিতে বিম্বিত প্রিয়তমার বাঁকা-রেখা-বুক--

আরশির বুকে বাঁকা-রেখা-বুক--বকের পাখা[৩] (বুদ্ধদেব বসু)

রমণকামী প্রিয়ার কম্পমান বক্ষকে কোনো কবি দেখেছেন ক্রুদ্ধ পক্ষীর পক্ষ-সঞ্চালনের মতো---

একটি ক্রুদ্ধ পাখীর পক্ষ-সঞ্চালনের মতো
তোমার বক্ষ কম্পমান,
আমি তখন সূর্য হয়ে
তোমার আতপ্ত দেহে আগুন জ্বেলেছি।[৪]
(সৈয়দ আলী আহসান)

গর্ভিনী রমণীর কুচচক্রকে পদ্মকোষে উপবিষ্ট ভ্রমর মনে করা এক রমণীয় ভাবনা। 'রঘুবংশে' কালিদাস গর্ভিনী রাণী সুদক্ষিণার কুচদ্বয়কে ঠিক এমনিভাবেই চিত্রিত করেছিলেন। সুদক্ষিনার গর্ভসঞ্চারকালে তাঁর কুচদ্বয় 'নিতান্তপীবরং আনীলমুখম্' হ'য়ে উঠেছিল, যেন পদ্মকোষে ভ্রমর উপবিষ্ট হয়েছে।

কবি আবুল হাসানও মনে করেন কুচাগ্রে দুটি ভ্রমর নীরব বসে আছে---

বোন তার বেণী খুলছে, যৌবনের অসহায় রোদে মুখ নত ক'রে
বুকের ভ্রমর হাতে রাখছে লুকিয়ে[৫]---

১. 'তুমি' ২. [কবিতা] মীনাক্ষী দত্ত সংকলিত/বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
৩. 'আরশি' [কঙ্কাবতী] ৪. 'তোমার দেহে আগুন' ৫. 'অসভ্য দর্শন'

দেখা গেল, পতঙ্গকুল থেকে কুচের উপমান হয়েছে ভ্রমর।

এখন আমরা দেখবো মৎস্য উপমানটিকে। রমণীর বুকের জালে জোড়ামাছকে বন্দী থাকতে দেখেছেন চিলির কবি পাবলো নেরুদা--

ও মেয়ে, গোলাপবনের মেয়ে, উষ্ণ কোমল পারাবতের বুক;
বুকে বন্দী মাছ,[১]

(অনুবাদঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

এমন অনেক কবি আছেন, যাঁরা নরম-কোমল পাখি নয়, নিষ্পাপ-নিরীহ মাছ নয় বরং হিংস্র ভয়াল সর্পের সঙ্গে স্তনের তুলনা করেন। স্তন শুধুই কমল নয়, কালনাগিনীভরা কমল--'উরঁ লূর সামরি বেণী/কমল কোস জনি কারি নগিনী'---(বিদ্যাপতি)।

পয়োধর তো শুধুমাত্র দুই টুকরো কোমল স্নিগ্ধতা নয়---তার দংশন আছে। বিদ্যাপতি কৃষ্ণবেণীর দ্বারা সেই দংশনক্রিয়াটি সারেন। রাণী কেকয়ী যখন আক্ষেপ ক'রে রাজা দশরথকে বলেন--

সে কটি, হায়, করপদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু দেব! নম্র শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ![২]--তখন বোঝা যায় একদা যৌবনে তাঁর কুচদ্বয়

আশ্চর্য ঔদ্ধত্যে উত্তোলিত সাপের ফণার মত সু-উন্নত ছিল---এখন সময়-শিকড়ের স্পর্শে সে ফণা নম্র হ'য়ে এসেছে। সাপের ফণার উল্লেখ না থাকলেও সেই ছবিটিই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার একটু আগেই মধুসূদন সিংহের কটির সঙ্গে কেকয়ীর কটির তুলনা দিলেন যখন, তখন তার স্তনকে সাপের উদ্যতফণা কল্পনা করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। বোদ্‌লেয়ার যেমন জঙ্ঘাকে দুটি ডাকিনী কল্পনা করেছিলেন--যাদের আন্দোলনে তীব্র কাম উদ্‌গীর্ণ হয়---তেমনি রমণক্রিয়াকে উত্তেজক ক'রে তোলার জন্য কুচদ্বয়কে

---

১. 'গাথা ও বিলাপ'
২. 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' [বীরাঙ্গনা কাব্য]

বিষাক্ত সাপের মত উদ্যতফণা ক'রে তুলেছেন আল মাহমুদ। সেই ফণাধারী নাগিনীদ্বয়কে সাহস ক'রে স্পর্শ ও আঘাত করতে বলেছে নারী---যাতে তার প্রিয়তম ছোবলে ছোবলে দংশিত হ'তে হ'তেও ঘেমে নেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে—

নটির মুদ্রার মত মন আর স্তন
অশ্লীল আরব্ধ বিষ তুলেছে ফণায়;
সাহসে আঘাতে স্পর্শে তোমার রমণ
শেষ করো। ঘামে কামে পরিতৃপ্ততায়।[১]

সাপ শুধু ছোবল তুলেই ক্ষান্ত হয়নি, ভয়ংকর মুখ ব্যাদানও করেছে, বেরিয়ে পড়েছে তার ক্রোধরক্তিম দাঁত--

তরুণীর দুধ ধবধবে বুকে সাপিনীর দাঁত উঠেছে রেঙে।[২]
(জীবনানন্দ দাশ)

তবুও কবি সুদক্ষ সাঁপুড়ের মত সাপ খেলতে ভালোবাসেন; কেননা সাপের ঐ চিত্রিত ছোবল আর ভয়ানক বিষবর্ষী দাঁতে আঘাত হানায় আছে অপার আনন্দ। সাপখেলার এই আনন্দ যেন গহন অরণ্যে অব্যর্থ তীরের ঘায়ে দুর্বিনীত শিকারকে ধরাশায়ী করার আনন্দতুল্য—

ধরিল বানুর কুচে প্রেমরঙ্গ রসে।
শাহাজাদী রসমুখী মুচকিয়া হাসে।।
. . . .
শাহাজাদা বানু দোন রসে মেলামেলি।।
. . . .
তীরেতে শিকার পাইল যেন রে শিকারী।।
(মালে মুহম্মদ)

কুচসর্পকে নিয়ে খেলতে রসিকের কি আনন্দ, সেকথা রমণীমোহন কৃষ্ণের মুখ থেকে শোনা যাক। রাধা যখন বলেছিল, "আহ্মার যৌবন[৩] কাল ভুজঙ্গম/

---

১. 'সাহসে আঘাতে স্পর্শে'

২- 'চাঁদিনীতে'

৩ 'যৌবন' শব্দটি এখানে অর্থসঙ্কোচে স্তনকে ধরা যেতে পারে।

ছুঁইলে খাইলে মরঁী।"[১]--তখন নাগরনারায়ণ কৃষ্ণের উত্তর, "তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম/আহ্মেহো ভাল গারুড়ী।"[২] বোঝা গেল রাধার কুচদ্বয় কালসর্প হ'তে পারে কিন্তু কৃষ্ণও উত্তম গরুড়।

সাপের সঙ্গে তো বটেই, সাপের মাথার মনিটির সঙ্গেও স্তন বহুবার তুলিত হয়েছে। দ্যুতিবিকীর্ণ মানিক দুটির লাবণ্যদর্শনে বিমোহিত কবি জ্ঞানদাস---

হিয়ার মাঝারে মানিক ছিরি।

রাত্রির ঘনান্ধকারে সুগৌর স্তনকে মনির মত বিকীরিত মনে হওয়া এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। প্রেয়সীর শরীরে কোমলে কঠিনে রম্য সেই দ্যুতিময় দুটি দুর্মূল্য মনির সন্ধান পেয়ে কবি ধন্য--

তোমার শরীরে গাঢ় আবর্ত, যুগল মনি
কোমলে কঠিনে রম্য[৩]
(ফজল শাহাবুদ্দীন)

মুঠিপরিমাণ গৌরোজ্জ্বল স্তন দ্যুতিবিচ্ছুরিত মনির মতই দুর্লভ মনে হয় কবির—

দুর্লভ মনির মতো স্তন
ঘন হ'লো বাসনার তাপে[৪]
(শামসুর রাহমান)

বিদ্যাপতির চোখে কুচ হচ্ছে অত্যুজ্জ্বল বিভাবিমণ্ডিত লাবণ্যনিটোল দুটি রত্ন—"কাঞ্চনে গড়া সুন্দর পয়োধর নাগরের জীবনের আধার স্বরূপ। উহা রত্নের মতন।"[৫]

দোনাগাজীর চোখে স্তন আশ্চর্য দুটি গজমুক্তা। আশ্চর্য এই কারণে যে, হাতীর কপালে একটি গজমুক্তা থাকে, এক জোড়া নয়—

কথা হেন দুই দ্রব্য গজের কপালে।

অনেক অনুসন্ধানের পর হারানো ধন পুনরায় পাবার যে আনন্দ, কুচ-স্পর্শের আনন্দ যেন তেমনই---

---

১-২. [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন] বড়ু চণ্ডীদাস
৩. [তৃষ্ণার অগ্নিতে একা]
৪. ['সুন্দরের গাথা']
৫. ৩৪৩

শরম ত্যাগিয়া ধরে বুকে বুকে কসি।।

. . . .

জড়াজড়ি ঘেঁসাঘেঁসি ছিঁড়িল কাঞ্চলি।
শাহাজাদা বানু দোন রসে মিলামিলি।।

. . . .

হারাধন পাইল যেন অনেক বিচারি।

(মালে মুহম্মদ)

তুচ্ছ কুঁচফলের পরিবর্তে যদি বহুমূল্যবান লাল জহরত পাওয়া যায়, তাহলে যে আনন্দ, এ আনন্দকে তার সঙ্গেও পরিমাপ করা যায়---

স্তন কুইচ বদলে পাইল লাল জোয়াহের।

(মালে মুহম্মদ)

কোন কবি মুদ্রা উপমানটিকে মনোনয়ন দেন। বিশ্বসুন্দরীদের স্তন তরুণ কবি আবিদ আজাদের চোখে স্বর্ণমুদ্রার মত সুদীপ্ত—

সারি সারি হিল্লোলিত . . . সোনালি টাকা।[১]

স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ইত্যাদি ধাতু উপমানগুলোকে এবার চয়ন করা যাক। শ্রীকবিরঞ্জনের চোখে গৌরাঙ্গী রাধার আঁচলের তলায় যেন উজ্জ্বল স্বর্ণ লুক্কায়িত--

গোরি কলেবর নূনা।
জনু আঁচরে উজোর সোনা।।

তরুণ কবি হুমায়ুন আজাদ এক রৌপ্যাময়ী নারী কল্পনা করেন, যার স্তন রৌপ্যনির্মিত—

দক্ষিণ দিগন্তে ঘষে ঠোঁট, ঠেকিয়ে ধাতব স্তনরেখা
সামনে দাঁড়ায় নগ্ন, দীপ্র কুমারী রৌপ্যের এক নারী।'[২]

স্তনে যে যৌবনদাহ, তাকে তপ্ত লৌহ মনে করেন আবুল হাসান---

যুবতীর স্তনের ভিতরে যে লাবণ্যের লোহা টলটল করে
তার চেয়ে হলুদ গন্ধকের আর লোহার তপ্ত দ্রবণজাত জ্বালা
বুকের কোষে কোষে আমারও শিরা উপশিরায় এক গুচ্ছ
অন্ধকারের মতো জমে আছে;[৩]

১. 'টাকা চাই' ২. 'স্বরাষ্ট্র' ৩. 'অসুখ'।

উক্ত উদ্ধৃতিতে হলুদ গন্ধককেও পাওয়া যাচ্ছে। কুচদ্বয়ে হলুদ স্ফটিকও দেখেন কেউ কেউ--

সাফ করো তোমার বুকের সেই খুব গাঢ় প্রেম-দ্বীপ, হলুদ স্ফটিক আর
কস্তুরী-সুবাস-যুক্ত 'গঙ্গো'র পাহাড়,[১]
(লিওপোল্ড সেঙ্ঘর/অনুবাদঃ মুহম্মদ নূরুল হুদা)

কাঁচ ভঙ্গুর হ'লেও বরফস্বচ্ছ এবং সুন্দর। তাই কাঁচও স্তনের উপমান হ'য়ে এসেছে, তবে এসেছে সোনার সঙ্গে মিলে অপূর্বরূপে---

কাঁচলি কঠিন করে কাঁচসোনা কুচে।
(মানিকরাম গাঙ্গুলি)

কুচদ্বয়কে কেউ কেউ তাজা, কাঁচা, সুচারু পাতার মত দেখেন—

কৃষাণ বধূর বুকখানি যেন লাউয়ের লতায় পাতা।[২]
(জসীমউদ্দীন)

বয়ঃসন্ধিকালে কচিস্তনের উদ্‌গমকে বিদ্যাপতি নবীন, সবুজ অঙ্কুরের উদ্‌গমের মত দেখেন—

কিছু কিছু উতপতি---অংকুর ভেল।

'অংকুর' উপমানটিকে অতি-আধুনিক কালের কবিতাতেও পাওয়া যায়---

মলমলের ওড়নার মধ্যে . . . তোমার অংকুরোদগম[৩]
(ফরহাদ মজহার)

স্তন যেন রক্তগোলাপের কুণ্ডলায়িত লতা---লালে-সবুজে-সৌরভে-কোমলতায়-ভালোলাগায় মেশামেশি একটি বনজ অনুভব--

ও মেয়ে, গোলাপবনের মেয়ে, উষ্ণ কোমল পারাবতের বুক,
বুকে বন্দী মাছ, গোলাপলতা[৪] (পাবলো নেরুদা)

কোনো এক আধুনিক কবির চোখে পয়োধর হচ্ছে দুই গুচ্ছ মায়াবী

---

১. 'কঙ্গো' [আফ্রিকার কবিতা/সেনেগাল]
২. 'রাখালের রাজগী' [ধানখেত]
৩. 'আমাদের ভালোবাসা, মেহেরজান' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]
৪. 'গাথা ও বিলাপ'

ঝোপ এবং সেই ঝোপের চূড়ায় দীপ্ত জোনাকি কবির দৃষ্টি---

সদ্য স্তন ওঠা মেয়েদের খোঁজে চোখ
অন্ধকারে ঝোপেয় চূড়ায় দীপ্ত জোনাকির মতো...[১]

(আবু হেনা মোস্তফা কামাল)

কোনো কবি রমণীবক্ষে অরণ্যের রহস্যকে কম্পমান দেখতে থাকেন--

ঝুড়িতে সব্জি নিয়ে হেঁটে আসে চাকমা কিশোরী
বিচিত্র কাপড়ে বাঁধা ঘামে-ভেজা উপচানো বুকে
বনের রহস্য কাঁপে যেন।[২]

(আল মাহমুদ)

আগুনের শিখার মতো উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য বসন্তঋতুকে রমণীবক্ষে প্রত্যক্ষ করেন কোনো কবি—

তোমার বক্ষে যে বসন্ত আগুনের মতো[৩]

(সৈয়দ আলী আহসান)

রমণীবক্ষের ঐ জ্বলন্ত আগুনের মত ফাগুনে কবি ভ্রমরমরণ কামনা করেন—

শুভ্র বুকের 'পরে
ফাগুন গুমরি' মরে,
সেখানে ভ্রমর-মরণ মোরে
মরিতে দাও।[৪]

(বুদ্ধদেব বসু)

রমণীবক্ষ কারও চোখে চাঁদনীরাতের মত জ্যোৎস্নাস্নাত, আবার কারও চোখে অমারজনীর মত তমসাচ্ছন্ন--

অনন্য এক আশ্চর্য অলৌকিকে উদ্ভাসিত পরিপ্লাবী জ্যোৎস্না-পুলকিত
ফুল্ল কুসুমিত রহস্যময় রাত্রির মতো তোমার যুগল মাতৃবক্ষবৃত্ত
কী গভীর স্নিগ্ধতায় লাবণ্যে উন্মোচিত হ'য়ে আছে অনেকটাই।[৫]

(নচিকেতা ভরদ্বাজ)

---

১. [আপন যৌবন বৈরী] ২. 'অরণ্যে ক্লান্তির দিন' [সোনালি কাবিন] ৩. '৮১' [উচচারণ] ৪. 'কোনো বিদেশিনীর প্রতি' [কঙ্কাবতী] ৫. 'অনা রূপকল্পে উপাসনা'।

কখনো নিকটে নও, তবু তুমি রাত্রির মতন
অনেক নিবিড় যেন—স্পর্শ নেই, স্বাদ তবু আছে
বক্ষেয় বৃন্তের ছায়া প্রহরকে করেছে গভীর,
কোথায় সমুদ্রপ্রান্ত--অন্ধকারে হারায়েছি দিক[১]

(সৈয়দ আলী আহসান)

আর একজন কবি খোঁজেন প্রেয়সীর বুকে নীড়ের নিভৃত শান্তি, তিনি জীবনানন্দ দাশ--

পাখির মতন কেঁপে—ডানা মেলে—হিম চোখ বুঁজে
অধীর পাতার মতো পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কতোদিকে গিয়েছে সে ভেসে,—
নীড়েয় মতন বুকে একবার তার মুখ গুঁজে
ঘুমাতে চেয়েছে,—তবু ব্যথা পেয়ে গেছে ফেঁসে--,
তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁট উঠেছিলো হেসে।[২]

রমণীবক্ষকে মধুমদির স্থনিবিড় মধুচক্র মনে হয়েছে নবীনচন্দ্র সেনের—

স্বভদ্রার বক্ষ শান্তি শতদল
প্রেম-মধুচক্র বক্ষ শৈলজার।[৩]

কুচদ্বয়কে ক্ষেত্ররূপে লক্ষ্য করেছেন কেউ—যেন এই ক্ষেত্রে প্রীতি বপন করা যাবে—

যে হাত যুগল স্তনে . . .
. . . খোঁজে ক্ষেত্র প্রীতি কর্ষণের[৪],

(শামসুর রাহমান)

সবুজ দুর্বাধানে ছাওয়া মৃত্তিকাকে কেউ কেউ পয়োধর কল্পনা করেছেন—
মৃত্যুর অঙ্গার মাখি স্তন তার বারবার ভিজা রসে উঠিয়াছে ভরি'।
উঠিয়াছে দুর্বাধানে শোভি,'[৫]

(জীবনানন্দ দাশ)

---

১. 'তোমার দেহের তীরে' [অনেক আকাশ]
২. 'অনেক আকাশ'
৩. ['প্রভাস' (ত্রয়ীকাব্য)]
৪. 'সেই হাত'
৫. 'সেদিন এ ধরণীর' [ঝরা পালক]

মাটির বাঁটের চুমা শিহরি উঠিল মোর ঠোঁটে,— রোমপুটে![1]
(জীবনানন্দ দাশ)

কুচবৃন্তের আশ্রয়কে মৃত্তিকার আশ্রয়ের মতই তৃপ্তিদায়ক মনে হয় কবির—

তখন বৃন্তের ছায়া
মৃত্তিকার আশ্রয়ের মতো—
মৃণাল-সময় ছুঁয়ে
যেন এক অন্ধ ইশারায়
সৃষ্টির প্রথম সত্যে
দৃষ্টিময় সমস্ত উত্তাপ।[2]
(সৈয়দ আলী আহসান)

পয়োধরকে কেউ কেউ আকাশরূপেও কল্পনা করেছেন। হারের মতি-নক্ষত্র এবং নখচন্দ্রকে সংস্থাপনের জন্য উপমানটি বেশ সুবিধাজনক—

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে
মৃগমদরুচিরূষিতে।
মনিসরমমলং তারক পটলং
নখপদশশিভূষিতে।। (জয়দেব)

মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতীহার।।
তাত তিখ নখরেখ চান্দের আকার।
দেখিআঁ সরসচিত্ত মজিল আহ্মার।।
(বড়ু চণ্ডীদাস)

নখ-ক্ষত ঐ শশী
নভ-উরসে।[3] (নজরুল)

অতি-আধুনিক কবির চোখেও পয়োধর আকাশ---আকাশে কাজলতিলক বৃন্তদ্বয়, জেগে-থাকা দুটি চোখ--

১. 'সেদিন এ ধরণীর'
২. 'ব্যঞ্জনা'
৩. 'মাধবী-প্রলাপ' [সিন্ধু-হিন্দোল]

হৃদয়-আকাশে দুইটি নয়ন
তিলকাঞ্চন উজ্জীবন,
করাঙ্গুলীর রেখা-বিন্যাসে
তরঙ্গাকাশে সঞ্চরণ।[১]
(সৈয়দ আলী আহসান)

স্তনকে গ্রহরূপে দেখেছেন শেক্সপীয়র। তাঁর চোখে স্তন ভূগোলকের মত—"কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উক্ত মহাকবি (শেক্সপীয়র) স্বীয় উক্তিতে লুক্রিশিয়ার পয়োধরের সহিত দন্তিদন্তনির্মিত যুগল ভূগোলের তুলনা করিয়া যদ্যপি নিস্তার পান, তবে অভাগা ভারতচন্দ্র কিজন্য এত গালাগালি খান!"
(রঙ্গলাল)

গোলাকৃতি, ঔজ্জ্বল্য এবং সোনালি লাবণ্যের জন্য চন্দ্র এবং সূর্য রূপপ্রিয় কবিদের অন্যতম প্রিয় উপমান। বৈষ্ণব কবির চোখে বসনাবৃত রাধার স্তন যেন মেঘাবৃত চন্দ্র—

দামিনী বেঢল চাঁদনি বেলি।

ফকির গরীবুল্লাহ্ও বলেন, জোলেখার চন্দ্র সুর্যের মত বিভাসিত স্তনদ্বয় কাঁচুলিমেঘে আবৃত—

বুকের কাঁচলি যেন করে ঝিকিমিকি।
চন্দ্র সূর্য মেঘে যেন হ'য়ে যায় লুকি॥

ঈশ্বরগুপ্ত বলেন, রূপসীর পয়োধরশোভা দর্শনে চন্দ্র লজ্জিত হয়—

বড় ধূম বড় ঘরে সাটিন কাঁচুলি করে
চুমকির কাজ তার মাঝে।
পয়োধরে মনোলোভা অনঙ্গের অঙ্গশোভা
হেরি শশি শশধরে লাজে॥[২]

দিনেশ দাশের চোখে চাঁদ যেন গোল দুধের বাটিটি—সেই দুধেভরা বাটি দ্'দুবার উপুড় হ'য়ে পড়েছে প্রিয়ার বক্ষে—

১. 'যেখানেই তুমি' [সহসা সচকিত]
২. 'শরদ্বর্ণন'

চাঁদ দিল গোল দুধের বাটিটি
দু'দুবার উপুড় ক'রে তোমার বুকে।[১]

কঙ্কাবতীর 'সংগীত-সম শরীরে' বিদ্যুৎ-ভরা চোখের আভা, তরঙ্গের মত চুল দেখেন বুদ্ধদেব বসু—বক্ষোদেশে দেখেন পূর্ণিমা-চাঁদ—

পূর্ণিমা চাঁদ বুকের পরে।[২]

রমণীবক্ষে এক চন্দ্র নয়, বরং কোটি চন্দ্রের প্রভা লক্ষ্য করেন বিহারীলাল—

কিবে কোটি চন্দ্রপ্রভা
যুবকের মনোলোভা ॥

স্তন যখন চোখে মোহের জ্যোৎস্না এনে দেয়, তখন উল্লিখিত না হ'লেও বুঝতে হবে, চাঁদই হচ্ছে তার উপমান। পরীর আশ্চর্য স্তন চাঁদের মতই জ্যোৎস্নাধবল, মোহের কিরণ-বিকীরিত এবং মায়াময়—

কখনো শুনিনি পার্কে ব'সে হরিণের ডাক কিবা
পরীর আশ্চর্য স্তন আনেনি মোহের জ্যোৎস্না চোখে,[৩]
(শামসুর রাহমান)

আধুনিক আর একজন কবি অঙ্গুলিপরশরিক্ত কুমারীর স্তনকে কলঙ্কহীন চাঁদের সাথে তুলনা ক'রে আনন্দ পান—

সেখানে আমি কলঙ্ক না-পড়া চাঁদের মতো
অঙ্গুলিপরশরিক্ত কুমারীর স্তনের মতো।[৪]
(আবদুল মান্নান সৈয়দ)

কুচদ্বয়ে সূর্যের চেয়েও চোখধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করেছেন নওয়াজিস খান খোন্দকার—

সুবর্ণের স্তনে জিনি বালার্ক চারু।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় দেখি করতলে সূর্যতাপের অনুভূতির কথা—

---

১. 'তোমাকে যদি হারাই' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]
২. 'রূপকথা' [কঙ্কাবতী]
৩. 'আত্মজৈবনিক'
৪. [ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ']

দু'মুঠোয় আগুন নিলাম
অথবা সূর্য যেন[১]

আবুল হাসানের কবিতায় দেখি স্তনকে সূর্য কল্পনা ক'রে কামুক পুরুষ কামমেঘে তাকে আবৃত করতে চায়—

একটু স্পর্শ করলে তোমার স্তনসূর্যে সুন্দরের মতো
লাফিয়ে লাফিয়ে নীল কটিদেশে

আমার আদিম শ্যাওলা যৌনতাকাতর ক'রে দিতে পারে মেঘে;[২] বিদেশী কবির একটি উপমা চয়ন ক'রে চন্দ্র সূর্য প্রসঙ্গের এবার ইতি টানবো। ফরাসী কবি লেকঁৎ দে লিল সূর্যকে প্রকৃতি-রমণীর স্তনরূপে কল্পনা করেছেন। কোনো এক গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে গম আর সর্ষে ক্ষেতে সোনার সাগর রচিত হয়েছে। এই স্বর্ণালী শস্যেরা সুপ্তিকে অবহেলা ক'রে পরম সুখে নির্ভয়ে তপনের অবিশ্রান্ত কিরণ পান করছে, মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু যেমনভাবে পীযুষধারা পান করে—

Seuls, les grands blés mûris, tels qu'une mer dorée,
Se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil;
Pacifiques enfants de la terre sacrée,
Ils épuisent sans peur la coupe du soleil.[৩]
(Leconte de Lisle)

এবার স্তনপ্রসঙ্গে নক্ষত্রের কথা বলেন কারা দেখা যাক। উর্বশীর স্তনহার থেকে নক্ষত্র খ'সে পড়ে পৃথিবীর পুরুষচিত্তগুলোকে করে তোলে বাসনাউন্মুখ--

তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি পড়ে তারা--
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।[৪]
(রবীন্দ্রনাথ)

---

১. 'এক মুঠো' [একক সন্ধ্যায় বসন্ত]
২. 'সমুদ্র স্নান' [পৃথক পালঙ্ক]
৩. 'MIDI'
৪. 'উর্বশী' [চিত্রা]

বাসনাবিবশ কোনো কবি ঐ নীল নক্ষত্রের দিকে অপলক তাকিয়ে শিশিরের রেণু দেহে মেখে নিতে চান এবং এক বিরল নিরাবরণ মুহূর্তে তিনি এবং তাঁর প্রিয়া হ'য়ে যেতে চান অনন্ত--

তোমার বুকের দুটি তারা দেখে
শিশিরের রেণু দেহে দেহে মেখে,
নিরাবরণের একটি বিরলে
আমরা উভয়ে অনন্ত।[১]
(সৈয়দ আলী আহসান)

কোনো কবি হ'তে চান জ্বলন্ত দহমান রাতশহর—তাঁর প্রেয়সী হবেন নিশীথ-নিলীমা—যাঁর স্তন নক্ষত্রের মত প্রভাময়--

আমি হ'য়ে উঠি জ্বলন্ত দহমান রাত-শহর
তুমি চাঁদের মতো নিতম্বে
নক্ষত্রের মতো স্তন-চূড়ায় নিশীথ-নিলীমা।[২]
(আব্দুল মান্নান সৈয়দ)

কালিদাস স্তনবৃন্তকে মেঘের মত দেখেছেন, কিন্তু সমগ্র স্তনকেই মেঘ-রূপে দেখেছেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। বেহুলার স্তন তাঁর চোখে--

নবীন জলদ যেন জিনি পয়োধরে।

নবীনচন্দ্র সেনের চোখে এই মেঘখণ্ড বিদ্যুৎদীপ্ত--

নারীগর্বে পূর্ণ মুখ, পূর্ণিত পীবর বুক,
শোভিছে বিদ্যুৎদীপ্ত মেঘখণ্ড সম।[৩]

কখনো কখনো মেঘই স্তনরূপে কল্পিত হ'য়েছে। কবি কল্পনা করেছেন মেঘনিঃসৃত জলধারা যেন দুগ্ধস্রোত এবং তটিনী যেন স্তন্যপানরত সন্তান—

যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
(রবীন্দ্রনাথ)

---

১. '২' [সহসা সচকিত]
২. [ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ]
৩. [ত্রয়ী কাব্য]

পয়োধরকে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলিত ক'রে বিদ্যাপতি একটি শক্তিশালী ও মৌলিক অলংকার সৃজন করেছিলেন। স্খলিতবসনা রাধা যখন কৃষ্ণস্পর্শে নিজের অনায়ত্তা হ'য়ে পড়েছিলেন--লজ্জায় হাত দিয়ে কুচ গোপন করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, সেই সুযোগে বিদ্যাপতি এই প্রাণময় অলংকারটির জন্ম দিয়েছিলেন--"বিদ্যুৎ পড়িবার সময় ঢাঁকা যায় না।"[১] দেহের চঞ্চল শিহরণে শিহরিত কুচ হাতের বাধা তুচ্ছ ক'রে বিদ্যুতের মত সহস্র ছটায় জ্বলে উঠেছে।

পয়োধরকে আগুনরূপে কল্পনা করেছেন মানিকরাম গাঙ্গুলি--

অনঙ্গের এই ধন আগুনের কুটি।

আগুন উপমান ব্যবহার করেছেন দোনা গাজীও--

কুচযুগ রত্ন কি আনল সমধিক।

রামপ্রসাদ পয়োধরকে আগুন কল্পনা ক'রেই শুধু ক্ষান্ত হননি--কান্তকে দিয়ে হোম করিয়ে নিয়েছেন--

কান্তাকুচে জলদগ্নি বিচারিয়া কবি।
করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি।।

পয়োধরকে অগ্নিরূপে বিবেচনা করা যে কতখানি যুক্তিসঙ্গত---সে বিষয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঈশ্বরগুপ্ত। তিনি বলেন রমণীদেহে শীতলতা এবং উষ্ণতা একইসঙ্গে বিরাজমান। রমণী যেন সমুদ্র। তার আছে লাবণ্যরূপ তরঙ্গ। আর আছে নরমনদগ্ধকরা আগুনভরা নয়ন এবং অনলরূপ পয়োধর। দেহে অগ্নির উত্তাপ আছে ব'লে প্রচণ্ড শীতেও তাই রমণী সুর-তরঙ্গিনীজলে রঙ্গভরে স্নানরত হতে পারে---

শীতের শীতল বারি নাহি মানে কোন নারী
প্রাতে নেয়ে বেঁচে আসে কেন।।
সুরতরঙ্গিনীদলে সুরতরঙ্গিনী-জলে
সুখে চলে অভয় শরীর।
স্বভাবে সমুদ্রকায় লাবণ্য তরঙ্গ তায়,
কি করিবে তরঙ্গিনী নীর।।
নরমন দগ্ধ করা নয়নে আগুন ভরা

১. ৪৮৮

অনল শিখর পয়োধরে।
কোথায় শীতের বল এক ঠাঁই অগ্নিজল
ক্ষণে স্নিগ্ধ ক্ষণে দগধ করে।।[১]

স্তন যদিও আগুনের মত উত্তাপময়--তবুও প্রচণ্ড শীতের সময় এই আগুনের চেয়ে জ্বলন্ত আগুনই বেশী লোভ জাগায় ব'লে মনে করেন ঈশ্বরগুপ্ত—

যুবতীর স্তনদ্বয় তাহে কত লোভ হয়
যত লোভ জ্বলন্ত অনলে।।[২]

আগুন উপমানটি অতি-আধুনিক কবির কবিতায়ও আছে—

১) দু'মুঠোয় আগুন নিলাম[৩]
(সৈয়দ আলী আহসান)

২) কুমারীরা তাদের বুকের ওপর দিয়ে দীর্ঘবেণী দুলিয়ে দিয়েছে
যেন চাররকম অগ্নিশিখার ওপর
ঝাঁপিয়ে পড়েছে চারটি কালো সাপ।[৪]
(আল মাহমুদ)

৩) তুমি বললে, তবে আগুন দেখাও, আগুন
আমি দু'হাতে লকলকে স্তন মুঠো ক'রে বললুম,
'এই দেখ পোড়া হাত।'[৫]
(কমল চক্রবর্তী)

দু'টি সমুন্নত ভূমিতে দাউ দাউ ক'রে জ্বলা দূরদৃশ্য দুই অগ্নিশিখার মত নারীর স্তনকে দেখেছেন পাব্‌লো নেরুদা। এক সুদর্শনা নারীর পাশে শুয়ে তাঁর মনে হয় সমুদ্র-সৈকতে শুয়েছেন---'ও মেয়ের দৃষ্টি বেয়ে ঝ'রে যায় দীঘল সবুজ' এবং 'দুই বেনী' নদী হয়', আর তার স্তন দু'টি—

---

১. 'শীতের অত্যাচার'
২. 'শীত'
৩. 'এক মুঠো' [একক সন্ধ্যায় বসন্ত]
৪. 'চক্রবর্তী রাজার অট্টহাসি' [মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো]
৫. 'শ্মশান বন্ধু' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]

বিকশিত স্তন দু'টি দূরদৃশ্য দুই অগ্নিশিখা
জ্বলে দাউ দাউ—দু'টি সমুন্নত ভূমি দু-দেশের[১]
(অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

কুচদ্বয়কে দীপ কল্পনা করায় যৌক্তিকতা খুঁজে পান কোনো কোনো কবি। তাঁদের ধারনা এই দীপ পুরুষপতঙ্গ নাশের জন্য—

দুই দীপ সঞ্জোগ পতঙ্গ নাশিবার।
(দোনা গাজী)

অবশ্য এই দীপ যে সবসময় ধ্বংসাত্মক কার্যেই অংশগ্রহণ করে তা নয়---মাঝে মাঝে মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মেও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মুহূর্তে বিধবা বেহুলার সেই অদ্ভুত পূজাপর্বের কথা মনে পড়ছে-—পদ্মার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যখন বেহুলা নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তন ক'রে পদ্মাপূজা করেছিল—স্তন কর্তন ক'রে জ্বালিয়েছিল প্রদীপ---

দুই চক্ষু পদ্মফুলে পূজে সাগরের কূলে
স্তন কাটি প্রদীপ জ্বালায়।
(জগজ্জীবন)

বেহুলা মৃতস্বামীকে জীবন্ত ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্তনপ্রদীপ জ্বেলে মনসা-পূজা করেছিল—কিন্তু স্তনপ্রদীপে অনঙ্গপূজাই সচরাচর নিয়ম—

বক্ষের পরে যুগল প্রদীপ কামের পূজার তরে
জ্বলিত নিবিত আঁচল মেঘের আবরণী ছেদ ক'রে।[২]
(জসীমউদ্দীন)

আঁচল-আড়ালে প্রদীপের যে শিখা কম্পমান--সেই কম্পিত শিখা থেকে প্রিয়তমকে উত্তাপ প্রদান করে রমণী—

আঁচল সরালে যে প্রদীপ কাঁপে
তার দুটি শিখা তাপের মতো,
সে-তাপে তোমার দেহের গ্রন্থি তনু সঞ্চারে মূর্ছাহত[৩]
(সৈয়দ আলী আহসান)

---

১. 'নারী সুদর্শনা'
২. [সকিনা]
৩. '১৮' [সহসা সচকিত]

স্তন কারো চোখে স্বর্গ, কারো চোখে মন্দির, কারো চোখে গীর্জা, কারো চোখে বেদী, কারো চোখে নৈবেদ্য, কারো চোখে অর্ঘ্য। রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতায় স্নানমগ্না সেই রমণীর বক্ষচ্যুত নিচোল-বাস যেন যুগল স্বর্গের স্পর্শবঞ্চিত হ'য়ে পাষাণে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তুচ্ছ কাঁচুলির পক্ষে যৌবননিটোল ঈষৎতপ্ত স্তনের স্পর্শলগ্ন হ'য়ে থাকা স্বর্গবাস ছাড়া আর কি!----

বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।[১]

মানিকরাম গাঙ্গুলি তো ব্যাখ্যা ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, কুচস্পর্শ মানেই স্বর্গবাস—

যুগল কমল হস্ত দেয় যদি ইথে।
সুখ পাবে স্বর্গ যাবে সদ্য চেপ্যা রখে।।

রাত্রি যেন কালিমাময় নরক। সেই নরকলোকে পয়োধর দু'টিকে স্বর্গের মত আনন্দরাজ্য ক'রে রেখে দেয় রমণী তীব্র চুম্বনপ্রত্যাশায়--

কার তীব্র চুম্বনের প্রত্যাশায়
তোমার যুগল স্তন স্বর্গ হয় রাত্রির নরকে;[২]
(শামসুর রাহমান)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখেও পয়োধর পরম কাংক্ষেয় সোনালি স্বর্গভূমি—

নরম সোনালি দুই বুক যেন স্বর্গভূমি[৩]

রমণীর বক্ষস্বর্গ করতলে মোহময় উত্তাপ আনে, বলেন কবি কৃষ্ণ ধর —

তোমার বক্ষের স্বর্গ করতলে দিয়েছে উত্তাপ[৪]

বুদ্ধদেব বসুর চোখে পয়োধর স্বর্গের স্বপ্নের মত মোহনীয়---

আমার চোখে তোমার দুই বুক স্বর্গের স্বপ্নের মত।[৫]

১. 'বিজয়িনী' [চিত্রা]
২. 'জর্ণাল, শ্রাবণ'
৩. 'সুন্দরের পাশে'
৪. 'তোমার বসন্ত' [এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা]
৫. 'এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে'

তাই এই স্বর্গের ক্ষণ-অধিকার পেলে কবি ক্ষণিকের মধ্যেই থাকতে চান মগ্ন হ'য়ে, যেতে চাননা শাশ্বতের সন্ধানে--

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার,
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার;
আজি আর ফিরিবনা শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে।।[১]
(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

নারীকে যখন কামিনী (কামভাব যার সর্বাঙ্গে) নয়---বরং জননীরূপে দেখা হয়েছে, তখনই তার কুচবর্ণনায় এসেছে মন্দিরপ্রসঙ্গ। প্রথম মাতৃত্ব-লাভের পরে নতুন মা তার সদ্যোজাত সন্তানের প্রতি ঝুঁকে আছে--সেই অবস্থায় তার অবনত পয়োধরকে যতীন্দ্রমোহন বাগচী এভাবে বর্ণনা করেন--

মন্দির চূড়া অবনত হয়ে চুমিছে কি দেবতারে?

নচিকেতা ভরদ্বাজকেও দেখা যাচ্ছে নগ্নশিশু-ক্রোড়ে-উপবিষ্টা এক জননীর কুচদ্বয়কে মন্দিরচূড়া কল্পনা করতে--

খোলা জানালা থেকে ভোরের নরম রৌদ্র এসে পড়েছে তোমার
চোখে মুখে বুকে বাহুতে কোলের উপর:

নিরাভরণ তোমার শুভ্র সাচ্ছল তনুতীর্থের
সমস্ত দেবায়ত দেবমন্দিরের চত্বরে, চূড়ায় চূড়ায়
তীর্যক কার্ণিশের রূপে রেখায়।

... ...

ঐশ্বর্যময়ী রাজেন্দ্রানীর মতো, তুমি বসে আছ;

... ...

আর কোলভরা তোমার স্বাস্থ্য-সুন্দর একটি নিরাবরণ নগ্ন শিশু।[২]

নারী যখন জননী নয়--তখনও তার দেহসৌন্দর্যকে সাত্ত্বিক ভক্তের চোখে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, পরম পবিত্রতায় তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন---

---

১. 'হৈমন্তী' [অর্কেস্ট্রা]
২. 'অন্য রূপকল্পে উপাসনা'

হেরো নারীহৃদয়ের পবিত্র মন্দির।[১]

নারী যখন জননী নয়, তখনও তার বক্ষোদেশে মন্দিরের পবিত্রতা, মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্রতা লক্ষ্য করেন আরও একজন কবি—তিনি জসীমউদ্‌দীন---

কিছুদিন পরে ওই মন্দিরে অনঙ্গ নিজে পশি,
ভালবাসিবার মন্ত্র রচিবে ধ্যানের আসনে বসি।[২]

ভক্তিভরা চোখে নয়, বরং বাসনাচমকিত চোখে তাকিয়ে পয়োধরকে যখন মন্দির নাম দেওয়া হয়, তখন তার মধ্যে ছলনা থাকে। মানিনী নায়িকাকে তোষণের জন্য নায়ক যখন পয়োধরকে মন্দিরের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছে এবং ঐ মন্দিরে আশ্রয় প্রার্থনা করছে কামভ্রম ঘোচাবার জন্য---তখন কল্পনার চাতুর্য তাতে চমৎকার ফুটেছে সন্দেহ নেই---

তুয়া কুচমন্দির যেন কনকের পূর
প্রবেশ করিতে মুঞি চাহো।
লৈয়া তুয়া আশ্রম ঘুচাও কামভ্রম
অভিমত সিদ্ধি বর পাও॥
(দ্বিজ মাধব)

অথচ আশ্লেষমুহূর্তেও নারীদেহের প্রতি পবিত্রতার বোধে মেক্সিকান কবি ওক্‌তাবিয়ো পাস স্তনের সঙ্গে গীর্জার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন—

তোমার শরীর ভেদ ক'রে
আমি হেঁটে যাই, যেন হাঁটি পৃথিবী উত্তীর্ণ হ'য়ে
তোমার জঠর যেন নেয়ে ওঠে সূর্যালোকে, আর
স্তন যেন দুটি গীর্জা রক্তধর সজীব সচল
আপন রহস্য নিয়ে
তোমাকে ঘিরবে জেনো এই দৃষ্টি লতিকার মতো।,[৩]
(অনুবাদঃ শেহাবউদ্দিন আহমদ)

১. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]
২. 'কৈশর যৌবন দুহু মেলি গেল'
৩ 'সূর্যশিলা'

নারীর বক্ষপ্রদেশকে অজস্র পাপড়িসজ্জিত লক্ষ্মীদেবীর পূজাসন ভেবে আনন্দ অনুভব করেন রবীন্দ্রনাথ---হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর।[১]

প্রমথনাথ বিশীর চোখে স্তন কিশোরী পূজারিণীর নিপুণ হাতে গড়া বেদীর মত---

আমি যে দেখেছি
কামনার কুঁড়িভরা তোমার অধরোষ্ঠ।
আমি যে দেখেছি
কিশোরী পূজারিণীর নিপুণ হাতে গড়া
শিবপূজার যুগল বেদী তোমার বক্ষে।

এই নিপুণগঠন যুগলবেদীতে কবিই যে স্বয়ং শিবের মত অধিষ্ঠান করবেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। কবিই দেবতা। প্রিয়া শঙ্খধ্বনি ক'রে বুকের দুটি সুবর্তুল নৈবেদ্য অর্পণ করবে তাঁকে—জানুতে ও জঙ্ঘায় তুলবে মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দ—

বুকের দুটি মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মত বিদগ্ধ ও বর্তুল,
... ...
মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দ তার জানুতে ও জঙ্ঘায়—[২]
(বুদ্ধদেব বসু)

কখনো রমণী ভালোবেসে প্রেমের দেবীকে এই অর্ঘ্য অর্পণ করে---

আফ্রোদিতের মন্দিরে গেলো অর্ঘ্য দিতে
স্পার্টার রানী হেলেন---বাসনা সব পুরুষের।
... ...
হেলেন রচেছে অর্ঘ্য নিজের বুকের ছাঁচে—[৩]
(বুদ্ধদেব বসু)

---

১. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]
২. 'মরচে পড়া পেরেকের গান'
৩. 'কবিতা'

জীবনানন্দ যেমন চোখে নীড়ের শান্তি খুঁজে পান, তেমন শামসুর রাহমান স্তনে পল্লীর নিরিবিলি শান্তি খুঁজে পান। জ্যোৎস্নাধোয়া মসজিদের মত প্রেয়সীর নিপোশাক দেহে আত্মাকে শান্তিময় করার পর কাছের প্রদীপ-জ্বলা স্তন-পল্লীকে স্নিগ্ধ আশ্রয়স্থল মনে হয় কবির--

নিপোশাক তোমার শরীর
জ্যোৎস্নাধোয়া মসজিদের মতো
তখন বস্তুত
আমার চোখের নিচে। স্তন পল্লী জ্বলে,[১]

কেউ কেউ পয়োধরকে আনন্দিত মফস্বল মনে করেন--

যুবতী যেন ভারবাহী পশু
বেচারা সারাদিন সারারাত নির্বিকার
বহে বেড়ায় ওর স্তন দুটি
জানেনা, আসলে ওরা আনন্দেরই মফস্বল।[২]
(শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়)

কেউ মনে করেন ও দুটি--শহর কলকাতা—
নগরের মধ্যে এক কলিকাতা সার।
প্রতি পথে কতশত মজার বাজার॥
কিন্তু দেখ অঙ্গনার অঙ্গ সহকার।
বুকে দুই কলিকাতা অতি চমৎকার॥
এ কলিকাতায় সব দেয় রাজকর।
সেই স্থানে রাজাকেও দিতে হয় কর।[৩]

স্নিগ্ধ পল্লী নয়, নিরিবিলি মফস্বল নয়, কলমুখর কলকাতা শহরও নয়, প্রিয়ার স্তনদ্বয় কোন কবির চোখে মসৃণ কাঁচসজ্জিত উজ্জয়িনী নগরী যেন---

১. 'হে প্রিয় কল্পনালতা'
২. [সৌরীর বাগান ও কিছু নতুন কবিতা]
৩. [বাঙালী জীবনে রমণী (পৃ: ৬১)]

মসৃণ কাঁচের মতো
চমৎকৃত উজ্জ্বয়িনী যেন—
অনাবৃত আশ্চর্যের
অতীতের পথ বেয়ে বেয়ে
দুইটি বিন্দুর স্বাদ
রহস্যের উজ্জীবিত দান।[১]
(সৈয়দ আলী আহসান)

পল্লীও নয়, নগরীও নয়--কোনো কবির চোখে পয়োধরদ্বয় হচ্ছে অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত দেশ---

রাত্রির অরণ্যতলে হে বিচিত্রা! দ্বার খুলে দাও,
মুখর দৃষ্টিতে তব, গ্রীবাভঙ্গে রহস্য অশেষ।
অজ্ঞাত জগতে মোর আবিষ্কৃত হয়নি যে দেশ
সুকঠিন রহস্যের বক্ষবাস সেথা তুলে নাও।
. . . .।
যে অনাবিষ্কৃত লোকে রাখিয়াছো স্বপ্নের আবেশ,
দু'চোখে, চিবুকে, বক্ষে সৃজিয়া বিচিত্র পরিবেশ
গানের পাখীরা মোর বহুদিন সেখানে উধাও।[২]
(ফররুখ আহমদ)

কোনো কবি আবার পয়োধরকে 'রাজ্য' নাম দেন--

তোমার পেলব স্তনের
রাজ্যে এখনো যে কাঁপে আমার প্রাণের রৌদ্র।[৩]
(ফজল শাহাবুদ্দীন)

তরুণীর শরমজমা বুক কোনো কবির চোখে প্রাসাদের ভিত্তির মতো—

সন্ধ্যা ছিল বন্দী তোমার খোঁপায়, বেণীর বন্ধনীতে;
তরুণ হিয়ার শরম ছিল জমাট বেঁধে বুকের ভিতে।[৪]
(নজরুল)

---

১. 'ব্যঞ্জনা'
২. 'দিলরুবা'
৩. 'এখনো' [তৃষ্ণার অগ্নিতে একা]
৪. 'শাখ-ই-নবাত'

শৃঙ্গার-সংগ্রামকালে পয়োধরকে সোনার কেল্লারূপে দর্শন করেছেন জায়সী। নায়ক লঙ্কা (নায়িকার কটিদেশ) যদি অধিকার করতে পারেন, তাহলে এই সোনার কেল্লাও ভেঙে পড়ে—

লীহ্নি লঙ্ক কঞ্চন গঢ় টূটা।
কীহ্ন সিঙ্গার অহা সব লূটা॥

অতি-আধুনিক কালের এক কবি মেঘের মতো ভেঙে পড়তে চান প্রেয়সীর শরীরে, ডুবিয়ে দিতে চান তাঁকে মুষলধারায়—আর সেই উচ্ছৃংখল কেলিউল্লাসকালে প্রিয়ার পয়োধরযুগলকে বাঘের নিঃশ্বাসে ঝড়ের দাপটে ফুলে ওঠা তাঁবু মনে হয় তাঁর—

তুমুল বৃষ্টির রাতে মনে হয় বাতাসতাড়িত
তোমার শরীর জুড়ে আমিও মেঘের মতো ভেঙ্গে পড়ি, মুষলধারায়
তোমাকে ডুবিয়ে রাখি বুকজলে, বাঘের নিঃশ্বাসে
ঝড়ের দাপটে যেন শিকারী তাঁবুর মতো ফুলে ওঠে স্তন
যেন তুমি বলে ওঠো, 'আর নয়, আর নয়, জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়'[১]
(রনজিৎ দাশ)

লোককবিরা পয়োধরকে উন্নতচূড়া লক্ষ্মীশ্রী ধানের গোলা মনে করেন। আঁধার রাতে এই আশা ও সমৃদ্ধির আগার লুণ্ঠন করে যে দশ রসিক চোর (দশ আঙুল), অপরিসীম তাদের আনন্দ—

তের চোরে চুরি করে করিয়া সন্ধান
দশ চোরে মোলে নিল দুই গোলা ধান।

পয়োধরকে ভাঁড়ার ঘর ব'লে ধারনা হয় কোনো কবির—
সেই বৃষ্টি চুঁয়ে চুঁয়ে স্তনের ভাঁড়ারে যত মেঘ-মাতৃকতা[২]
(সানাউল হক)

কোনো কবির মনে হয় পয়োধরদ্বয় হচ্ছে ভালোবাসায়—নির্ভরতায় বিমণ্ডিত চমৎকার সুখের বাসা—

---

১. 'প্ররোচনা' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]
২. বাইশে শ্রাবণ' [একটি ইচ্ছা সহস্র পালে]

ছিলো আশা ছিলো কুটিল আঁখির আখরে
ছিলো বাসা ছিলো বিকচ বুকের চূড়ায় সুখের শিখরে ;[১]
(বুদ্ধদেব বসু)

কেউ বলেন, কুচদ্বয় হচ্ছে ঝুলবারান্দা--
তার সে বুকের নাক্ষত্রিক অলিন্দে আর
চোখের বাগানে হাতের মহলে অবক্ষয়ের
দারুণ বেলায় কার অধিকার ?[২]
(শামসুর রাহমান)

কেউ বলেন, কুচদ্বয় হচ্ছে দুটি চমৎকার সুখময় বাতায়ন--যে বাতায়ন খুলে দিলে প্রসারিত করতলে বৃষ্টির উচ্ছ্বাস এসে লাগে—

বুকের দুটো পর্দা ঢাকা জানলা খুলে
কতজনকে হাত ডোবানো বৃষ্টি দিলে[৩]
(পূর্ণেন্দু পত্রী)

অলিন্দ নয়, বাতায়ন নয়, কারো মতে ও দুটি হচ্ছে প্রাকার — যৌবনগর্বে উত্থিত। কারো কাছেই তারা নতি স্বীকার করেনা, কেউ সেখানে উঠে পার হ'তে পারে না—

বান পগার উঠে কুচ দোউ।
নাঁঘি সরহু উহু পার ন কোউ।।
কৈসহু নব্হিঁ ন নাএ জোবন্ গরব উঠান।
(জায়সী)

কেউ বলেন, প্রাকার নয়---রমণীবক্ষ হচ্ছে হৃদয়রাজ্যে প্রবেশের স্বাগত-তোরণ—বুকের তোরণে কোনো স্বাগত রাখেনি যুবতী[৪]
(শঙ্খ ঘোষ)

পয়োধর কারো চোখে সৌধশিখর, কারো চোখে গম্বুজ, কারো চোখে মিনার, কারো চোখে স্তম্ভ—এদের উচচতা, গঠনসৌকর্য এবং কারুময় স্থাপত্য মুগ্ধ করে কবিকুলকে---

১. ['উত্তরাধিকার' (বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, অগ্রাণ-পৌষ, ১৩৮৬)]
২. 'কতোবার ভাবি'
৩. 'অনেককেই তো অনেক দিলে' [পূর্ণেন্দু পত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৪. 'জাবাল সত্যকাম' [শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

১. কঠিন হিয়ার দুই শ্রীফল কঠিন।
গাঢ় আলিঙ্গনে রহে কাঙ্গুরার চিন* ।। (আলাওল)

২. অথবা রাখিয়ো সন্তর্পণে খোঁপার ভিতরে গুঁজে
কলমের মতো তোমার বুকের গর্বিনী গম্বুজে।[১]
(নির্মলেন্দু গুণ)

৩. বন্যার জলে উঁচু মিনারের মতো
স্তন জ্বলে ঐ শিশ্নশৃঙ্গ জ্বলে
(শহীদ কাদরী)

৪. যেন বা দুইটি স্বর্ণস্তম্ভ উঠিয়াছে দেবলোকে।[২]
(জসীমউদ্‌দীন)

পয়োধরকে যখন স্তম্ভ কল্পনা করা হয়, তখন তাতে স্থাপত্যসৌন্দর্য অবলোকন-স্পৃহা ব্যতীত আর একটি উদ্দেশ্য থাকে। মদমত্ত যৌবনহস্তীকে কুচস্তম্ভে বেঁধে রাখা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য—যদিও আমরা জানি পয়োধর নিজেও শেষ পর্যন্ত হস্তীর মতই মাতাল হ'য়ে ওঠে। কবি যদিও স্তম্ভদ্বয়কে 'স্থির' বলেন, কিন্তু কম্পিত, শিহরিত হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়না—"হৃদয়ের হস্তীশালা সুবর্ণে নির্মিত, তাহাতে কুচভার স্থির স্তম্ভ।"[৩] (বিদ্যাপতি)। তবে স্থির অস্থির যাই হোক, মানিকরাম গাঙ্গুলি যখন কুচ-দুটিকে 'যুবকজনের মন বান্ধিবার খুঁটি' ব'লে অভিহিত করেন, তখন সেই খুঁটির কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। এই খুঁটিতে যুবজনের হৃদয়-বন্ধনের ক্রিয়াটিও কবির চোখে রহস্যময়—স্তনযুগলের রহস্যময় বন্ধনে।[৪] (ফজল শাহাবুদ্দীন)।

কখনো কখনো পয়োধর বুদ্বুদরূপেও কল্পিত হয়েছে। মোল্লা আব্দুর রহমান জামীর 'ইউসুফ যুলাইখা' কাব্যে উপমানটিকে এভাবে লক্ষ্য করা যায়—"পয়োধর যুগল যেন...কর্পূরের প্রশ্রবনে উত্থিত দুই বুদ্বুদ।"[৫]
(অনুবাদঃ সৈয়দ আলী আহসান)

---

* কাঙ্গুরার চিন--সৌধশিখরের চিহ্ন

১. 'কৃষ্ণা চতুর্দশী : এক'

২. 'মালতীর ঘুম'

৩. ২৫২

৪. 'সে' [তৃষ্ণার অগ্নিতে একা]

৫. [পদ্মাবতী] সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত

উচ্ছলিত জলতরঙ্গকেও কবিদের মনে হয় পীনচূড়া কুচের মত। শীতের উত্তুরে বাতাসে জাহ্নবীবক্ষে যে উত্তাল তরঙ্গরাজি সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে কুচহর মনে হচ্ছে ঈশ্বরগুপ্তের। সাগরের সঙ্গে কেলিরতা জাহ্নবী অহরহ সতীত্বনাশ করছে দেখে কুচরূপী হর যেন কোপ প্রকাশ করছেন—

বাতাসে উড়িছে বাস দেখা যায় সুপ্রকাশ
এ আভাষ স্থূলবোধে লও।
তাহা নয় তাহা নয় দৃশ্য হয় স্তনদ্বয়
বুঝ ভাব ভাবুক যে হও।।
জাহ্নবী সাগর সহ কেলি করি অহরহ
করিতেছে সতীত্ব বিনাশ।
কামিনী হৃদয়োপর কুচরূপ ধরি হর
করে তাই প্রকোপ প্রকাশ।।[১]

নবীনচন্দ্র সেনও মনে করেন রমণীবক্ষে দুটি তরঙ্গই বাঁধা আছে। আপন পূর্ণতায় উন্মত্ত প্রণয়াবেগবিহ্বল তরঙ্গ দুটি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে এমন উথলে পড়ছে যে বসনের বন্ধন তাতে ফেটে যাবার মতো হচ্ছে—

কি গঠন ক্ষীন কটি হৃদয়ে তরঙ্গ দুটি
উথলিছে ছড়ায়ে উচ্ছ্বাস।
আপনার পূর্ণতায় আপনি উন্মত্তপ্রায়
ফেটে যেন পড়িতেছে বাস![২]

জললালিত লাবণ্যললিত তরঙ্গের রূপে কবি রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ। তিনি কল্পনা করেন, যৌবনবতী 'বিজয়িনী'র অঙ্গে যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গমালা অচঞ্চলরূপে বন্দী হ'য়ে আছে। তরঙ্গরাজি সুদেহীর সর্বাঙ্গে কোথাও অল্প কোথাও অধিক-মাত্রায় উঁচু হ'য়ে অপরূপ ভঙ্গিতে ব্যাপ্ত—

অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হ'য়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে

---

১. 'শীতের অত্যাচার'
২. [রৈবতক (ত্রয়ী কাব্য)]

পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে, অধরে
উরুপরে, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।[১]

'পদধ্বনি' কবিতায় বুদ্ধদেব বসু বলেন---প্রিয়া আসবে তাঁর ঘরের দরজা খুলে। প্রিয়ার চোখের সূর্য-উৎস থেকে বয়ে যাবে উত্তাপের স্রোত, দুই প্রবল তরঙ্গের মতো কবির দিকে উত্থিত হবে তার বুক, আর কবির মুখে বৃষ্টির মত ঝরবে তার উন্মুক্ত, অজস্র, সুগন্ধি কালো চুল---

তোমার বক্ষ উত্থিত হবে আমার দিকে
সময়-সমুদ্রের দুই প্রবল তরঙ্গের মতো;

প্রিয়ার তরঙ্গিত বক্ষ এবং ওষ্ঠ স্পর্শ করামাত্রই প্রহরকে কবির মনে হয় লঘুভার—গতিময়--পলাশরঙিন। সেই 'তরল সময়ে দেহ মুছে' গিয়ে যেন হৃদয় জেগে ওঠে—

এখন হঠাৎ একটি ছোঁয়ায়
বক্ষের ঢেউ এবং ওষ্ঠতাপে
তরল সময়ে দেহ মুছে যেয়ে
হঠাৎ প্রহর একাকী পলাশ ফুল![২]
(সৈয়দ আলী আহসান)

সাগরের উত্তুঙ্গ তরঙ্গকে রমণীর বক্ষচূড়া ভেবে কোনো কবির ইচ্ছা জাগে নিরালা অতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে—

কখনো ঢেউকে ভেবে রমণীর বক্ষচূড়া
মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ি নিরালা অতল জলে।[৩]
(শামসুর রাহমান)

বায়রণ নিজেকে সিন্ধুর সন্তান মনে করেন। সিন্ধুজননীর তরঙ্গস্তনের উপর শিশুর মত ক্রীড়াশীল বায়রণ বলেন—

১. 'বিজয়িনী' [চিত্রা]
২. '১' [সহসা সচকিত]
৩. 'ভেলায়'

And I have loved thee, Ocean! and my joy
Of youthful sports was on thy breast to be
Borne, like thy bubbles, onward from a boy
I wanton'd with the breakers---they to me
were a delight: and if the freshening sea
Made them a terror—'twas a pleasing fear,
For I was as it were a child of thee,
And trusted to thy billows far and near,
And laid my hand upon thy mane—as I do here.[১]

রবীন্দ্রনাথও কল্পনা করেন বিশাল, সুউন্নত, সমুচ্ছল তরঙ্গমালা যেন সমুদ্র-জননীর স্নেহপূর্ণ দুগ্ধস্ফীত পয়োধর---

কখনো বা আপনারে
রাখিতে পারেনা যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীতস্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরণীরে বক্ষে ধরে চাপি
নির্দয় আবেগে।[২]

পয়োধর সমুদ্ররূপে এবং সৈকতরূপেও কল্পিত হয়েছে। কোনো কবির ধারনা, সমুদ্রতরঙ্গ নয় বরং অতলান্ত সমুদ্রই যেন বক্ষে ধারণ করেছে নারী--

ক্ষীনমধ্য দেহে আজ কোলাহল—বক্ষ আর
উরুর সায়রে।[৩]
(সৈয়দ আলী আহসান)

সৈকতে ছড়ানো শিশিরবিন্দু দেখে রমণীবক্ষে ছড়ানো মনিজহরতের স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হয় কোনো কবির---

সৈকতে গিয়েছিলাম বেশ ভোরে। শিশির
ছড়ানো ছিল
রূপসীর বুকের উপর ছড়ানো মনি জহরতের মত।
(ইবনে উমায়ন)

---

১. 'The Ocean'
২. 'সমুদ্রের প্রতি' [সোনার তরী]
৩. 'নায়িকা: তিন' [অনেক আকাশ]

বোদলেয়ার বলেন বক্ষের এই সমুদ্রতটে নৈরাশ্যের সকল কান্না হয় প্রতিহত--

—'আমি সেই বিদ্যাধরী, সিক্তমুখী. যার মায়াবলে
সনাতন বিবেক হারিয়ে যায় শয্যার অতলে।
বক্ষের বিজয়তটে সব কান্না করি প্রতিহত,
বুড়োদের হাসাই, কলমুখর বালকের মতো।[১]
(অনুবাদঃ বুদ্ধদেব বসু)

কখনো রমণী তার তীক্ষ্ণধার কর্ণাভরণে প্রেমার্থীদের হৃদয় বিদ্ধ করে বক্ষতটে জড় করে, এবং এভাবে নিজের বক্ষতট উত্তপ্ত রেখে দেয়—

তোমার দুলের দীপ্তি তীক্ষ্ণধার বর্শার ফলকে
আমাদের হত্যা করে স্তনতটে রেখেছিলে তাপ[২]
(অর্ধেন্দু চক্রবর্তী)

সমুদ্রের উপকূলরূপেও পয়োধর কখনও কল্পিত হয়েছে—

সে তার শরীর থেকে ঝরিয়েছে কান্নার সাগর
আমার নির্মম হাতে সঁপেছে বুকের উপকূল,
তারপর শান্ত হলে সুখে-দুঃখে কামনার ঝড়
গর্ভের প্রাণের বৃন্তে ফুটে উঠলো সর্বনাশ-ফুল।[৩]
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

প্রিয়া যেন স্তব্ধ শস্যের সবুজ জল—স্তন দু'টি 'হাঁস-ডাকা-দ্বীপ'—

দেখেছি সে স্তন দুটি ধমনীত পাহাড়ের মতো--
হাঁস ডাকা দ্বীপ, স্তব্ধ শস্যের সবুজ জলে
(অ্যালেক্স কামফট/অনুবাদঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী)

দ্বীপ উপমানটিকে আফ্রিকান কবি লিওপোল্ড সিদার সেঙ্ঘরও ব্যবহার করেছেন---

তোমার উদর জুড়ে নরম আবর্ত্ত জুড়ে ভাসাবো আমার ডিঙি বিরামবিহীন।
সাফ করো তোমার বুকের সেই খুব গাঢ় প্রেম-দ্বীপ,[৪]
(অনুবাদঃ মুহম্মদ নূরুল হুদা)

---

১. 'পিশাচীর রূপান্তর' [বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা]
২. 'তুমি প্রেম তুমিই জীবাণু' [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা।]
৩. 'বিবৃতি' [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]
৪. 'কঙ্গো' [আফ্রিকার কবিতা/সেনেগাল]

সুন্দরীর মুক্তাহারে ও বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত পয়োধরকে জায়সী অরণ্যাবৃত কুম্ভ-স্থল দ্বীপের সদৃশ দেখেছেন---

দীপ-কুঁভস্থল আরণ পরা

'নৌকা' উপমানটির দেখা মেলে মনীন্দ্র রায়ের কবিতায় আর 'ভেলা' উপমান-টিকে পাওয়া যায় বিদ্যাপতিতে। 'নির্বাসিতের গান' কবিতায় মনীন্দ্র রায় 'ঝড়ে-বাঁকা নারিকেল পল্লবে' প্রিয়ার এলায়িত খোঁপার সাদৃশ্য দেখেন, 'স্বপ্নজয়ী গ্রীবার মহিমা' দেখেন 'পদ্মার দুরন্ত বাঁকে' আর কম্পমান নৌকার গলুইটিকে দেখেন প্রিয়ার বক্ষে—

তুমি কি জানোনা মেয়ে যৌবনের উদ্দাম নিঃশ্বাস
কাঁপায় তোমার বুকে তীরলগ্ন নৌকার গলুই।

বিদ্যাপতির অভিসারবিষয়ক পদে দেখা গিয়েছিল, রাত্রি-যমুনা সন্তরণ-উদ্দেশ্যে কুচযুগলকে ভেলা করেছিলেন রাধা---"দুঃসহ যমুনা নদী কুচযুগলকে ভেলা করিয়া ভাগ্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম।"

'ভেনাসের জন্ম' কবিতায় রাইনের মারিয়া রিলকে স্তনপ্রসঙ্গে একটি নতুন উপমার জন্ম দিয়েছেন। দেহটি যেহেতু ভেনাসের, তাই তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপমাগুলিও সব অন্য ধরনের। তাঁর জানু দুটো চাঁদের মতো, যা স্পষ্ট বেয়ে উঠে উরুর সীমান্ত মেঘে ডুব দেয়। তাঁর দেহের সব কটি সন্ধি সুরাপায়ীদের কণ্ঠের মতো জীবন্ত। তাঁর শরীরের অস্পষ্ট উন্মেষের মধ্যে প্রথম গাঢ় নিশ্বাস প্রভাতবায়ুর মত ঢুকে পড়ে। শিরা-বৃক্ষের কোমলতম ডালে গুঞ্জন জাগে। দেহের গভীরতর স্থানে আরম্ভ হয় শোণিতের মর্মর।—

আর এই বাতাস, প্রবল হ'তে-হ'তে নিশ্বাসের সবটুকু ক্ষমতায়
তীব্র ঝাপটে ভ'রে তুললো সদ্যতন স্তন দুটিকে,
নিজেকে দিলো প্রবিষ্ট ক'রে তাদের মধ্যে, আর তারা
দিগন্তে-ভ'রে ওঠা স্ফীত পালের মতো
হালকা মেয়েটিকে তীরে নিয়ে এলো ঠেলে।[২]

(অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

---

১. [দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা]
২. [কালিদাসের মেঘদূত (ভূমিকা)]

বাতাসভরা পাল যেমন স্ফীত এবং কুঞ্চনহীন—ভেনাসের সদ্যতন স্তন দুটিও তেমনি স্ফীত, অকুঞ্চিত এবং জীবনাবেগে আন্দোলিত।

সমুদ্রের অতল থেকে জীবনানন্দ টেনে এনেছেন শঙ্খকে। শঙ্খের রঙ এবং গঠন রূপসী শঙ্খিনীর সুগৌর স্তনের জন্য এক আকর্ষণীয় উপমা—এবং সে শঙ্খ যদি হয় 'করুণ' তাহলে সে এক আশ্চর্য উপমা হয়

স্তন তার

করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র কবেকার শঙ্খিনীমালার।[১]

শঙ্খ উপমানটি বড়ই উপযোগী—কেননা এই শঙ্খেই রমণীদেহে প্রথম যৌবনবার্তা ঘোষণা করেন প্রেমের দেবতা মদন। উপমানটি জীবনানন্দের এতই নিজস্ব যে, শামসুর রাহমান তাঁর এক কবিতায় সেটি উদ্ধৃতির মত ব্যবহার করেন। শামসুর রাহমান সেই কবিতায় বলেন—কবিতা তুমি ফিরে যাও আমার কাছ থেকে, কেননা তুমি ভ্রষ্টা। তোমার যৌনাঙ্গের অগভীর কেশে সুধীন্দ্র দত্ত মুখ রেখেছেন, বাবরি দুলিয়ে নজরুল বহুবার তোমাকে করেছেন ধর্ষণ এবং জীবনানন্দের কাছে তুমি উন্মোচিত করেছো তোমার 'করুণ শঙ্খের মতো স্তন'—

জীবনানন্দের জন্যে চকিতে করেছো উন্মোচন
করুণ শঙ্খের মতো স্তন এবং সুধীন্দ্র দত্ত
নিখিল নাস্তির মৌনে ডুবে তোমাদের নাভিমূলে
যৌনাঙ্গের অগভীর কেশে রেখেছেন মুখ ভুলতে
মনস্তাপ।[২]

জীবনানন্দ দাশ যখন জলমেয়েদের স্তনকে ঠাণ্ডা, শাদা বরফের কুচির মত দেখেন, তখন তা আমাদের কাছেও এক চমৎকার ছবি হ'য়ে আসে। জললীন, হিম, শুভ্র, সূর্যরশ্মিসমুজ্জ্বল, ভাসমান, শতকুচি হ'য়ে-যাওয়া বরফখণ্ড, কোমল জলবতীর বড়ই নয়নরঞ্জক স্তন যেন—

সেই জল মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা—শাদা—বরফের কুঁচির মতন।[৩]

---

১. 'শঙ্খমালা' [বনলতা সেন]

২ 'ফিরে যাও' ৩. 'পরস্পর' [ধূসর পাণ্ডুলিপি]

কুচের উপমান-অন্বেষণকালে রমণীর অন্যান্য অঙ্গ, উপাঙ্গের দিকেও কবিদের দৃষ্টি পতিত হয়েছে। রমণীর শরীররাজ্য থেকে 'চুল' এবং 'চোখ' এমন কি 'হৃৎপিণ্ড'কেও উপমানরূপে বেছে নিয়ে কবিকুল কিভাবে প্রয়োগ করেছেন দেখা যাক। রমণীর সঞ্চিত কেশদাম দুইহাতে ছানতে ছানতে কুচকুসুমসুষমা ছানছেন ভেবে বিহ্বল হয়ে পড়েন কোনো কবি—
উরজ পুষ্পের মত চুল ছানি দুই হাত দিয়ে[১] (বুদ্ধদেব বসু)
স্তনকে কোনো কবির মনে হয়, সুবাসিত, সুবিন্যস্ত, সুসংবদ্ধ খোঁপা। সেই খোঁপায় শুয়ে পড়ার ইচ্ছা কবিকে লোভাতুর ক'রে তোলে—

রাত হ'লে স্বপ্ন দিবি শুতে দিবি বুকের খোঁপায়
কথা দিয়েছিলি কেন, বলেছিলি কেন (আবুল হাসান)

কুচদ্বয়কে কেউ কেউ চোখের মত তাকিয়ে থাকতে দেখেন—

১. আমি উঠে এসেছি বারান্দায়—দরজার ধারে দাঁড়িয়েছি।
ঐ তো সে—ভোলেনি, শুয়ে আছে আমারই জন্য প্রস্তুত।
ব'য়ে যায় শরীর যেন সোনালি স্রোত, স্তনের বোঁটা
চোখের মতো কাঁপছে।[২] (বুদ্ধদেব বসু)

২. বক্ষবৃন্তে দু'টি কালো চোখ[৩] (সৈয়দ আলী আহসান)

৩. হৃদয়-আকাশে দুইটি নয়ন
তিলকাঞ্চন উজ্জীবন,[৪] (সৈয়দ আলী আহসান)

৪. বক্ষের দুইটি বৃন্ত
হৃদয়ের দুটি চোখ যেন—
একটি আশ্লেষ নিয়ে
তরঙ্গিত নীলাম্বরে চেয়ে
সময়ের অভিঘাতে
রক্ত আর আনন্দের গান।[৫] (সৈয়দ আলী আহসান)

---

১. 'চুল' [কঙ্কাবতী]
২. 'একদিন : চিরদিন' [একদিন : চিরদিন]
৩. 'রমণী' [আমার প্রতিদিনের শব্দ]
৪. 'যেখানেই তুমি' [সহসা সচকিত]
৫. 'ব্যঞ্জনা' [আমার প্রতিদিনের শব্দ]

৫. হালকা গেরো উন্মোচন করুক
দুটি চোখের মতো রে তোর বুক
দীপ্তিময়—লাবণ্যের চাপে
আমরা জ্বলি পাপে ;[১]
(বোদলেয়ার / অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

দেখা যাচ্ছে চোখ উপমানটি দেশী-বিদেশী কবির সমান প্রিয়। কুচে অভি-ব্যক্তির ব্যঞ্জনা জাগানোর উদ্দেশ্যেই কবিকুল এই উপমানটিকে গ্রহণ করেন। বাঙালী কবিকুলের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসানের কাব্যে উপমানটিকে বারংবার ব্যবহৃত হ'তে দেখা গেছে। এর কারণ কবি সৈয়দ আলী আহসান হৃদয় জাগাতে ভালোবাসেন—'আমার আকাঙ্ক্ষার তার শরীরের রেখায় হৃদয়ের নিবেদন পুষ্পিত হ'য়ে উঠুক।'[২] 'আমার করাঙ্গুলী তার দেহকে স্পর্শ করে কামনার উদ্‌ঘাটন করেনি, কিন্তু হৃদয়কে উন্মোচিত করেছে। এ স্পর্শের অবক্ষয় নেই।'[৩]

রমণীর হৃদয়কে জাগরিত করার পর কবি রমণীর ওষ্ঠে হৃদয় নামতে দেখেন (তোমার হৃদয় ওষ্ঠের কাছে/চুম্বন হ'য়ে এলো[৪]), বাহুতে হৃদয় নামতে দেখেন (কর-শাখা-মুখে হৃদয় নেমেছে/নতুন এ অনুভূতি[৫]), এমনকি রমণীর সমস্ত দেহকেই তিনি হৃদয়রূপে দেখেন (আমার আনন্দে তোমার সমস্ত দেহ/হৃদয় হোল।[৬])। যুগকুচকে হৃদয়ের অভিব্যক্তি-জাগানো নয়নরূপে কবি কেন দেখেছেন—কবির মানসপ্রবণতার একটি দিক উদ্‌ঘাটনের পর সেটি সুস্পষ্ট বোধগম্য হলো।

হৃৎপিণ্ড-প্রবেশ-বাসনার কারণে কবির মোহবিভ্রান্ত নয়ন বাম পয়োধরকে দেখতে থাকে প্রস্ফুটিত হৃৎপিণ্ডের মত—এভাবেই 'হৃৎপিণ্ড' উপমানের সংযোজন—

১. 'লাল চুলের ভিখিরি মেয়েকে' [বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা]
২. '১২' [উচ্চারণ] / সৈয়দ আলী আহসান
৩. '১৩' [উচ্চারণ] / সৈয়দ আলী আহসান
৪-৫ 'তোমার হৃদয় : আমার হৃদয়' [একক সন্ধ্যায় বসন্ত] সৈয়দ আলী আহসান
৬. 'হৃদয়-এক' [একক সন্ধ্যায় বসন্ত] সৈয়দ আলী আহসান

হৃৎপিণ্ডের কম্পন শুনি
বাম পয়োধরকে অবলম্বন ক'রে সে যেন ভাস্বর হ'লো[১]
(সৈয়দ আলী আহসান)

কবিকুলের আকাঙ্খা যে কোথায় উধাও হ'য়ে পরিতৃপ্ত হ'তে চায়, তা অন্বেষণ করতে গেলে মনে বিস্ময় জাগে। বোদলেয়ারকে দেখা যাচ্ছে বাঘিনীর "উজ্জ্বল তনু', 'প্রগাঢ় কুন্তল', 'বলীয়ান বিস্মরণে ভরা দীপ্ত ঠোঁট' এবং 'মোহন স্তনে'র প্রতি আকৃষ্ট হ'তে। এই 'মদালস জন্তু'র কুচদ্বয়ে তিনি রমণী-বক্ষের স্মৃতি অন্বেষণ করেন। রবীন্দ্রনাথকেও দেখা যায় বাঘিনীর 'চিত্রাঙ্কিত বুকে,' 'পরিপূর্ণ স্তনে' জননীর বক্ষমাধুর্য অনুভব করতে—

১. উঠে আয় আমার বুকে, নিঠুরা নিশ্চেতনা,
সোহাগী ব্যাঘ্রী আমার, মদালস জন্তু ওরে,
প্রগাঢ় কুন্তলে তোর ডুবিয়ে, ঘণ্টা ভ'রে,
চঞ্চল আঙুল আমার—হ'য়ে যাই অন্যমনা।
... ...
ক্ষমাহীন লক্ষ চুমোয় তনু তোর ঢাকবো আমি—
উজ্জ্বল তামার মতো ও-তনু নতুন, কাঁচা।
... ...
এ কঠিন তিক্ততারে ডোবাতে, করবো শোষণ
ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র ফোঁটায়
ঐ তোর মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটায়—
কোনোদিন অন্তরে যার হৃদয়ের হয়নি পোষণ।[২]
(বোদলেয়ার / অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

২. যদি ব্যাঘ্রিনীর মতো
অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত
মানবপুত্রেরে কর স্নেহের লেহন।

১. [পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত]
২. 'লিখি' [বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা]

নখর লুকায়ে ফেলি পরিপূর্ণ স্তন
যদি দাও মুখে তুলি, চিত্রাঙ্কিত বুকে
যদি ঘুমাইতে দাও মাথা রাখি সুখে
এমনি দুরাশা।[১]

(রবীন্দ্রনাথ)

নির্বস্তুক বিষয়ও স্তনের উপমান হয়েছে। যেমন, বাউল হরিদাস সাধনাকে কল্পনা করেছেন অনুত্থিত স্তনের মত—

আর যত আছে সাধন
অজাগল-স্তনের মতন
তাত নাহি মিলে রতন
বৃথা যতন বলে তারে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কলিকাদহনের উদ্যোগ করলে রতিঅনভিজ্ঞা সমাগমভীতা রাধা অনুরাগহীন অস্বীকৃতি জানায় এবং দুটি বাহুতে প্রাণপণে আগলে রাখে নবীন পয়োধরকে। স্তন তখন প্রাণ। প্রাণের মত যুগলকুচকে ব্যাধের হাত থেকে রক্ষা করতে থাকে রাধা। বিদ্যাপতিও এই বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগে শক্তিশালী এক নূতন উপমা সৃজন করেন—

ভুজযুগ চাঁপ জীব জোঁ সাঁচ।
কুচ কঞ্চন কোরীফল কাঁচ ॥

কখনো এই পয়োধর হৃদয় হয়। নারীর রহস্যগুণ্ঠিত অধরা হৃদয়কে অবলোকন ও স্পর্শের অনিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই উপমার জন্ম—

১. সহৃদয়মর্মনি বর্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্ ॥ (জয়দেব)
২. হৃদয়ে নলিনী দল সংনাহা করে। (বড়ু চণ্ডীদাস)
৩. হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। (বিদ্যাপতি)
৪. হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার। (গোবিন্দদাস)
৫. হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর। (বিদ্যাপতি)
৬. সহি নহি সকহু হিয়ে পর হারু। (জায়সী)

---

১. 'ভয়ের দুরাশা' [চৈতালি]

৭. হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে। (জ্ঞানদাস)
৮. কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয় (রবীন্দ্রনাথ)
৯. . . . . . . হয়তো সে কন্যার হৃদয়
শঙ্খের মতন রুক্ষ্ম, অথবা পদ্মের মতো—[২] (জীবনানন্দ দাশ)
১০. হৃদয়-আকাশে দুইটি নয়ন[৩] (সৈয়দ আলী আহসান)
১১. বল্কলে ঢেকেছে কটি—হৃদয় নিটোল[৪] (সৈয়দ আলী আহসান)

কখনো কবির চোখে এই পয়োধর প্রেম হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন নারীর হৃদয়ের মধুর কোমল প্রেমই যৌবনের বসন্ত-বাতাস লেগে পয়োধর-পুষ্প রূপে বিকশিত—

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত-সমীরে।[৫]

স্তনের পিচ্ছিল প্রকৃতিকে একটি চমৎকার উপমায় বেঁধেছেন শামসুর রাহমান। কবির পরম প্রিয় আকাঙ্ক্ষিত শব্দ স্তনের মতই কেবলি পিছলে যায় হাতের মুঠো থেকে—

শব্দ, রাজেন্দ্রাণী শব্দ কেবলি পিছলে যায়, যেমন হাতের
মুঠো থেকে স্তন,[৬]

শব্দ নয়—কোনো কবির চোখে পয়োধর হচ্ছে শব্দাতিক্রমী সঙ্গীত—

প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।[৭] (রবীন্দ্রনাথ)

গভীররাতে উরুসন্ধিসংযোগের সংলাপ যখন উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে, তখন রমণরত কোনো কবির চোখে স্তনদুটিকে মনে হয় গভীর রাত্রির কক্ষে উচচকিত নির্দেশ—

---

১. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল] ২. 'একদিন এই দেহ' [রূপসী বাংলা]
৩. 'যেখানেই তুমি' [সহসা সচকিত] ৪. 'নায়িকা : এক' [অনেক আকাশ]
৫. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]
৬. 'কোনো কোনো কবিতার শিরোণাম'
৭. 'স্তন' [কড়ি ও কোমল]

গভীর রাত্রির কক্ষে
উচচকিত নির্দেশের মতো—
লীলাময় তারাদল
যখন গোপন গৃহে যায়,
উরুসন্ধি সংযোগের
উৎসাহিত যখন সংলাপ
(সৈয়দ আলী আহসান)

কখনো কখনো স্তনদ্বয়ের একটি ইহলোক, অপরটি পরলোক। রবীন্দ্রনাথ বলেন, এ জগৎ যেমন সুন্দর, শান্তিময়--মৃত্যুর অপরপ্রান্তে যে জগৎ, তা-ও তেমনই। মৃত্যুকে আমরা মিথ্যাই ভয় পাই—যেমন শিশুর মুখ থেকে এক স্তন কেড়ে নিলে শিশু ভয় পায়। অপর স্তন ওষ্ঠ স্পর্শ করামাত্রই শিশু যেমন আশ্বাস লাভ করে—মৃত্যুর পরের সেই অদেখা আনন্দজগৎ দর্শন ক'রে আমরাও তেমনি আশ্বাস লাভ করি। এক স্তন থেকে আর এক স্তনে স্থানান্তরিত হবার যে ভীতিজনক সময়টুকু, তাকেই 'মৃত্যু' নাম দেওয়া যেতে পারে—

স্তন হ'তে কেড়ে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
আবার আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

উপযুক্ত প্রসঙ্গ এলে রবীন্দ্রনাথের টুকরো টুকরো চরণ উদ্ধৃত করেছি। এবার 'স্তন' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে চাই, যুবক রবীন্দ্রনাথের আবেগপ্রতপ্ত অন্তর কিভাবে দেখেছে রমণীর স্তনকে এবং ইচ্ছা পোষণ করি এই উদ্ধৃতিটিই হোক এই গ্রন্থে কবিদের ব্যবহৃত কুচবিষয়ক উপমা-পর্যায়ের শেষ উদ্ধৃতি—

স্তন

১

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত-সমীরে
কুসুমিত হ'য়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ-সুধায় করে পরাণ পাগল।

১. 'ব্যঞ্জনা' [আমার প্রতিদিনের শব্দ]

মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে।
কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে
শরমে মরিতে চায় অঞ্চল-আড়ালে।
প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হেরো নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।।

২

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা-বিহারভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে,
বিমল পবিত্র দুটি বিজন শিখরে।
চিরস্নেহ-উৎসধারে অমৃত-নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।
জাগে সদা সুখসুপ্ত ধরণীর পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেবশিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।।[১]

উদ্ধৃতিটিকে অব্যাখ্যাত রেখে এর মাধুর্যকে অক্ষুণ্ন রাখাই আমার অভিলাষ।

নারীদেহের স্পর্শবিহ্বল আশ্চর্য সেই যুগল মাংসখণ্ডের জন্য হৃদয়ের অবদমিত কৌতূহল এবং অনিবার্য মুগ্ধতা থেকেই জাত এই উপমা এবং

১. [কড়ি ও কোমল]

চিত্ররাজি। এই বাসনার কোনোদিন নিবৃত্তি নেই। নারীর এই যৌবন-নিটোল কামনা-উদ্বেল আকর্ষণীয় অঙ্গ তাই নিত্যই কবিদের মোহমুগ্ধ অন্তরের কাছে দাবী জানাবে ইন্দ্রিয়ঘন এবং বাসনাউষ্ণ নতুন নতুন উপমা নির্মিতির।

কৌতূহলবশতঃ এবার আমরা এই রচনায় ধৃত উপমানরাজিকে একত্র-সন্নিবেশিত অবস্থায় দেখবো এবং সম্ভাবনাশালী হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন উপমান আজও অবহেলিত, সে বিষয়ে একটি ক্ষণদৃষ্টির পর্যালোচনা উপস্থাপন করবো।

বক্ষ-বন্দনায় বহুকবি-ব্যবহৃত উপমানরাজিঃ

পুষ্প বিষয়ক— পদ্ম (স্থলপদ্ম, জলপদ্ম, পদ্মকলি), কদম্ব, গোলাপ, বকুল, রজনীগন্ধা, অশোক, চাঁপা, কনকচাঁপা, শেফালি, করবী, কেতকী, ডালিমফুল, মল্লিকা, লালাপুষ্প, নার্গিস, মন্দার, মালতী, মাধবী, হাস্না-হেনা, কুন্দ, শাপলা, শালুক, কচুরি, আকন্দ, ধানফুল, শস্যমঞ্জরী, ফুলকপি, নামহীন ফুল, নামহীন ফুলকলি।।

পর্বত বিষয়ক— পর্বত (আম্রকূট পর্বত, সুমেরু পর্বত, হিমালয় পর্বত, উদয়গিরি, কনকগিরি, স্বর্ণগিরি, হেমগিরি,

	নীলগিরি, লবণগিরি, আগ্নেয়গিরি), টিলা, পাথর, পরশপাথর, শিলা, নির্ঝর, নদী, উপত্যকা, খনি ॥
ফল বিষয়ক—	শ্রীফল, তাল, কুল, বাতাবি, জামির, কমলা, ডালিম, বেদানা, আপেল, নাসপাতি, আঙুর, কিশমিশ, খোর্মা, ডওফল, নারিকেল, সুপুরি, কামরাঙা, করমচা,আম, আনারস, পেয়ারা, আতা, মাকাল, নামহীন ফল ॥
তরকারী এবং খাদ্যদ্রব্য বিষয়ক—	লাউ, বেগুন দোলমা, অম্বল, হরিণের মাংস, এফতার, রুটি, বিস্কুট, নাড়ু, লবণ, মধু, পানি, রক্ত ॥
তৈজসপত্র বিষয়ক—	কলস (মঙ্গলকলস, কনককলস, রতনকলস, সুধার কলস, রসের কলস, জলের কলস, অনুরাগের কলস), ঘট, ঘড়া, কটোরা, অমৃতপাত্র, অমৃতের ঝারি, পানপাত্র, ভাণ্ড, শিশি, গেলাস, কৌটা, ফুলদানি, সরা ॥
ক্রীড়াবস্তু বিষয়ক—	খেলনা, বর্তুক, লাট্টু, পাশা ॥
গৃহকর্মে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিষয়ক—	তুলা, গদি, উপাধান, লেস, মখমলবস্ত্র, টেবিল, চুম্বক, মুকুর ॥
যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক—	বর্ম, ঢাল, চক্র, সন্না, ধনুক, বাণ, শিং, কাঁটা, গোলা ॥

॥ প্রাণীবাচক ॥	**মানব বিষয়ক**—বল্লভা, বালিকা, সুজন, খল, পদ্মকুমার, রাজা, যুধিষ্ঠির, দূত ॥ **দেবতা বিষয়ক**—শিব ॥ **পশু বিষয়ক**—হাতী, হরিণ ॥ **পক্ষী বিষয়ক**—চক্রবাক, পারাবত, সারস, মরাল, ডিম, পালক ॥ **পতঙ্গ বিষয়ক**—ভ্রমর ॥ **মৎস্য বিষয়ক**—মাছ ॥ **সরীসৃপ বিষয়ক**—সাপ, সাপের দাঁত ॥

ধনবস্তু বিষয়ক—মণি, রত্ন, গজমুক্তা, হারাধন, জহরত, স্বর্ণমুদ্রা ।।

ধাতু বিষয়ক—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, স্ফটিক, কাঁচ ।।

বৃক্ষ বিষয়ক—পাতা, অঙ্কুর, লতা, ঝোপ, অরণ্য ।।

ঋতু/কাল বিষয়ক—বসন্ত, ফাগুন, রাত্রি ।।

নীড় বিষয়ক—নীড়, মৌচাক ।।

মৃত্তিকা বিষয়ক—ক্ষেত্র, মৃত্তিকা ।।

সৌরমন্ডল বিষয়ক—আকাশ, গ্রহ, চন্দ্র. সূর্য, নক্ষত্র, মেঘ, বিদ্যুৎ ।।

অগ্নি বিষয়ক—আগুন, দীপ ।।

পরলোকের আরাধ্য স্থান বিষয়ক—স্বর্গ ।।

উপাসনালয় এবং পূজাদ্রব্য বিষয়ক—মন্দির, গীর্জা, বেদী, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য ।।

স্থান বিষয়ক—পল্লী, মফস্বল, শহর, নগরী, দেশ, রাজ্য ।।

বাসস্থান এবং স্থাপত্য বিষয়ক—ভিত, কেল্লা, তাঁবু, গোলা, ভাঁড়ার, বাসা, জানালা, অলিন্দ, প্রাকার, তোরণ, গম্বুজ, মিনার, স্তম্ভ, খুঁটি ।।

সমুদ্র ও জলযান বিষয়ক—বুদ্বুদ, তরঙ্গ, সমুদ্র, সৈকত, উপকূল, দ্বীপ, নৌকা, ভেলা, পাল, শঙ্খ, বরফ ।।

রমণীর অঙ্গ-উপাঙ্গ বিষয়ক—চুল, চোখ, হৃৎপিণ্ড ।।

পশুর কুচবিষয়ক—বাঘিনীর স্তন ।।

নির্বস্তুক বিষয়ক—সাধনা, প্রাণ, হৃদয়, প্রেম, শব্দ, সঙ্গীত, উচচকিত নির্দেশ. ইহলোক. পরলোক ।।

সম্ভাবনাময় অথচ উপেক্ষিত উপমানরাজি

সম্ভাবনাশালী হওয়া সত্ত্বেও যেসকল উপমান আজও উপেক্ষিত,* সেগুলোর প্রতি এখন ক্ষণিক দৃক্‌পাত করা যেতে পারে।

ফুলপ্রসঙ্গে আবার আমরা প্রত্যাবর্তন করি। সৌন্দর্যপ্রিয় কবিকুল কুচের অলংকার হিসেবে ফুলকে অতিমাত্রায় ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে আবার সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে কমল। কলাবতী, কামিনী, চামেলি, দোলনচাঁপা, দোপাটি, মহুয়া, জবা, গাঁদা, নয়নতারা, সন্ধ্যামনি, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া পারুল, টগর, গন্ধরাজ, অপরাজিতা, নাগকেশর ইত্যাদি ফুলের উল্লেখ খুব একটা পরিলক্ষিত হয়না। পদ্মের বৃহত্ব যদি কবিদের প্রিয় হ'য়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে সূর্যমুখী, ডালিয়াও বৃহৎ। পূর্ণ যৌবনবতীর বক্ষোদেশের অলংকার হিসেবে কমলের মত এদেরও সুপ্রচুর ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কমলই আদৃত, অন্য অনেক ফুলই উপেক্ষিত। কুচের অজানা সুবাসটিকে অনেক বনজ ফুলই ধারণ ক'রে রেখেছে। পরিচিত আনাজের ফুলগুলোকে একেবারে রূপহীন বলা যাবেনা। বরং রেণুমথিত, পরিচিত সুরভিআচ্ছন্ন এই ফুলগুলো উপমান হ'য়ে এলে পাঠক স্বাদবদলের সুখ পেতেন। অথচ নাগরিক কবিরা তেলাকুচোফুল, ঘেঁটুফুল, আশশ্যাওড়া-ফুল, নিশিন্দেফুল, কুলফুল, সুপুরিফুল, কাঁকুড়ফুল, কাঁকরোলফুল, পটলফুল, লাউফুল---ইত্যাদি অকাব্যিক নাম ব্যবহারে একেবারেই অনিচ্ছুক। এই ফুলগুলো একজন কবির মুখ তাকিয়ে ছিল---তাঁর নাম জসীমউদ্‌দীন। তিনি প্রিয়ার খোঁপাটিকে কুমড়োফুলে সাজাতে ভালোবাসতেন। কিন্তু প্রিয়ার দেহে আরোপিত ফুলের শোভা দেখে তিনি এমন মোহিত যে, প্রিয়ার দেহলতিকায় নিভৃতে যে ফুল দল উন্মোচন করছে, তাকে চিত্রায়নের কথা তাঁর মনে পড়লোনা। মনে পড়লে তিনি সর্ষেফুল, মটরশুঁটিফুল, কলমিফুল, কুমড়োফুল, বউটুবানি বা দুধালিফুলের কথাই বলতেন নিঃসন্দেহে। লোককবিরা যদি একটু নিঃসংকোচ হ'তে পারতেন, তাহলেও কুমড়ো, সীম, সজনে, চিচিঙ্গে ফুলগুলোর একটু উপায় হতো। রবীন্দ্রকাব্যে আম্রমঞ্জরীর, কাশফুলের বড়ই আদর। কিন্তু আমমুকুল বা

* অপ্রযুক্ত কিংবা হ'তে পারে অল্পপ্রযুক্ত কিন্তু মোটেও অতিপ্রযুক্ত নয়।

কাশফুল সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে কুচের উপমান হিসেবে একবারও আসেনি। ধুতরোফুল,[১] নিমফুল,[২] অড়হরফুল,[৩] বাবলাফুল,[৪] বাতাবিফুল,[৫] সজনেফুল,[৬] ঝিঙেফুল,[৭] ভাঁটফুল,[৮] আফিমফুল[৯] ইত্যাদি অনাদৃত ফুলকে নজরুল জাতে তুলেছেন বটে কিন্তু কুচের উপমানরূপে এদের একটিকেও প্রয়োগ ক'রে দেখেননি। জীবনানন্দ দাশ জাতে তুলেছিলেন ঘাসফুল,[১০] ভেরেণ্ডাফুল,[১১] শেয়ালকাঁটাফুল,[১২] মোরগফুল,[১৩] আনারসফুল,[১৪] চালতাফুল,[১৫]

---

১. 'ধুতুরা গেলাস'

২. 'নিমফুলের মউ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা' (নজরুল সংগীত)

৩.—৪. 'ও তার হলদে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে।
ঐ বাবলা ফুলে নাকছাবি তার' / অ-কেজোর গান [ছায়ানট]

৫. 'বাতাবি নেবুর ফুলেলা কুঞ্জে (নজরুল সংগীত)

৬. 'সজনে ফুলের দল ঝরি'
থোপা থোপা লাজ ছড়াত দোলন খোঁপার পর, / 'চৈতী হাওয়া' [ছায়ানট]

৭. 'ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙেফুল / 'ঝিঙে ফুল' [ঝিঙে ফুল]

৮. ভাঁট-ফুলের ঐ নাট-দেউলে / '১৮' [সুর-সাকী]

৯. মনে পড়ে কবে আহত এ পাখী মৃত্যু-আফিমফুলে / 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি' [ফনি-মনসা]

১০. 'নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা' / 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' [বনলতা সেন]

১১. '..... কাঁচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে—'
'জীবন অথবা মৃত্যু' [রূপসী বাংলা]

১২. 'খয়েরী অশথপাতা-বঁইচি শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে,' /
'যখন মৃত্যুর ঘুমে' [রূপসী বাংলা]

১৩. 'মোরগ ফুলের মত লাল আগুন,'/'শিকার' [বনলতা সেন]

১৪. '...... আনারস ফুলে
ভোমরা উড়িছে শুনি—'/
'যখন মৃত্যুর ঘুমে' [রূপসী বাংলা]

১৫. 'চালতা ফুল কি আর ভিজিবেনা শিশিরের জলে' /
'সেইদিন এই মাঠ' [রূপসী বাংলা]

নারিকেলফুল,[১] এলাচিফুলকে[২] কিন্তু তিনিও কুচের উপমানরূপে এদের একটিকেও প্রয়োগ ক'রে দেখেননি।

দেখা গেছে দামী, বর্ণাঢ্য এবং সুরভিত ফুল কবিদের যেমন পছন্দ তেমনি ডালিম, বেদানা, আপেল, কমলা ইত্যাদি অভিজাত ফল তাঁদের পছন্দ। শুধু বেল, তাল, কুল, বাতাবিলেবু তাদের আকৃতিগত যুক্তিযুক্ততার কারণে উক্ত অভিজাত পংক্তিতে সামিল হ'তে পেরেছে। আকৃতিক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বহু ফল অলংকার হিসেবে উপেক্ষিত হয়েছে। কাঁঠাল, তরমুজ তাদের বিশালাকৃতির জন্য, কলা তার লম্বাটে আকৃতির জন্য এবং তিল পরিমাণ কালো ফোঁটা অঙ্কিত লাল টুকটুকে কুঁচ তার অতি ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য বর্জিত হয়েছে বোঝা যায়। তবে আমড়া, গাব, চালতা, নোনা, আমলকী, জলপাই, খেজুর, লিচু, জাম, জামরুল--অলংকার হিসেবে এর কোনোটিই অযথার্থ ছিলোনা।

কবিরা সৌন্দর্যপিয়াসী ব'লে ফুল এবং ফলের রাজ্যে পরমানন্দ বিচরণ করেছেন—কিন্তু তরকারির জগতে প্রবেশে তাঁদের কুণ্ঠা। তাই দেখা যায় কোনো তরকারি (ফুলকপি, লাউ এবং বেগুন ছাড়া) উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু আনাজের জগত যে খুবই সম্ভাবনাময়, সে কথা অস্বীকার করা যাবেনা। পূর্ণায়ত কুচের ভিন্ন ভিন্ন গঠন এবং ভঙ্গিময়তা নির্দেশের জন্য উত্তম উপায়ই হচ্ছে সঠিক উপমানটির উত্থাপন। আলু, শাঁখআলু, ডুমুর, ঝিঙে, শালগম, ওলকপি, বাঁধাকপি, কুমড়ো, চালকুমড়ো. কদু, পেঁপে, মোচা ইত্যাদি উপমান যথার্থ চিত্রটিকে মুহূর্তেই উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। আসলে যেটি দরকার তা হচ্ছে এসব উপমান প্রয়োগ-ব্যাপারে ক্ষমতাপন্ন হাত। কবির হাত যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে তুচ্ছ টমেটোটিও কমলা ডালিমের তুল্য মূল্য পায়। সৃজনলীলায় কবির অভিপ্রায় যদি খাঁটি হয় এবং তাঁর হাত যদি ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহলে কুমড়ো, সীম, ধুন্দুল, নটেশাক, লাউডগা, কলার থোড় এমনকি তুচ্ছ ব্যাঙের ছাতাও যে কত মহার্ঘ হ'তে পারে, উদাহরণ চয়ন ক'রে তা' দেখানো যেতে পারে, যেমন---

১. 'জ্যোৎস্নায় মালয়ালী— নারিকেল ফুল সোনা সৌন্দর্য অবাধ'
'পৃথিবীতে থেকে' [ধূসর পাণ্ডুলিপি]

২. '. . . . কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি, বারুণীর প্রাণে
বিনুনি খসায়ে ব'সে থাকিবার স্বপ্ন আনে;' /
'এই ডাঙা ছেড়ে হায়' [রূপসী বাংলা]

১. নতুন আশার চাঁদ উঠেছে কুমড়ো জালির ফালি[১] (নজরুল)

২. মন সেতো নহে কুমড়ার ফালি
যাহারে তাহারে কাটিয়া বিলান যায়[২] (জসীমউদ্‌দীন)

৩. মেঘের কোলে রোদ জেগেছে আলতাপাটি সীম[৩] (সত্যেন দত্ত)

৪. . . . . . . আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভরে গেছে[৪] (জীবনানন্দ দাশ)

৫. তল দিয়ে তার লাল ন'টেশাক মেলিছে রঙের ঢেউ
লাল শাড়ীখানি মেলে দিয়ে গেছে এ বাড়ীর বধূ কেউ[৫] (জসীমউদ্‌দীন)

৬. জালি লাউয়ের ডগার মতন বাহু দুখান সরু।[৬] (জসীমউদ্‌দীন)

৭. ...... দেখিয়াছি ধূপ জ্বালো, ধরো সন্ধ্যাবাতি
থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাতে,--এখুনি আসিবে কি না রাতি[৭]
(জীবনানন্দ দাশ)

৮. কর্তুং যচচ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং[৮] (কালিদাস)

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে উপমানবস্তু হিসেবে রুটি, বিস্‌কুট, নাড়ু আদৃত হয়েছে। রসগোল্লা, পানতোয়া, কালোজাম, চমচম, রসকদম, পাঁপড়, নানা শ্রেণীর কাবাব, নানা জাতের সুদৃশ্য পিঠে ইত্যাদি যদি খাদ্যদ্রব্যের তালিকাকে আরো দীর্ঘ করে, তাহলে বিস্ময়ের কোনো কারণ ঘটেনা। কিন্তু কবিদের পক্ষপাতিত্বের সুন্দর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই উপমানগুলো আজও অনাদৃত।

পয়োধর তুলিত হ'য়েছে স্বর্ণ, হীরা, মণি, মুক্তা, রত্নের সঙ্গে। বাদ পড়েছে চুনি, পান্না, নীলা, প্রবাল—যদিও উপমান হিসেবে এগুলো কম সুদৃশ্য নয়। বুন্দেলী হীরা, আরবী প্রবাল, সিংহলী নীলা, ইরানী গোমেদ, চীনা তুঁতী, তিব্বতী ফিরোজা পাথর, দুধিয়া পাথর, পোখরাজ, গুল্‌নর, 'মরকত,

১. '৫৮' [বুলবুল] ; ২. [সোজন বাদিয়ার ঘাট] : ৩. 'ইলশে গুঁড়ি'
৪. 'মৃত্যুর আগে' [ধূসর পাণ্ডুলিপি]; ৫. [সোজন বাদিয়ার ঘাট]
৬. [নক্‌সীকাঁথার মাঠ]; ৭. 'অশ্বত্থ বটের পথে' [রূপসী বাংলা]
৮. [মেঘদূতম্‌] বর্ষাসঙ্গমের পর ধরিত্রী যখন গর্ভবতী হয় তখন অজস্র শিলীন্ধ্র (ব্যাঙের ছাতা) জেগে উঠে তার গর্ভসূচনার কথা জানিয়ে দেয়--এই শ্লোকে কালিদাস একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং এভাবেই শিলীন্ধ্রকে মূল্যময় করেছেন।

সুলেমানী মণি, মধুমক্ষিষ মণি, বৈদূর্য[১], চন্দ্রকান্ত[২] নীলকান্ত[৩], পদ্মরাগ, কোহিনূর—উপমানগুলোকে এরকম বিশেষ নামে চিহ্নিত করা যেতে পারতো। আভরণের মধ্যে কাঞ্চী, সিঁথি, অঙ্গুরী, কুণ্ডল, কীরিট, কন্ঠহার ইত্যাদি হ'তে পারতো অর্চিত।

সমুদ্রগর্ভ থেকে শুধু উঠে আসতে পেরেছে শঙ্খ। কিন্তু বেগুনি, গোলাপি, খয়েরি, বকশাদা নানা রঙের সামুদ্রিক কড়ি, ঝিনুক, শামুক এখনো অনাবিষ্কৃত। এই উপমানগুলো কোনো তরুণ জীবনানন্দের হাতে ব্যবহৃত হবার জন্য অপেক্ষমান।

সৌরজগৎ থেকে মনোনীত হয়েছে আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, মেঘ এবং বিদ্যুৎ। কিন্তু ধূমকেতু, উল্কা, রংধনু বর্জিত হয়েছে কেন, বোধগম্য নয়। বর্ষার কজ্জল মেঘই শুধু সমাদৃত, কিন্তু গোধূলির লালিম মেঘ কিংবা বিচিত্র সব বর্ণিল মেঘখণ্ডই বা কেন বর্জিত—তার কারণও সুস্পষ্ট নয়।

কবি নীড় ভালোবাসেন। অথচ পিঁপড়ের নীড় বা বোলতার নীড় ভালোবাসেন না। কিন্তু নিবিড় অরণ্যের নির্জনতায় ডালে ডালে ঝুলতে থাকা গোলাকৃতি বোলতার চাকগুলো, পিঁপড়ের বাসাগুলো যথেষ্ট দৃষ্টিআকর্ষি। রমণী যখন অনায়ত্তা, তখন তার কুচতুলনায় ভীমরুলের চাক বা পিঁপড়ের ঢোপের অন্বেষণ অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু কবিরা সাপের ছোবল সহ্য করতে রাজী আছেন, মধুমাছির হুল সহ্য করতে রাজী আছেন, কিন্তু বোলতা পিঁপড়ের অশান্তি বর্ণনা করতে রাজী নন—তাঁরা চান নীড়ের শান্তি। বাবুইয়ের নীড় অবশ্য নির্ভয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু দোলায়মান এই লম্বাকৃতির নীড় পীনস্তনীর বক্ষবর্ণনার জন্য বড়ই বিসদৃশ হবে। জীবনানন্দ যে নীড়ের[৪] কথা বলেছিলেন, সে নীড় গোলাকার—বহু যত্নে গড়া খোঁপারই মতো। কিন্তু তবুও কথা থাকে। সবসময় আকৃতিক সাদৃশ্য দেখেই যে উপমান নির্বাচন করতে হয়, তা তো নয়। জীবনানন্দ দাশ যখন নীড়কে

১. Cat's eye ২. Monstone; ৩. Lapis Lazuli

৪. 'নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুঁজে
ঘুমাতে চেয়েছে—' / 'অনেক আকাশ'

চোখের উপমান করেছিলেন[১]---তখন সাদৃশ্যটি আকৃতিতে ছিলোনা—ছিলো অন্য কোনোখানে। প্রশান্তি এবং নির্ভরতাই ছিলো সেখানে সাধারণ ধর্ম। মোল্লা আবদুর রহমান জামী যখন বলেন "পয়োধর যুগল যেন জ্যোতির গুম্বজ, যেন কর্পূরের প্রস্রবণে উত্থিত দুই বুদ্বুদ, যেন একই শাখায় উৎপন্ন দুটি দাড়িম্ব"[২]—তখন আকৃতিক সাদৃশ্যের চেয়েও অন্য কোনোখানে আপতিত হয় কবির উৎসাহ। আমরা বুঝতে পারি, জামী প্রথম উপমায় দীপ্তি ও মসৃণতা, দ্বিতীয় উপমায় সৌগন্ধ্য এবং সর্বশেষ উপমায় সৌষ্ঠব বর্ণনার জন্যই নির্মাণ করেছেন এই মালোপমা।

প্রাণহীন উপমান ছেড়ে এবার যাওয়া যাক প্রাণীমণ্ডলে। পশুকুলে কবি-কুলের প্রবেশ দেখা যায় কুণ্ঠিত। 'হাতী' এবং 'হরিণ'---এই চয়ন বড়ই সীমিত। কুচের যৌবমত্ততার সঙ্গে কবিকুল মত্ত গজরাজের বলশালীতার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। নখক্ষতাক্ত পয়োধরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন অঙ্কুশবিদ্ধ হস্তীমস্তকে। এই কারণেই পশুজগত থেকে হস্তী উপমান মনোনয়ন পায়। হরিণ উপমানটিকে চয়ন করা হয়েছে রূপময়তা বোঝা-নোর জন্য। বলা যেতে পারে হাতীর মত বাঘ, সিংহ এবং বলবান আরও অনেক পশুই কুচের যৌবনবেগের তুলনা হ'তে পারে। শুধু হরিণই বা কেন? জেব্রা, শশক ইত্যাদি সুন্দর অনেক পশুই তুলনা হ'তে পারে কুচের সৌন্দর্যময়তার। পতঙ্গকুলে দৃষ্টিচালনা ক'রে বলা যেতে পারে, শুধু ভ্রমরই বা কেন? রমণীবক্ষের সুরঙ বৃন্তকে মৌমাছি, মথ, প্রজাপতি কিংবা যে কোনো বিচিত্র পতঙ্গের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। পয়োধর নানা জাতের পুষ্পরূপে কবিদের কল্পনায় নন্দিত ব'লে, এই পুষ্পে নানা

---

১. '...... অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন'
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।' /
'বনলতা সেন' [বনলতা সেন]

২. মোল্লা আবদুর রহমান জামীকর্তৃক ফারসীতে রচিত ১৩২৯ হিজরীতে কানপুর কাইউমী প্রেসে মুদ্রিত 'ইউসুফ যোলাইখা' পৃঃ ৩২ / [পদ্মাবতী] সম্পাদনা : সৈয়দ আলী আহসান

প্রজাতির পতঙ্গের উপবেশনচিন্তাও বড়ই স্বাভাবিক। মৎস্যকুলে কোনো বিশেষ নামকেই উপমানরূপে মূল্য দেয়া হয়নি। কিন্তু সরপুঁটি, চাপেলী, বাটা, রূপচাঁদা, পায়রাচাঁদা, তারামাছ, শোল, বোল, রুই, কাৎলা, মৃগেল, চিংড়ি, চিতল, কালবোস, ইলিশ—এর যে কোনো নামই অনায়াস মনোনয়ন পেতে পারতো। এবার পক্ষীপ্রসঙ্গ। মধ্যযুগের কবিরা শুধু চক্রবাককেই পছন্দ করলেন—অন্য এত রঙচঙে পাখি তাঁদের পছন্দ হলোনা। পাপিয়া, কোকিল, ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া, চড়ুই, মুনিয়া, ঘুঘু, হরিয়াল, দোয়েল, বুলবুলি, 'বউ কথা কও', ময়ূর, মানিকজোড়, হাঁড়িচাঁচা, মাছরাঙা, ফিঙে, শালিক, গাংশালিক, টুনটুনি, বাবুই, ডাহুক, বলাকা, শঙ্খচিল, শুক, জলপিপি—এরা কেউই 'চারু চকেব'র চেয়ে কম চারু নয়। সৌন্দর্যরসিকের চোখে দেখলে জীবনানন্দের 'ধানগন্ধী পেঁচা'[১]-টি কেও সুন্দর মনে হয়। প্রিয়তমা ধানীরঙ শাড়ী পরলে, তাঁর কুচদ্বয়কে মনে হয় 'ধানগন্ধী প্যাঁচা'র মতই মমতাময়। রমণীর শাদা বুটিদার কালো শাড়ীর আঁচলঘেরা পয়োধর কাঠ-ঠোকরার পালকসাদৃশ্য মনে করায়। কাঁচা হলদি রঙের 'খুকীর খোকা হোক' পাখিটি ছোট গোল কালো মাথাটি যদি তার হলুদ পাখনায় গুঁজে রাখে, তাহলে মুহূর্তেই হ'তে পারে কোনো বাসন্তীবসনার পয়োধরের যোগ্য উপমান। রমণীর জললীন পয়োধর হ'তে পারে উপমেয় জলে ডোবা পানকৌটির। মুঠিপরিমান দোয়েল, বুলবুলি—এরা আনায়াসেই হ'তে পারে পয়োধরের পরিমিত আকৃতি, কোমলতা এবং কবোষ্ণতার প্রতীক।

সম্ভাবনাশালী হওয়া সত্তেও আজ পর্যন্ত কোন্ কোন্ উপমান উপেক্ষিত রয়ে গেছে, সে সম্পর্কে আমি এতক্ষণ স্থূলভাবে আলোচনা করলাম—বলা যেতে পারে, আমি এতক্ষন মোটা তুলি ব্যবহার করলাম। পুরাতন কবির তুলনায় আধুনিক কবির উপমার দিগন্ত অনেক বিস্তৃত। আজকাল বস্তুর সঙ্গে শুধু বস্তুরই তুলনা দেওয়া হয়না—বস্তুর সঙ্গে ভাবনারও তুলনা দেওয়া হয়। বস্তুর সঙ্গে ভাবনার, পরিচিতের সঙ্গে দূরবর্তীর, মূর্তের সঙ্গে অমূর্তের তুলনা দেওয়া আধুনিক কবিদের বড় প্রিয় ব্যাপার। উপমেয় উপমানের মধ্যে দৃশ্যমান সাদৃশ্য না থাকলেও আধুনিক কবি তার মধ্য থেকেও অনেক লুকোনো সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে পারেন—যা প্রতীয়মান নয়,

১. 'স্নিগ্ধ সব ধানগন্ধী প্যাঁচাদের প্রেম মনে পড়ে।' / 'মনোবীজ' [মহাপৃথিবী]

তাকেও মনোরম ক'রে তুলতে পারেন। তাঁরা এমন দুটি প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে তার মধ্যে যোগসাধন করতে পারেন, যা রচিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোনোদিন দেখতে পায়না। অতএব বহু অপ্রসূত নতুন উপমা নতুন যুগের কবিদের অন্তরে সংগুপ্ত আছে। সেসব রহস্যাচ্ছন্ন ভ্রূণ নিরীক্ষণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়---যতক্ষন না সেগুলো পাঠকের নয়নসীমায় আসছে।

কুচার্চনা পর্বের সমাপ্তিসূচক ছেদরেখাঙ্কনে উদ্যত হ'তে এখন আমি অভিলাষী। তবে বক্ষ-বন্দনা প্রসঙ্গ সমাপনের পূর্বে পুনরুক্তির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বলছি, নারীর যৌবনব্যাকুল, কামপূর, রূপোজ্জ্বল কুচযুগ কবিদের রূপতন্ময় অন্তর থেকে চিরদিনই অনেক মোহমদির উপমা আহরণ করবে এবং করবেই। আর সুনিশ্চিত আশা পোষণ করছি যে, নবীন কবিরা উপমানির্মাণ ব্যাপারে গতানুগতিকতার সীমা ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন যখন, তখন ভবিষ্যতে বহু নতুন ও আলোড়ণক্ষম অলংকার প্রসূত হবে এবং হবেই।

৩১

৩২

গ্রন্থপঞ্জী

[যে সকল গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি চয়িত হয়েছে]

ক. আকর গ্রন্থ (সংকলন গ্রন্থ, সম্পাদিত গ্রন্থ, অনূদিত গ্রন্থ সহযোগে) :

১. চর্যাগীতিকা---সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত
২. বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন--অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
৩. বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য--মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত
৪. মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা--মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত
৫. বৈষ্ণব পদাবলী--শ্রী সুকুমার সেন সংকলিত
৬. পাঁচশত বৎসরের পদাবলী--শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার
৭. রায়শেখরের পদাবলী--রায়শেখর
৮. বিদ্যাপতি শতক--ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত
৯. বিদ্যাপতির পদাবলী (নূতন সংস্করণ : প্রকাশক ঃ শ্রী শরৎকুমার মিত্র প্রকাশকাল : ১৩৬৯)— শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত
১০. মুসলিম কবির পদসাহিত্য--আহমদ শরীফ সম্পাদিত
১১. রামায়ণ--কৃত্তিবাস অনূদিত; উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
১২. মৈমনসিংহ গীতিকা--ডঃ দীনেশ সেন সম্পাদিত
১৩. মৈমনসিংহ গীতিকা—সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
১৪. বাংলাদেশের লোকধাঁধাঁ (লোক সাহিত্য সংকলন)—আলমগীর জলিল ও সামীয়ুল ইসলাম সম্পাদিত
১৫. মৃগাবতী—করমুল্লা; মোঃ আব্দুল আউয়াল সম্পাদিত
১৬. মধুমালতী—সৈয়দ হামজা; সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত
১৭. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল--দোনা গাজী; আহমদ শরীফ সম্পাদিত

১৮. সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী--দৌলৎ কাজী; ডঃ মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত
১৯. লায়লী মজনু—দৌলত উজীর বাহরাম খাঁ; আহমদ শরীফ সম্পাদিত
২০. আলাউল বিরচিত সিকান্দরনামা—আহমদ শরীফ সম্পাদিত
২১. পদ্মাবতী—আলাওল; ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত
২২. পদ্মাবতী—সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত
২৩. পদ্মাবতী—জায়সী (প্রথম খণ্ড); দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
২৪. পদ্মাবতী--আলাওল (দ্বিতীয় খণ্ড); দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
.২৫ মধ্যযুগের রাগ তাল নামা—আহমদ শরীফ সম্পাদিত
২৬. মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ—আহমদ শরীফ সংকলিত
২৭. মঙ্গল চণ্ডীর গীত—দ্বিজ মাধব
২৮. চণ্ডীমঙ্গল—মুকুন্দরাম
২৯. বিদ্যাসুন্দর--শা' বারিদ খান
৩০. কালিকামঙ্গল—কৃষ্ণরাম দাস
৩১. কালিকা মঙ্গল--বলরাম কবিশেখর; শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত
৩২. মনসা মঙ্গল—হরিদত্ত
৩৩. মনসা মঙ্গল—নারায়ণ দেব
৩৪. মনসা মঙ্গল—বিজয়গুপ্ত
৩৫. কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ--শ্রী জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত
৩৬. মনসা মঙ্গল—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
৩৭. মনসা মঙ্গল—জগজ্জীবন
৩৮. শ্রীকৃষ্ণবিজয়--মালাধর বসু
৩৯. গোবিন্দ বিজয়—অভিরাম দাস
৪০. কৃষ্ণমঙ্গল—পরশুরাম
৪১. মাধব সঙ্গীত--পরশুরাম রায়
৪২. ধর্মমঙ্গল—মানিকরাম গাঙ্গুলি
৪৩. শ্রী ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী
৪৪. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল--অধ্যাপক কার্তিক ভদ্র সম্পাদিত

৪৫. ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ—মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত

৪৬. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪৭. মেঘনাদবধ কাব্য— ঐ

৪৮. বীরাঙ্গনা কাব্য— ঐ

৪৯. চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী— ঐ

৫০. নবীনচন্দ্র সেন-রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস—ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

৫১. অশ্রুমালা—কায়কোবাদ

৫২. নিসর্গ সন্দর্শন—বিহারীলাল চক্রবর্তী

৫৩. বঙ্গসুন্দরী— ঐ

৫৪. সঙ্গীতশতক— ঐ

৫৫. সারদা মঙ্গল— ঐ

৫৬. সাধের আসন— ঐ

৫৭. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮. কড়ি ও কোমল— ঐ

৫৯. মানসী— ঐ

৬০. সোনার তরী— ঐ

৬১. বিদায় অভিশাপ ঐ

৬২. চিত্রা— ঐ

৬৩. চৈতালি— ঐ

৬৪. কথা ও কাহিনী— ঐ

৬৫. কল্পনা— ঐ

৬৬. ক্ষণিকা— ঐ

৬৭. উৎসর্গ— ঐ

৬৮. গীতাঞ্জলি— ঐ

৬৯. বলাকা— ঐ

৭০. পূরবী— ঐ

৭১. মহুয়া— ঐ

৭২. সানাই— ঐ